শত শহীদের রক্তে

অমরেন্দ্র কুমার ঘোষ

তুলি-কলম
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

ক্ষুদিরাম

সতেন্দ্রনাথ বসু

বাদল গুপ্ত

বিনয় বসু

দীনেশ গুপ্ত

রাজেন লাহিড়ী

তারিনীপ্রসন্ন মজুমদার
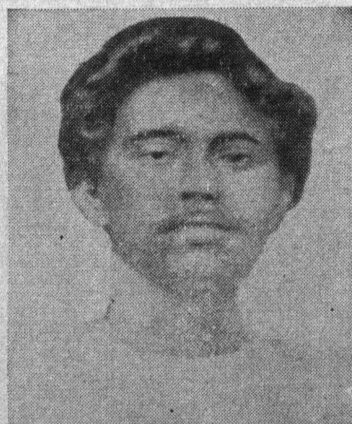
নগেন্দ্রনাথ দত্ত

বটুকেশ্বর দত্ত

ভগৎ সিং

মদন লাল ধিংরা

সোহনলাল পাঠক

রাম প্রসাদ বিসমিল

ঠাকুর রোশন সিং

রাজগুরু
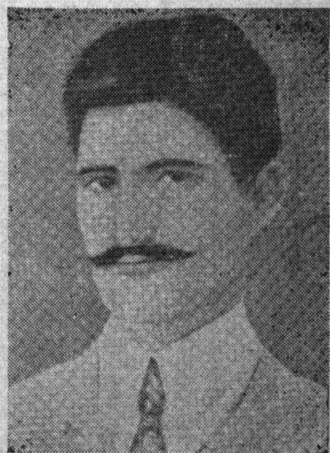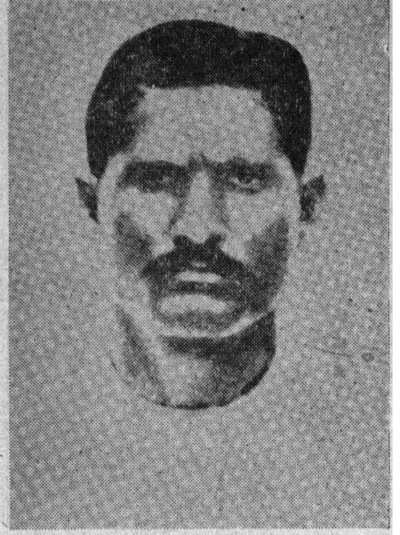
শুকদেব
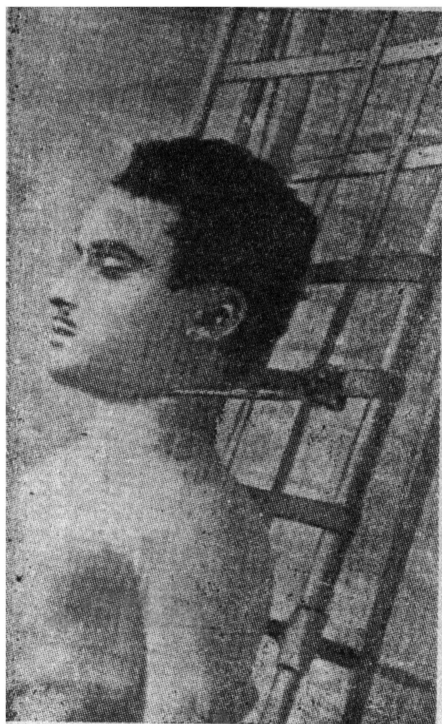
প্রফুল্ল চাকী
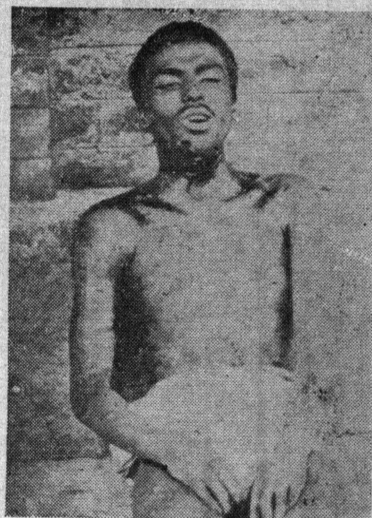
চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী
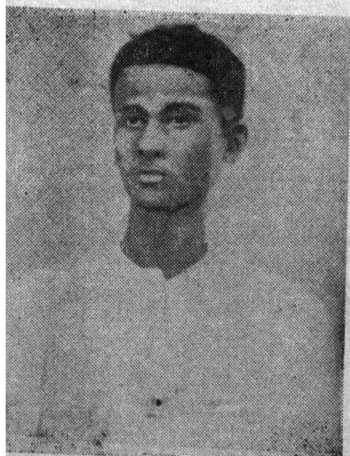
সুশীল সেন

দীনেশ গুপ্ত
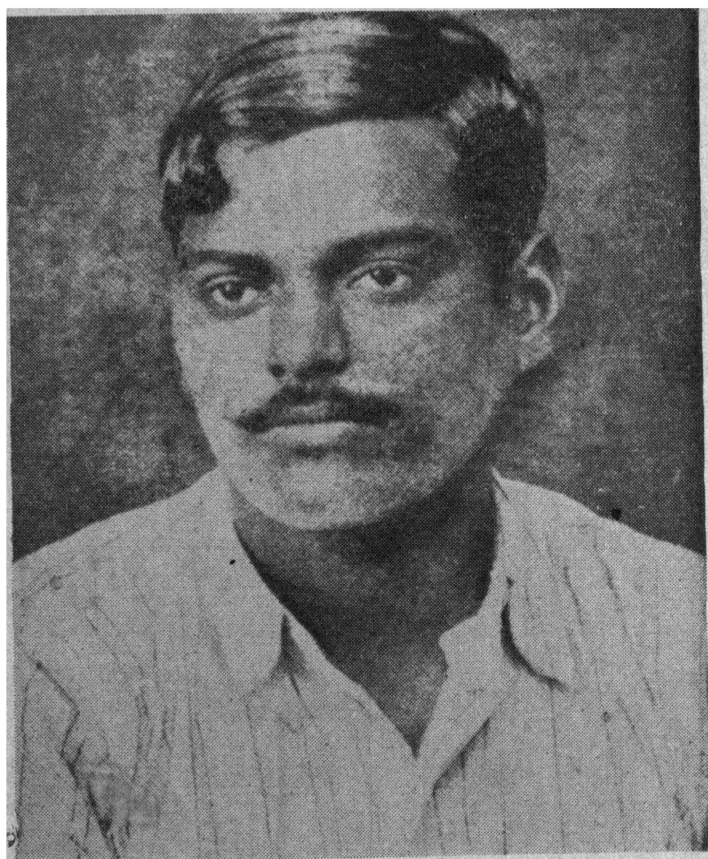
চন্দ্রশেখর আজাদ
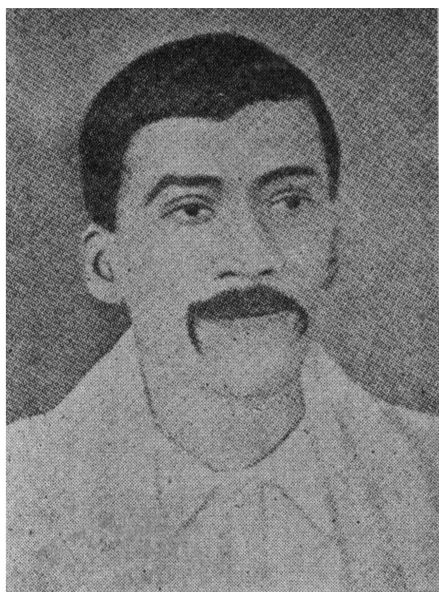
অরবিন্দ ঘোষ

সত্যেন বর্দ্ধন

রাসবিহারী বসু

লালা লাজপৎ রায়
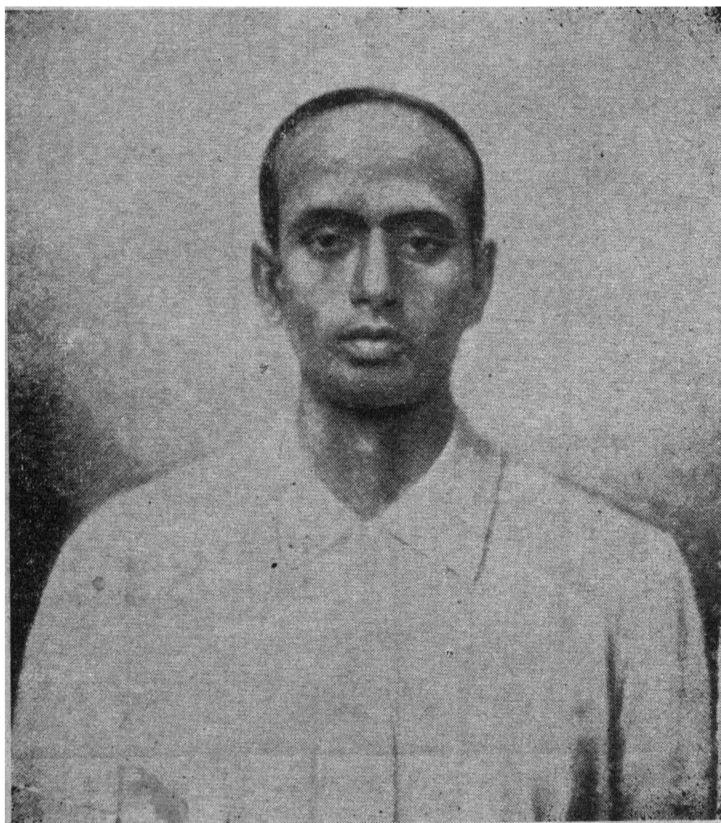
সূর্য সেন (মাস্টারদা)

মঙ্গল, তুমি অপরাধ করেছ? প্রশ্ন করলেন ইউরোপীয় হাকিম ৩৪নং রেজিমেণ্টের সেপাই মঙ্গল পাঁড়েকে।

আমি কোন অপরাধ করিনি, বিনয়ের সুরে উত্তর দিলেন মঙ্গল পাঁড়ে।

হাকিম এবার কটমট করে তাকালেন মঙ্গলের মুখের দিকে।

খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর অবাক হলেন মঙ্গল পাঁড়ের মুখমণ্ডল দেখে। দেখলেন, মঙ্গলের মুখে-চোখে ফুটে উঠেছে নির্মল ও স্বচ্ছ প্রশান্তি। অপরাধের কোন রকম কালিমা লেগে নেই মুখমণ্ডলের কোন অংশে। তিনি হাসছেন কেবল।

হাকিম ভাবলেন, কি অসাধারণ দুঃসাহস এই সিপাইয়ের। অনেক নরহত্যা করেছে এই লোকটি। অনেকের সঙ্গে বৃটিশ রাজত্ব খতম করার জন্যে ব্যাপক ভাবে ষড়যন্ত্র করে এসেছে। এমন লোকের মুখে অনাবিল হাসির উচ্ছ্বাস কি ভাবে আসতে পারে। তবে কি মঙ্গল পাঁড়ে কোন অপরাধ করেনি? ওর বিরুদ্ধে কেউ হিংসাবশত মিথ্যা নালিশ করেছে?

ক্ষণিকের জন্যে এই প্রকার চিন্তা ইংরাজ হাকিমের মন-প্রাণ তোলপাড় করে তুললো।

পরে তিনি নিজের হৃদয়দৌর্বল্য সংযত করে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, তুমি অপরাধী মঙ্গল। তুমি সাংঘাতিক অপরাধ করেছ। বৃটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধনের জন্যে তুমি ঘোরতর ষড়যন্ত্র করেছ। এই জঘন্যতম অপরাধের জন্যে তোমার ফাঁসি হওয়া উচিত।

হাকিমের মুখে ফাঁসির কথা শোনার পর কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না মঙ্গল পাঁড়ে। তিনি আগের মত অনাবিল আনন্দের মাঝে নিজেকে মিশিয়ে দিলেন।

সারা আদালত কক্ষের অগণিত দর্শক একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে এই বীর সিপাইটির প্রতি। দেখছে তার অসীম মনোবল—সত্যের প্রতি অসম্ভব দৃঢ়তা। ভাবছে, মঙ্গল পাঁড়ে সত্যি বুঝি মহামানব। তা না হলে ফাঁসির হুকুম শুনে তাঁর অন্তর ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলো না কেন? অন্যান্য আসামীরা ফাঁসির আদেশ শুনলে বিচলিত হয়ে পড়ে। কিন্তু মঙ্গল পাঁড়ের চোখে-মুখে তেমন লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে না কেন?

দর্শকরা এই প্রকার চিন্তা করছে।

মঙ্গল একবার তাকালেন দর্শকদের দিকে। তাঁর সেই অচঞ্চল দৃষ্টির মাঝে প্রকাশ পাচ্ছে অকৃপণ নির্ভীকতা।

এমনি ধারা নির্ভীকতা সত্যিই ছিল মঙ্গলের। কারণ তিনি হচ্ছেন জাতীয়তাবাদী—ভারত প্রেমিক, ভারতজননীর বীর সন্তান। তাই মায়ের অপমান তাঁর কাছে শূলের মত বিঁধেছিল। বিদেশী শাসকরা ভিন্ন দেশ থেকে এদেশে এসে যা ইচ্ছে তাই করবে অথচ তার প্রতিবাদ করবে না কেউ এ কক্ষনো হতে পারে? কোন আত্মমর্য্যাদা-সম্পন্ন মানুষ কী এই অন্যায় সহ্য করতে পারে! না, পারে না। পারেননি মঙ্গল পাঁড়েও। কারণ তিনি হচ্ছেন ভারতজননীর সুসন্তান। বিদেশী শাসকরা 'মাকে অপমান করবে এ আদৌ সহ্য হলো না তাঁর। তাই তিনি ক্রুদ্ধ বিষধর ভুজঙ্গীর মত ফণা তুলে দাঁড়িয়েছেন চকী শ্বেতাঙ্গ শাসকের সামনে।

'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে পোহাল শর্বরী…'

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যপংক্তিটি বৃটিশ জাতিকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে। চতুর বৃটিশ জাতি ক্ষুদ্রকায় একটি দেশের অধিবাসী হয়েও একসময়ে বুদ্ধি এবং বাহুবলে সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল। তাই লোকে বলতো এবং ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকতো এই কথাটি—'বৃটিশ সাম্রাজ্য সূর্য কখনো অস্ত যায় না।'

বিশ্বের অন্যান্য দেশেব মত এই বিরাট দেশ ভারতবর্ষেও বৃটিশ এসেছিল প্রথমে বাণিজ্য ও ব্যবসা করার অছিলায়। এই জন্যে সে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' নামে একটি ব্যবসায়িক সংগঠন গড়ে তোলে। তখনকার মুসলমান ভারতসম্রাটকে প্রচুর উপঢৌকন এবং খোশামোদের দ্বারা তুষ্ট করে এদেশে তাদের অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্য করবার জন্যে সনদ আদায় করে নেয়। ফলে তারা এদেশে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রচুব মুনাফা অর্জন করে এবং তদানীন্তন কালের শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং ভাঙ্গনের সুযোগ নিয়ে এদেশে স্থায়ীভাবে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াস পায়। কিন্তু স্থানীয় একদল আত্মমর্য্যাদাবোধ-সম্পন্ন মানুষ তাদের এই প্রকার ধূর্তামি এবং বেআইনী ও জবরদস্তি অধিকার বরদাস্ত করেননি। তাঁরা দেশের স্বাধীনতা এবং মুক্তির স্বপ্ন দেখছিলেন এবং তার সুযোগও অনুসন্ধান করছিলেন। সেই সুযোগও একদিন এলো ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিখ্যাত সিপাই বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে। এই আত্মমর্য্যাদাবোধসম্পন্ন সিপাইরা বৃটিশ-রাজের অন্যায় ও অপমানজনক আদেশ নাকচ করে সশস্ত্র বিদ্রোহের আগুন জ্বেলে দিলেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায়। এই বিদ্রোহের ফলে ভারতবাসী মৃত্যুবরণ করেছেন। বৃটিশ রাজের বিচারে অনেক সাহসী এবং মুক্তিকামী সিপাই ফাঁসিকাষ্ঠের অভিশপ্ত রজ্জুতে এবং রাইফেলের গুলির সামনে প্রাণ দিয়েছেন। তাঁদের আমরা আজও সশ্রদ্ধ অন্তঃকরণে স্মরণ করে থাকি।

এই সকল মুক্তিযোদ্ধা সিপাইদের মধ্যে প্রথম যিনি হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে জীবনেব জয়গান গেয়ে গেলেন তিনি হচ্ছেন মঙ্গল পাঁড়ে।

বাংলা দেশে সিপাই বিদ্রোহের অগ্নি প্রথমে প্রজ্জ্বলিত হয় মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে। তারপর তা ছড়িয়ে পড়ে ২৪ পরগণা জেলার অন্যতম মহকুমা শহর ব্যারাকপুরে। সিপাইদের

ধারণা হলো, তাঁদেরকে যে টোটা ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয় তার ওপর মাখানো থাকে গরু ও শূকরের চর্বি। এরূপ ধারণা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সিপাইদের কাছে কালস্বরূপ হয়ে দাঁড়াল। তাঁরা তদানীন্তন ভারত সরকারের বিরুদ্ধে নানাপ্রকারে বিক্ষোভ জানাতে লাগলেন। বিদেশী সরকারকে নানা ভাবে ব্যতিব্যস্ত করতে উদ্যত হলেন। কারণ সরকার এতে করে তাঁদের ধর্মে নিদারুণ ভাবে আঘাত করেছেন। ধর্মের প্রতি আঘাত কোন জাতির পক্ষেই সহনীয় নয়। তাই ভারতের বিভিন্ন স্থানে সিপাইদের বন্দুকে ব্যবহৃত গরুর চর্বি মাখানো টোটাকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হলো। সিপাইরা সেদিন এমনভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে তখনকার দিনে ঠিক এখনকার মত যদি কোন জাতীয়তাবাদী নেতা থাকতেন তাহলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন অনেক আগে থাকতে দানা বেঁধে উঠতে পারতো। মুষ্টিমেয় সিপাইদের মনে এদেশ থেকে ফিরিঙ্গী শাসকদের বিতাড়ণকর্ম সক্রিয় হয়ে উঠলেও যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে তা অঙ্কুরেই বিনাশ হয়েছিল। তা সত্বেও একথা বলা ঠিক হবে না যে সিপাই বিদ্রোহের অগ্নি নির্বাপিত হবার পর ভারতবাসীদের মন থেকে ফিরিঙ্গী শাসকদের প্রতি বিদ্বেষ চিরতরে মুছে গিয়েছিল। বরং বলা যেতে পারে তা ভষ্মাচ্ছাদিত হয়েছিল এবং যোগ্য নেতৃত্বের শুভ আবির্ভাবের জন্যে অপেক্ষা করছিল। পরে ভারতভাগ্য বিধাতার অলঙ্ঘ্য এবং অলক্ষ্য নির্দেশে যোগ্য নেতৃবৃন্দের আবির্ভাব হয়েছিল এই পরাধীন ভারতবর্ষে। তাঁরা স্বদেশজননীর মুক্তির জন্যে আন্দোলন চালিয়েছিলেন যার পরিণামে আমরা লাভ করেছি স্বাধীনতা। যাক সে পরের কথা। এখন মঙ্গল পাঁড়ের প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসা যাক।

ব্যারাকপুরের সিপাইদের মনে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠলো।

যখন ব্যারাকপুরের সিপাইদের উত্তেজনার কথা কলকাতায় পৌছয় তখন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং ভয়ঙ্কর বিপদের আভাস স্পষ্টরূপে বুঝতে পারলেন। ভারতবর্ষের আকাশতলে ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডের

আবির্ভাব হয়েছিল। এই মেঘের গভীর কালিমা ক্রমেই গভীরতর হয়ে উঠেছিল। শ্বেতাঙ্গ সরকার অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লেন। কারণ সৈনিকরাই হচ্ছে সরকারের আসল শক্তি। সেই শক্তিতে যদি ফাটল দেখা যায় তাহলে সরকারের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বেশী সময় লাগবে না। তাই সরকারের কর্ণধারগণ সবসময় চিন্তা করতে লাগলেন কিভাবে ভারতবর্ষের সৈনিকদের মধ্যে সংহৃতি ও রাজানুগত্য আনা যায়।

এই সময়ে বাঙ্গালাদেশে বেশী ইউরোপীয় সৈন্য ছিল না। কলকাতা ও দানাপুরের মধ্যে কেবল মাত্র একদল ইউরোপীয় সৈন্য ছিল।

বহরমপুরের সিপাইদের হাঙ্গামার এক সপ্তাহ পরে কর্ণেল কিচেল উত্তেজিত সৈনিকদলকে নিরস্ত্র করবার জন্যে ব্যারাকপুরে আসতে আদেশ পেয়েছিলেন।

এর মধ্যে রেঙ্গুন হতে একদল ইউরোপীয় সৈন্য আনবার জন্যে একখানি জাহাজ পাঠানো হয়েছিল। ব্যারাকপুরের সেনারা এর কিছুই জানতেন না। এমন কি এই খবর সেনাপতি হিয়ারসের কাছেও পাঠানো হয়নি। তাই সেনাপতি সিপাইদের কথায় কর্ণপাত করলেন না। তিনি ভাবলেন, সিপাইরা কল্পনায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে সকল বিষয়কে অতিরঞ্জিত করে তুলছেন।

কিন্তু শেষকালে তাঁর মোহনিদ্রা ভাঙ্‌লো। তিনি বুঝতে পারলেন, সিপাইরা তাঁদের চেয়েও অনেক বেশী জানেন।

জাহাজ নির্দিষ্ট সময়ে রেঙ্গুন হতে ইউরোপীয় সৈন্য নিয়ে কলকাতায় এসে পৌছলো।

কলকাতায় প্রবাসী ইউরোপীয়গণ এই সুখবর শোনামাত্র আনন্দে আটখানা হলো। তারা নিজেদের যথেষ্ট নিরাপদ বোধ করতে লাগলো। তাই তারা আগের আমোদ আহ্লাদ ও হৈ-হুল্লোড়ের স্রোতে গা ভাসিয়া দিলো। এতকাল তারা উত্তেজিত সিপাইদের

ভয়ে আনন্দের যে উৎস হতে বঞ্চিত হয়ে অমানিশার অন্ধকারের মত বিষণ্ণতার ঘোর কালিমা অন্তরে বহন করছিল এবার তা ধীরে ধীরে অপসৃত হতে লাগলো।

এই সময়ে সিপাইদের মত বৃটিশ সরকারও অত্যন্ত আতঙ্কিত হন। সিপাইদের উত্তেজনা, এর ওপর সিপাইদের অবাধ্যতা দেখে সরকারের আশঙ্কা ক্রমে গভীরতর হয়ে উঠল।

এই আশঙ্কার সময় সরকার সবিশেষ ধীরতার সঙ্গে কাজ করতে পারেননি। প্রধান প্রধান ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষদের অজ্ঞাতসারে সরকার আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সিপাইরা সকল জায়গা হতেই খবরাখবর সংগ্রহ করতেন।

নগরে নগরে যা ঘটতো সে সব কর্তৃপক্ষ জানবার আগেই সিপাইরা জানতে পারতেন।

রেঙ্গুন হতে ইউরোপীয় সৈন্যের আসার খবর সেনাপতি হিয়ারসে আগে জানতে পারেননি।

এদিকে প্রতি সৈনিকনিবাসে এ সম্বন্ধে আন্দোলন হচ্ছিল। সিপাইরা সরকারের অভিসন্ধির ওপর সন্দেহ করে ক্রমেই আগের তুলনায় অধিকতর বিরক্ত, অধিকতর শঙ্কান্বিত এবং অধিকতর অবাধ্য হয়ে উঠছিলেন।

ব্যারাকপুরের সিপাইরা কিছুদিন শান্ত ভাবে রইলেন। নীরবে নিজেদের জাতি, বংশমর্য্যাদা এবং সকলের অপেক্ষা প্রিয়তর ধর্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে সংক্রামক হয়ে উঠেছিল। কলকাতার সিপাইগণও ব্যারাকপুরের সিপাইদের মত ভীত ও অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন।

গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং ১৫ই মার্চ তারিখে প্রধান সেনাপতিকে লিখলেন, '৪৩নং সিপাইদল, ২নং দলের সিপাইদের সঙ্গে ভোজন করতে রাজী হয়নি। এমন কি ৭০নং সিপাইদের কেউ কেউ ২নং সিপাই দলের লোকেদের টোটা কাটতে নিষেধ করেছে।'

সিপাইদের মনোগত ভাব বুঝতে পেরেই লর্ড ক্যানিং এরূপ নির্দেশ দেন।

ওদিকে সিপাইদের মধ্যে উত্তেজনা ক্রমশ বেড়েই চলল ;

ব্যারাকপুরের সিপাইরা প্রধানত কলকাতার দুর্গ ও অন্যান্য প্রকাশ্য স্থানে পাহারার কাজে নিযুক্ত থাকতেন।

১০ই মার্চ, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ। সময় ঠিক সন্ধ্যা। এই সময় ২নং রেজিমেন্টের কয়েকজন সৈনিক কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ পাহারায় রত ছিলেন। তখন টাকশালের পাহারার ভার পড়েছিল ৩৪নং সিপাই দলের ওপর।

সন্ধ্যার সময় ২নং সিপাইদলের দু'জন সিপাই টাকশালের দ্বারে এসে সুবেদারের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন।

সুবেদার তখন আলোর নীচে বসে নিজেদের কার্য্যকলাপ সংক্রান্ত একখানি বই দেখছিলেন।

এই সময়ে দু'জন সিপাই তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন।

এদের একজন বললেন, আমরা কেল্লা থেকে এসেছি। রাত দ্বিতীয় প্রহরের সময়ে কলকাতার সেপাইরা কেল্লার সান্ত্রীদের সঙ্গে একত্র হবেন। আপনি যদি এই সময়ে আপনার দল নিয়ে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হন তাহলে গভর্ণমেন্টের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করা সহজসাধ্য হবে।

তাঁদের কথা শুনে বিস্মিত হলেন সুবেদার। মনে মনে চিন্তা করলেন তাঁদের এইপ্রকার ধৃষ্টতার কথা চিন্তা করে।

তিনি সিপাই দু'জনের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদেরকে বন্দী করবার আদেশ দিলেন।

আদেশ প্রতিপালিতও হলো।

পরদিন সকালে সুবেদার এই দু'জন সিপাইকে বন্দী অবস্থায় দুর্গে পাঠালেন।

সামরিক আদালতে এঁদের বিচার হলো। বিচারপতি রায় দিলেন, এঁদের দুজনকে চোদ্দ বছরের কারাবাস দণ্ড দেওয়া হলো।

এরূপ সামান্য বিষয় হতে শেষকালে ভয়ঙ্কর ঘটনার উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নয়, একথা সেনাপতি হিয়ারসে বেশ স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। তাই এই সামান্য বিষয়ও হিয়ারসের কাছে উপেক্ষার যোগ্য বলে বোধ হলো না।

হিয়ারসে আবার উপস্থিত আশঙ্কার মূলোৎপাটনে যত্নশীল হলেন।

তিনি সিপাইদের মনোভাব বদলে দেবার জন্যে তাঁদের সামনে অনেক রকম হিতকথা বললেন।

তাঁর প্রথম বক্তৃতা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন সিপাইরা।

তাই দেখে আশ্বস্ত হলেন সেনাপতি হিয়ারসে।

তিনি ভাবলেন, এবার হয়তো সিপাইদের মনে সরকারের প্রতি আনুগত্যের ভাব প্রকট হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে!

তাঁর মনে সাহস বেড়ে গেল।

তিনি দ্বিতীয়বার বক্তৃতা করতে ইচ্ছা করলেন। তিনি গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিংকে জানালেন এই কথা।

গভর্ণর জেনারেল এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। এবার হিয়ারসে ব্যারাকপুরের সিপাইদের আদেশ দিলেন, তোমরা আগামী ১৭ই মার্চ তারিখে সকালবেলায় কুচকাওয়াজের জায়গায় হাজির হও।

সেনাপতির আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন সিপাইরা। তাঁরা নির্দিষ্ট দিনে কুচকাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে সমবেত হতে লাগলেন।

তাঁরা এক জায়গায় একত্র মিলিত হয়ে একটা ছোটখাট মেলার সৃষ্টি করলেন।

এরপর এলেন সেনাপতি হিয়ারসে। তিনি সাইকেল বা পদব্রজে এলেন না। এলেন অশ্বারোহণে।

সিপাইরা তাঁকে দেখে সসম্মানে অভিবাদন জানালেন।

অশ্বারোহী হিয়ারসে আন্তরিকতার সঙ্গে সৈনিকদের অভিবাদন গ্রহণ করলেন। তারপর গম্ভীর স্বরে আরম্ভ করলেন তাঁর বক্তৃতা,

গভর্ণমেণ্টের শত্রুপক্ষ অকারণে সিপাইদের উত্তেজিত করে তুলছে। অকারণে তাদেরকে জাতিনাশ ও ধর্মনাশের ভয় দেখাচ্ছে। বিশ্বস্ত সিপাইরা যেন এই শত্রুদের থেকে সর্বদা দূরে থাকে। তারা কোম্পানীর অধীনে কাজ করে পরম সুখে দিনাতিপাত করছে। শত্রুপক্ষ যেন এই সুখের কোনরকম ব্যাঘাত না ঘটায়।

এরপর হিয়ারসে টোটার কাগজ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বললেন, ভাল কাগজ মাত্রেরই ওপরটা এরকম চক্‌চকে দেখা যায়। ভারতবর্ষের রাজারা সর্বদা এরূপ কাগজ ব্যবহার করে থাকেন।

এর প্রমাণ দিতে গিয়ে হিয়ারসে কাশ্মীরের মহারাজ গোলাপ সিংয়ের একখানি চিঠি বের করলেন। এই পত্র মহারাজ গোলাপ সিং সেনাপতি হিয়ারসেকে লিখেছিলেন।

হিয়ারসে চিঠিখানি ভারতবর্ষীয় অফিসাদের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এই কাগজ টোটাব কাগজের তুলনায় চক্‌চকে দেখা যাচ্ছে। সিপাইরা এই চিঠির কাগজ ভাল করে পরীক্ষা করতে পারে।

এরপর হিয়াবসে বললেন, যদি তাবা এই কথায় বিশ্বাস না করে তাহলে সকলে শ্রীরামপুরে গিয়ে কাগজের প্রস্তুত করবার প্রণালী দেখে আসতে পারে।

১৯নং সিপাইদল ঘোরতর অবাধ্যতা দেখাচ্ছিলেন। সেনাপতি হিয়ারসে তাঁদের উদ্দেশ্য করে বললেন, ১৯নং সিপাইরা ঘোরতর অপবাধে লিপ্ত হয়েছে। গভর্ণমেণ্ট এ জন্যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন। বোধহয় গভর্ণমেণ্ট তাদেরকে নিরস্ত্র করতে আদেশ দেবেন। যদি আমি এরূপ আদেশ পাই তাহলে ইউরোপীয় ও এদেশের সমস্ত পদাতিক, অশ্বারোহী ও কামানরক্ষক সৈন্যকে এই আদেশ যেভাবে কাজে পরিণত হয় তা দেখবার জন্যে একত্র হতে হবে।

এরপর সেনাপতি বললেন, তোমাদের শত্রুরা এই কথা বলে বেড়াচ্ছে যে, বহুসংখ্যক অশ্বারোহী ও কামানরক্ষক হঠাৎ এসে তোমাদেরকে আক্রমণ করবে। তোমরা এই অলীক কথায় বিশ্বাস

রেখে ভীত ও উত্তেজিত হয়ে উঠেছ। কিন্তু আমার অনুমতি না পেলে কোন ইউরোপীয় সৈন্য ব্যারাকপুরে আসতে পারবে না। আমি যথাসময়ে এদের আসার খবর তোমাদের জানাবো। তোমরা কোন অপরাধ করোনি। তোমাদের বিরুদ্ধে কোন বিচার সপ্রমাণ হয়নি, সুতরাং তোমাদের ভয়ের কোন কারণ দেখা যাচ্ছে না। অফিসাররা তোমাদের আপত্তি ও তোমাদের অভিযোগ মনোযোগের সঙ্গে শুনবেন। তোমাদের জাতি ও ধর্মানুশাসনের কোনরকম ব্যাঘাত উপস্থিত হবে না। কিন্তু যদি তোমরা কোনরকম অবাধ্যতা দেখাও তাহলে তোমাদেরকে গুরুতর শাস্তিভোগ করতে হবে।

গম্ভীরস্বরে এই সব কথা বলার পর নীরব হলেন সেনাপতি হিয়ারসে।

সেনাপতির কথা শোনার পর নীরবে গম্ভীর ভাব নিয়ে কুচকাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্র হতে নিজেদের জায়গায় ফিরে এলেন সিপাইরা।

কিন্তু তাঁদের মন হতে ভয় দূর হলো না, স্তিমিত হলো না হৃদয়ের উদ্বেগভরা আকুলতা।

দ্বিতীয় বক্তৃতাতেও অকৃতকার্য হলেন সেনাপতি হিয়ারসে। এরূপ ঘটেছিল তাঁর নিজের দোষের জন্যে। এই সময়ে সকল দিক দেখে সবিশেষ বিবেচনা করে কথা বলা উচিত ছিল। মনের আবেগে হঠাৎ কোন কথা বলে ফেললে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত হতে পারে বক্তার সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন ছিল।

গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং আশঙ্কা করেছিলেন যে সেনাপতি বক্তৃতার দ্বারা সিপাইদিগকে আরও উত্তেজিত করে তুলবেন।

তাঁর সেই আশঙ্কা একেবারে ব্যর্থ হয়নি। ১৯নং সিপাইদলকে ব্যারাকপুরে এনে নিরস্ত্র করা হবে। নিরস্ত্রীকরণের সময় সকলেই সেখানে উপস্থিত থাকবে। সেনাপতি হিয়ারসে গম্ভীর স্বরে এই কথা সমবেত সিপাইদের কাছে বলেছিলেন।

যাঁদের সামনে বক্তৃতা হচ্ছিল তাঁরা এই কথার কিরূপ অর্থ করবে

বক্তা তা একবারও ভাবেননি। ১৯নং দলের সিপাইদের যে নিরস্ত্র করা হবে সে বিষয়ে আগে সাধারণকে জানান হয়নি।

গভর্ণর জেনারেল এই সময় প্রধান সেনাপতিকে লিখেছিলেন, ১৯নং দলের সিপাইরা তাড়াতাড়ি আসছে। ৩০শে মার্চ প্রাতঃকালে বোধহয় তারা ব্যারাকপুরে এসে পৌঁছবে। তাদেরকে যে নিরস্ত্র ও সৈনিকদল হতে বহিষ্কৃত করা হবে এ তারা নিশ্চিত জানে না। আমার বিবেচনায় এ কথা তাদের না বলাই ভাল।

কিন্তু সেনাপতি হিয়ারসে সবিশেষ বিবেচনা না করেই এই কথা ব্যারাকপুরের সিপাইদেরকে বলে ফেলেছিলেন।

এখন এই অবিবেচনার ফল ফললো। শান্তির জন্য বক্তৃতার ভাষা পরিণামে অমৃতের বিনিময়ে হলাহলের উদ্গীরণ করলে।

যখন সিপাইরা তাঁদের অধিনায়কদের মুখে শুনলেন যে তাঁদের সহযোগীদের নিরস্ত্র করা হবে তখন তাঁরা আবার ক্ষোভে, রোষে ও বিরাগে চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

তাঁরা ভাবলেন, ক্রমে সবাইকেই এভাবে নিরস্ত্র করা হবে। সাগরের ওপার হতে একদল ইউরোপীয় সৈন্য আনা হয়েছে। পরে আরও সৈন্য আসবে। ক্রমে সকল সিপাইদের হাতেই বলপূর্বক অপবিত্র রসযুক্ত টোটা দেওয়া হবে।

এরূপ চিন্তা করার পর ব্যারাকপুরের সিপাইরা গভীর মর্মবেদনায় উন্মত্তপ্রায় হলেন।

সকলেই অস্থির। সকলেই চিরন্তন জাতিমর্য্যাদা—চিরন্তন ধর্মানুশাসনের রক্ষার জন্যে ব্যস্ত। সকলের মুখেই এক কথা—'গোরা লোক আরা' অর্থাৎ গোরা সৈন্য আসছে।

এভাবে সিপাইরা মুহুঃমুর্হু ইউরোপীয় সৈন্যের আক্রমণের বিভীষিকা দেখতে লাগলেন। হৃদয়ের যে অগ্নি এতকাল ধরে অলক্ষ্যে জ্বলছিল এতদিন পরে তার শিখা চতুর্দিকে প্রসারিত হতে লাগলো।

ওদিকে সেনাপতি মিচেলের অধীনে একদল সিপাই ২০শে মার্চ

তারিখে বহরমপুর থেকে যাত্রা আরম্ভ করলেন। তাঁরা ৩০শে মার্চ ব্যারাকপুরে এলেন। পথে তাঁদের মধ্যে কোন রকম বিশৃঙ্খলা বা নিয়মভঙ্গের প্রকাশ দেখা যায়নি।

তাঁরা ব্যারাকপুরে এসে সরকারী আদেশের অপেক্ষায় দিন গুণতে লাগলেন।

এর মধ্যে সেনাপতি মিচেলের কাছে খবর এলো যে ব্যারাকপুরের সিপাইরা অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় আছেন। তাঁরা গোপনে ইংরেজ সরকারের পতন ঘটাবার জন্যে ষড়যন্ত্র করছেন। এমন কি তাঁরা আগের দিন অর্থাৎ ২৯শে মার্চ তারিখে একজন ইউরোপীয় অফিসারকে তরবারির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করেছেন।

এই সংবাদ মিথ্যে নয়। ২৯শে মার্চ তারিখে বিকেলে ব্যারাকপুরে সিপাইদের মধ্যে গোলযোগ দেখা দেয়। এইদিন সৈনিকনিবাসে সহসা এই খবব প্রচারিত হয় যে, ইউরোপীয় সৈন্য জাহাজে চেপে কলকাতায় আসছে। তারা এখন জাহাজ হতে নেমেছে। শীগ্‌গির ব্যারাকপুরে পৌছবে। ক্রমে ব্যারাকপুরের সৈনিকনিবাস গোরা সৈন্যে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

এই খবরটি কতদূর সত্যি তা কেউ বিচার করে দেখেননি।

কিন্তু খবর পাওয়া মাত্র সকলে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

ঐ দিনটি ছিল রবিবার।

ইউরোপীয় অফিসার ও সেনাপতিরা নিজেদের অবসর দিনে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করছিলেন। সিপাইদের মধ্যে কি ঘটছে কেউ তাঁরা তা খেয়াল করেনা।

সিপাইদের মধ্যে মঙ্গল পাঁড়ে নামে একজন সিপাই ছিলেন।

মঙ্গল পাঁড়ে বলিষ্ঠ ও তরুণ। যেমন গায়ের রঙ্ তেমনি চেহারা। ঠিক যেন রাজপুত্তুর।

তাঁর চরিত্রেও কোন রকম খুঁত ধরা পড়েনি। দীর্ঘ সাত বছর

ধরে তিনি ইংরেজ সরকারের অধীনে একান্ত বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য নিয়ে কাজ করে আসছেন। সেনাপতিরা এই তরুণ বয়স্ক সিপাইয়ের চরিত্রে কখনো কুটিলতা বা বিশ্বাসঘাতকতার আভাস পাননি।

ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুর মত মঙ্গল পাঁড়ে সর্বদা নিজের ধর্মানুগত অনুশাসনের অনুবর্তী হয়ে চলতেন।

ঐদিন মঙ্গল পাঁড়ে ভাঙের নেশা .করেছিলেন। সেই সময় ইউরোপীয় সৈন্যদের আসার খবর চারিদিকে রটে গেল।

উত্তেজিত মঙ্গল পাঁড়ে আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন, ভয়ঙ্কর সময় উপস্থিত হয়েছে। সকলেরই জাতিনাশ হবে; ফিরিঙ্গীর হাতে চিরন্তন ধর্ম, চিরাচরিত আচার-ব্যবহার সমস্তই বিনষ্ট হয়ে যাবে।

উত্তেজনায় তরুণ সিপাই মঙ্গল পাঁড়ে যুদ্ধবেশে সজ্জিত হলেন। একহাতে তরবারি আর অন্যহাতে গুলিভরা পিস্তল নিয়ে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

বাইরে এসে তাঁর দলের অন্যান্য সিপাইদের উদ্দেশ্য করে বললেন, ভাই সব, তোমরা সকলে আমাকে অনুসরণ করো। কেউ যেন এই গরুর চর্বিমেশানো টোটা স্পর্শ কোরো না। এই টোটার আবরণ দাঁত দিয়ে কেটে নিজেদের পরলোকের সুখে জলাঞ্জলি দিও না।

যুদ্ধের সময় যাঁরা ভেরীধ্বনি করে সকলকে সমবেত করে থাকে তাদের একজন দাঁড়িয়েছিলেন মঙ্গল পাঁড়ের কাছে।

মঙ্গল পাঁড়ে তাঁকে আদেশ করলেন, তুমি ভেরীধ্বনি করে সকলকে একত্র হতে বলো।

তিনি কিন্তু শুনলেন না মঙ্গল পাঁড়ের কথা।

তখন মঙ্গল পাঁড়ে উত্তেজিত অবস্থায় ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে সৈনিকনিবাসের সামনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

এমন সময় মঙ্গল পাঁড়ে দেখলেন, একজন ইউরোপীয়ান অফিসার আসছেন তাঁর দিকে।

তাই দেখে উত্তেজিত এবং উন্মত্তভাবে মঙ্গল পাঁড়ে অফিসারটিকে লক্ষ্য করে পিস্তর ছুঁড়লেন।

কিন্তু পিস্তলের গুলি লক্ষ্যভেদ করতে অসমর্থ হলো। অফিসারটির কিছু হলো না। গুলি তার গায়ে না লেগে পড়লো অন্যত্র।

এইসময় ৩৪নং দলের সিপাইরা কাছেই ছিলেন। তাঁরা মঙ্গল পাঁড়ের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করেননি কিন্তু মঙ্গল পাঁড়েকে নিরস্ত্র করতেও প্রয়াস পাননি।

এর মধ্যে একজন হাবিলদার অ্যাডজুটান্টের ঘরে গিয়ে খবর দেন।

লেফটেনান্ট বগ নামে একজন ইংরেজ পুরুষ ৩৪নং সিপাই দলের অ্যাডজুটান্টের পদে বহাল ছিলেন।

তিনি হাবিলদারের কাছ থেকে এই খবর পাওয়া মাত্র যোদ্ধার বেশে সজ্জিত হলেন। তার কটিদেশে অসি লম্বমান হলো, হাতে রইলো গুলিভরা পিস্তল।

বগ ঘোড়ায় চড়ে তীর বেগে চলে এলেন ঘটনাস্থলে। এসে গম্ভীর স্বরে বলতে লাগলেন, কৈ, কোথায় সে ?

বগের কাছে একটা কামান ছিল। মঙ্গল পাঁড়ে এই কামানের পেছনে গিয়ে লুকিয়ে ছিলেন্। সেখান থেকে তিনি বগের উদ্দেশ্যে পিস্তল ছুঁড়লেন।

কিন্তু পিস্তলের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। বগের গায়ে লাগলো না।

গুলি গিয়ে লাগলো ঘোড়ার মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে সে ভূতলশায়ী হলো। ঘোড়ার সঙ্গে বগও পড়ে গেলেন মাটির ওপর।

বগ নিমেষের মধ্যে উঠে আক্রমণকারীর দিকে পিস্তল ছুঁড়লেন।

কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো।

বগ তখন উত্তেজিত অবস্থায় কটিদেশ হতে অসি নিষ্কাশিত করলেন।

এই সময় আর একজন সৈনিক পুরুষ অসি হাতে তাঁর সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এলেন।

মঙ্গল পাঁড়েও অসি হাতে এগিয়ে এলেন।

ক্ষণিকের মধ্যে অসিযুদ্ধ আরম্ভ হলো। একদিকে মঙ্গল পাঁড়ে অন্যদিকে যুদ্ধকুশল দু'জন ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ।

তিন জনের হাতেই শাণিত অসি। তিনজনেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে ধরাশায়ী এবং অনন্ত নিদ্রার দেশে পাঠাবার জন্যে কৃতসঙ্কল্প।

ওঁদের চারিদিকে দাঁড়িয়েছিলেন প্রায় চারশো সিপাই। তাঁরা কেউ কোন পক্ষ অবলম্বন করলেন না। সকলেই নীরবে গম্ভীরভাবে উপস্থিত ঘটনার গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করছিলেন।

অসীম সাহসে মঙ্গল পাঁড়ে অসি চালনা করতে লাগলেন।

তাঁর এই প্রকার অসি চালনার ফলে প্রতিদ্বন্দ্বীর দেহ ক্ষত-বিক্ষত হতে লাগলো।

তেজস্বী সৈনিক পুরুষদ্বয়ের মধ্যে কেউ তাঁকে নিরস্ত করতে পারলেন না।

স্বধর্ম, স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতি একান্ত ও গভীর প্রীতিবশত মঙ্গল পাঁড়ের বাহুতে স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় লক্ষগুণ শক্তির আবির্ভাব হলো।

মঙ্গল পাঁড়ের বীরত্বপূর্ণ অসিচালনার গুণে লেফটেনাণ্ট বগ ও তাঁর সহকারীর জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠলো।

এই দৃশ্য দেখার পর একজন মুসলমান সৈনিক পুরুষের প্রাণ অধীর হয়ে উঠলো। তিনি ছুটে এসে উত্তেজিত মঙ্গল পাঁড়েকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর নাম পলটু। তিনি ছিলেন নিরস্ত্র। তাই মঙ্গল পাঁড়ের অসির আঘাতে তাঁর বাম বাহু ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল।

তবু পলটু ছেড়ে দিলেন না মঙ্গল পাঁড়েকে।

এভাবে পলটুর জন্যে লেফটেনাণ্ট বগ ও তাঁর সঙ্গীর প্রাণ রক্ষা হলো। তিনি যদি না আসতেন তাহলে বীর মঙ্গল পাঁড়ের অসির আঘাতে বগ ও তাঁর সহকারী চিরনিদ্রায় শায়িত হতেন।

লেফটেনাণ্ট বগ ও তাঁর সহকারী প্রতিদ্বন্দ্বীর অসির আঘাতে

কাতর হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের দেহের আবৃত স্থান হতে অনর্গল শোণিত-ধারা বইছিল।

তাঁরা উভয়েই রক্তঝরা শরীরে কাঁপতে কাঁপতে নিজেদের ঘরে গেলেন।

যাবার সময় সেনাপতি বগ সমবেত সিপাইদের লক্ষ্য করে বললেন, ভীরু—নরাধম পাষণ্ড তোমাদের সামনে একজন অফিসারকে অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হতে দেখলে অথচ কেউ তার সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এলে না?

সিপাইরা কোন কথা বললেন না। তাঁরা বরং বিদ্রূপ করতে লাগলেন। তাঁরা বগের দিকে একবার তাকালেনও না। ধীর পায়ে এবং গম্ভীর মেজাজে সৈনিকনিবাসের সামনে পদ-চারণা করতে লাগলেন।

ওদিকে কয়েকজন সিপাই পলটুর কাছে এসে বললেন, এই তুমি পাঁড়েকে ছেড়ে দাও।

না, ছাড়বো না, উত্তেজিত হয়ে উত্তর দিলেন পলটু। না ছাড়লে তোমাকে গুলি বিদ্ধ করে বধ করা হবে, বললেন সিপাইরা।

পলটু নিরুত্তর রইলেন। তিনি তাকিয়ে ছিলেন লেফটেনাণ্ট বগের দিকে। তাঁর মনে এই বাসনা ছিল যে বগ ও তাঁর সহকারী নিরাপদে তাঁদের আবাসস্থলে পৌঁছে গেলে তখন ছেড়ে দেবেন মঙ্গল পাঁড়েকে।

তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ হলো। বগ ও তাঁর সহকারী আবাসস্থলে ফিরে গেলে পলটু পাঁড়েকে বাহুমুক্ত করলেন।

এই সময় সেনানিবাসের কাছে একজন সুবেদার ও কুড়িজন সিপাই পাহারার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরাও মঙ্গল পাঁড়েকে ধরবার জন্যে কোনরকম চেষ্টা করেননি।

এর দ্বারা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে সিপাইরা ইউরোপীয় অফিসারদের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। তাঁদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ এত বেশী প্রবল ছিল যে তাঁরা এই কাজে

অর্থাৎ বিদ্রোহের কাজে পূর্ণশক্তি সঞ্চয় করতে সমর্থ হয়েছিল। তাই দেখি দুর্বল ও সামান্য অস্ত্রের অধিকারী হয়েও তাঁরা শক্তিমান ইউরোপীয় শাসকদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতেও বিন্দুমাত্র পেছ-পা হননি।

গোলযোগের খবর শুনলেন সেনাপতি হিয়ারসে। তার দুটি পুত্র কাছে বসেছিল। তারাও পিতার সঙ্গে বিদ্রোহী সিপাই মঙ্গল পাঁড়ের বিষয় অনেক কিছু জানতে পারলো।

খবর পাওয়া মাত্র সেনাপতি হিয়ারসে যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হয়ে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে চলতে লাগলেন কুচকাওয়াজের প্রাঙ্গণে।

তাঁর অনুগামী হলো তাঁর দুই যোগ্য পুত্র। কুচকাওয়াজের জায়গায় এসে সেনাপতি শুনলেন, সিপাই মঙ্গল পাঁড়ে আগের মত উন্মত্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আগের মত উন্মত্তভাবে নিজেদের পবিত্র ধর্ম, নিজেদের চিরন্তন জাতিমর্য্যাদা ও নিজেদের কুলক্রমাগত আচার-ব্যবহার রক্ষার জন্যে অপরাপর সিপাইকে তাঁর অনুগামী হতে বলছেন। চারিদিকে অনেক সিপাই। সামরিক বেশে, কেউ বা খালি গায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কেউ উত্তেজিত যুবকের কথার কোন উত্তর দিচ্ছেন না। কিংবা উত্তেজিত যুবককে ধরবার কোন চেষ্টা করছেন না। তাঁরা যে সরকারের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন—সরকারকে সর্বদা নিরাপদে রাখার জন্যে যে পবিত্র ব্রতে দীক্ষিত হয়েছেন এখন সে বিষয় তাঁদের মনে হচ্ছে না। সনাতন ধর্মের অবমাননার আশঙ্কায় এখন তাঁরা সরকারকে শত্রুভাবে দেখছেন। সরকারের দোষে এখন তাঁদের সে পবিত্র প্রতিজ্ঞা, সে পবিত্র ব্রত, সে পবিত্র বীরোচিত গুণের বিষয় সমস্তই স্মৃতিপথ হতে চলে গেছে।

সিপাইরা বিরক্ত ও উত্তেজিত হলেও সে সময়ে মঙ্গল পাঁড়ের মত প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করেননি। মঙ্গল পাঁড়ের মত ইউরোপীয়ান

অফিসার বা গোরা সৈনিকদের নিহত করার প্রবৃত্তি মনের মধ্যে পোষণ করেননি।

তাঁদের ঐ প্রকার নিষ্ক্রিয় ও কাপুরুষোচিত ভাব লক্ষ্য করে মঙ্গল পাঁড়ে তাঁদের উদ্দেশ্যে নানা প্রকার কটূক্তি বর্ষণ করলেন এমনকি ধর্মহন্তা ফিরিঙ্গীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করার জন্যে তাঁদেরকে পরলোকে অনন্ত শাস্তির ভয় দেখাচ্ছিলেন।

কিন্তু সিপাইরা তখন কি করতে হবে তা কিছুই ঠিক করতে পারেননি।

গভীর বিরাগে তাঁদের অন্তঃকরণ বিচলিত হয়েছিল। গভীর মর্মবেদনায় তাঁদের হৃদয়গ্রন্থি ছিন্নপ্রায় হচ্ছিল। কিন্তু সে সময়ে এই বিরাগ ও মর্মবেদনা কোন ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত করেনি।

সিপাইরা আগে যেমন নীরব ও গম্ভীরভাবে ছিলেন এখনও সেরূপ নীরবে ও গম্ভীরভাবে রইলেন।

এই নিস্তব্ধতা শান্তির অনুকূলে নয় বা এই ঔদাসীন্য সরকারের বিরুদ্ধ কর্মে ঔদাসীন্য নয়। এ হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী প্রলয়কাণ্ডের পূর্ব সূচনা। ভীষণ ঝটিকার আগে প্রকৃতিকে যেরূপ নিস্তব্ধ দেখা যায় এ নিস্তব্ধতাও তেমনি।

পুত্রদের সঙ্গে সেনাপতি হিয়ারসে এলেন ঘটনাস্থলে। অফিসারদের প্রশ্ন করলেন, উত্তেজিত সিপাইযুবক মঙ্গল পাঁড়েকে এখনো কেউ অবরোধ করেনি কেন?

উত্তরে অফিসাররা বললেন, আমরা আদেশ দিয়েছিলুম। কিন্তু জমাদার আমাদের সেই আদেশ পালন করেনি।

এই কথা শোনার পর সেনাপতি সদম্ভে তীব্র স্বরে নিজের পিস্তল উঁচিয়ে বললেন, কি? আদেশ পালন করে নি? আমি বলছি, যে আমার সঙ্গে অগ্রসর না হবে এই পিস্তলের গুলিতে তার প্রাণ যাবে।

একজন অফিসার সেনাপতি হিয়ারসেকে বললেন, আপনি সাবধান

হবেন। উন্মত্ত সিপাই-এর হাতে রয়েছে গুলিভরা বন্দুক। এখুনি কোন বিপদ ঘটে যেতে পারে।

সেনাপতি অফিসারের কথায় কর্ণপাত করলেন না। তিনি ভয়শূন্য ও গম্ভীর স্বরে বললেন, তার বন্দুককে আমি ভয় করি না।

অফিসার নীরব হলেন।

এবার হিয়ারসে মঙ্গল পাঁড়ের দিকে এগোতে লাগলেন। তাঁকে অনুসরণ করলো তাঁর দুই পুত্র এবং রস নামে একজন সৈনিক।

সেনাপতির এমন বীরত্বভাব দেখে জমাদার ও অন্যান্য সিপাইরা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁর সামনে আর কোনরকম অবাধ্যতার পরিচয় দিলেন না। যে সব সিপাই পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন তাঁরাও কোন বিরুদ্ধভাব দেখালেন না। সকলেই নীরবে ও ও উদ্বিগ্নচিত্তে সেনাপতির অনুগমন করলেন।

মঙ্গল পাঁড়ে বন্দুক হাতে করে অধীরতার সঙ্গে পদচারণা করছিলেন।

এমন সময় সকলে এলো তাঁর কাছে। মঙ্গল পাঁড়ে দেখলেন হিয়ারসেকে। তাঁর দুটি রক্ত চক্ষুতে জ্বলে উঠলো প্রতিহিংসার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। তিনি প্রধান সেনাপতিকে লক্ষ্য করে বন্দুক ওঠালেন।

তাই দেখতে পেয়ে হিয়ারসের অন্যতম পুত্র জন হিয়ারসে বললে, বাবা, উন্মত্ত সিপাই আপনাকে লক্ষ্য করে বন্দুক তুলেছে।

পুত্রের কথা শুনে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না সেনাপতি। নির্ভয়ে বললেন, জন! আমার যদি মৃত্যু হয় তুমি গিয়ে বিদ্রোহীর প্রাণনাশ কোরো।

কিন্তু মঙ্গল পাঁড়ে হিয়ারসের দিকে বন্দুক ছুঁড়লেন না।

তিনি এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলেন। তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে কেউ তাঁর সঙ্গে বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করলেন না। কেউই নিজেদের ধর্মরক্ষার জন্যে ফিরিঙ্গীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন না।

তখন তিনি বিরাগে এবং হতাশ্বাসে নিজের বন্দুক নিজের দিকে ধরে পা দিয়ে ঘোড়া টিপে দিলেন।

গুলি সবেগে তাঁর শরীরের মধ্যে প্রবেশ করলো।

আহত ও জ্ঞানশূন্য অবস্থায় ভূতলশায়ী হলেন বীর মঙ্গল পাঁড়ে।

ওদিকে হিয়ারসে দেখলেন, মঙ্গল পাঁড়ে তাঁর প্রাণনাশ না করে নিজের প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করছেন।

তখন তিনি কাল হরণ না করে চিকিৎসককে ডেকে পাঠালেন।

চিকিৎসক এসে মঙ্গল পাঁড়ের ক্ষতস্থান পরীক্ষা করলেন। পরে তাঁকে নিয়মিত চিকিৎসার জন্য চিকিৎসালয়ে পাঠানো হলো।

এরপর হিয়ারসে সিপাইদের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে অশ্বচালনা করতে করতে তাঁদের উদ্দেশ্যে আগের মত বলতে লাগলেন, হে আমার সৈনিকগণ! তোমরা আগের মত অকারণে ভীত হয়ে পড়ছে। তোমরা নিশ্চয় করে জেনে রেখো, সরকার তোমাদের ধর্মের ওপর কখনো হস্তক্ষেপ করবেন না। এক ব্যক্তি যখন প্রকাশ্যভাবে গভর্ণমেন্টের বিরোধী হয়ে উঠেছে, ইউরোপীয় অফিসারদের হত্যায় উদ্যত হয়েছে তখন তার অবরোধ করা হয়নি। সিপাইদের কর্তব্যে এমন ঔদাসীন্য দেখে আমি যারপরনাই দুঃখিত হয়েছি।

সেনাপতির এই কথা শুনে সমবেত সিপাইরা বলে উঠলেন, সে মাতাল হয়েছিল। ভাঙের নেশায় উত্তেজিত হয়েছিল।

উত্তরে হিয়ারসে বললেন, যদি তাই হয় তাহলে পাগলা হাতী বা পাগলা কুকুর তোমাদেরকে আক্রমণ করলে তোমরা যেমন ওকে গুলি কর তেমনি ভাবে তাকে গুলি করলে না কেন?

সেনাপতির কথা শুনে সিপাইদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ বলে উঠলো, তার হাতে যে গুলিভরা বন্দুক ছিল।

এই কথা শোনার পর গম্ভীর হলো সেনাপতির মুখ। ঘৃণায় ও বিরাগে তিনি সিপাইদের বললেন, তোমরা গুলিভরা বন্দুক দেখে ভয় পাও?

তার এই বীরত্ব ব্যঞ্জক কথার প্রত্যুত্তর দিতে পারলেন না সিপাইরা।

সেনাপতি আগের মত ঘৃণা ও বিরাগের সঙ্গে সেই স্থান ত্যাগ করলেন।

এবার থেকে তাঁর মনে দৃঢ় ধারণা হলো যে সিপাইরা গভর্ণমেন্টের ওপর বিরক্ত হয়ে তাঁদের বীর ধর্ম হতে বিচ্যুত হয়েছেন। এখন আর তাঁরা সেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সেই বিশ্বস্ত, সেই সাহসসম্পন্ন পুরুষ নন।

সন্ধ্যের সময় নিজের কুটীরে ফিরে এলেন সেনাপতি। তাঁর মনে নানারকম চিন্তা এসে জমায়েত হলো। কিন্তু তিনি চিন্তা স্রোতের প্রাবল্যে আদৌ বিচলিত হলেন না। বিস্মিত হলেন না তাঁর সৈনিক ধর্ম। নিজের পূর্ণ দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন রইলেন।

১৯ নং দলের সিপাইদের নিরস্ত্রীকরণ করা হবে এই খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সিপাইদের মধ্যে সকলেই জানতে পেরেছিলেন এই খবর।

সেনাপতি হিয়ারসে এই দণ্ডাদেশ কাজে পরিণত করার অনুমতি পান স্বয়ং গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং-এর কাছ থেকে একজন প্রবীণ সেনাপতির মাধ্যমে।

নিরস্ত্রীকরণের দিন স্থির হয়েছিল ৩১শে মার্চ। ঐদিন সকালে সমস্ত ইউরোপীয় ও ভারতীয় সৈন্যের সামনে বহরমপুরের এই সৈনিকদল আপনাদের চিরপবিত্র ব্রত হতে স্খলিত হবে। বীরবেশ ও বীরচিত্ত পরিত্যাগ করে জগতের সামনে নিজেদের ক্ষুদ্রতা ও নীচতার পরিচয় দেবে। হয়তো এই সময়ে দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত সিপাইরা নিজেদের অস্ত্র পরিত্যাগে অসম্মত হতে পারে। হয়তো এই সময় প্রেসিডেন্সী বিভাগের সিপাইরা তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ইউরোপীয়দেরকে বাধা দিতে পারে। ব্যারাকপুরে অবস্থানকারী ইউরোপীয়গণ এরূপ চিন্তা করছিলেন।

তাঁদের মধ্যে কারও কারও বিশ্বাস জন্মাল যে নিরস্ত্রীকরণের আগের দিন সমস্ত সিপাই গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে একত্রিত হবেন। উত্তেজিত সিপাইরা সমস্ত ইউরোপীয় অফিসার ও তাদের পরিবারবর্গকে বধ করবেন।

ব্যারাকপুরের সৈনিকআবাস ইউরোপীয়দের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল। জনৈক ইউরোপীয় অফিসার মঙ্গল পাঁড়ের অসির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিলেন।

সুতরাং অনেকের মনে ভয় প্রবল আকার ধারণ করলো।

অনেক ইংরেজ মহিলা এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে কিছু দিনের জন্যে ব্যারাকপুর ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে বাস করতে লাগলেন।

৩০শে মার্চ। ১৯নং দলের সিপাইরা বারাসতে এসে অবস্থান করতে লাগলেন।

এই সময় ব্যারাকপুর থেকে সিপাইদের কয়েকটি গুপ্তচর তাদের কাছে এলেন। চরেরা এইসব প্রাচীন বন্ধুকে আগ্রহসহকারে তাদের সহকারী হতে অনুরোধ করলেন, তারা বললেন, যদি আপনারা ধর্মের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করেন, আপনাদের অফিসারদিগকে বধ করে আমাদের সঙ্গে মিলিত হন তাহলে ব্যারাকপুরের ও কলকাতার ইউরোপীয় সৈন্যের পরাজয় সহজসাধ্য হয়ে উঠবে।

কিন্তু বহরমপুরের সিপাইরা এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। তাঁরা ব্যারাকপুরের সৈনিকদলের চরদের বললেন, পূর্বকৃত কাজের জন্যে আমাদের মনে এসেছে অনুতাপ। আমরা আমাদের রাজভক্তি দেখাবার জন্যে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় যুদ্ধ করতে যেতে প্রস্তুত আছি। আমাদের হৃদয় অন্নদাতা প্রতিপালকের অনিষ্ট চিন্তায় অধীর হয়নি। আমরা কখনো স্বইচ্ছায় গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিনি। আমরা যাঁদের নুন খেয়েছি, যাঁদের শিক্ষাবলে বীরেন্দ্র সমাজে বরণীয় হয়েছি, যাঁদের অস্ত্রশস্ত্রের মহিমায় সমরে বিজয়লক্ষ্মীর সম্বর্দ্ধনা করতে

পেরেছি এখন তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কেমন করে করবো ?

কোন জবাব দিতে পারলেন না ব্যারাকপুরের গুপ্তচরেরা। তাঁরা নীরবে বহরমপুরের সিপাইদের বক্তব্য শুনলেন।

অতঃপর তাঁরা নিরাপদে এবং নিঃশব্দে প্রত্যাবর্তন করলেন নিজেদের আস্তানায়।

১৯নং দলের সিপাইদের সঙ্গে পরিচয় ছিল ব্যারাকপুরের সিপাইদের কিন্তু তা সত্বেও বহরমপুরের সিপাইরা ব্যারাকপুরের সিপাইদের সামনে তাঁদের মনের গুপ্ত অভিসন্ধি প্রকাশ করলেন না।

তাঁরা ধীরভাবে নিজেদের দণ্ড গ্রহণের জন্যে তৈরী হতে লাগলেন।

৩০শে মার্চ অতীত হলো। মধুর বসন্ত কালের প্রকাশ ঘটেছে চারিদিকে। প্রকৃতির বিষণ্ণ শ্যামলিমায় লেগেছে বসন্তের সতেজ আমেজ। চারিদিকের বাতাস সুগন্ধ ফুলের সৌরভে ভরপুর। বহরমপুরের হতভাগ্য সব অপরাধী সৈনিক পুরুষরা প্রকৃতির এরূপ মনোরম পরিবেশের সৌন্দর্য্য এবং স্নিগ্ধতা উপলব্ধি করতে পারছেন না। প্রকৃতির কোমলতা তাঁদের অন্তরে জাগিয়ে তুললো না বিন্দুমাত্র সুখানুভূতি। প্রভাতের নির্মল আলোকধারায় তাঁদের হৃদয়স্থিত জমাট অন্ধকার অপসারিত হলো না।

তাঁরা শান্তভাবে সেনাপতির আদেশে এই শেষ বার সামরিক বেশে ব্যারাকপুরের দিকে এগোতে লাগলেন।

তাঁদের হৃদয় গভীর দুঃখের আবেগে অধীর হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা বাইরে কোনরকম অধীরতার পরিচয় দিলেন না।

চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রমের জন্যে অনুতপ্ত হৃদয়ে গুরুতর দণ্ডের জন্যে ভীতচিত্তে এই সৈনিকদল তাঁদের নির্দিষ্ট স্থানে যেতে লাগলেন।

ব্যারাকপুর হতে এক মাইল দূরে একটি স্থানে সেনাপতি হিয়ারসে অপেক্ষা করছিলেন ১৯নং দলের সিপাইদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য।

তাঁরা এলেন হিয়ারসের সামনে। হিয়ারসে তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে এলেন কুচকাওয়াজের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে। ওখানে প্রেসিডেন্সী বিভাগের সমস্ত ইউরোপীয় এবং এদেশীয় সিপাইরা অপেক্ষা করছিলেন।

দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত সিপাইরা এই প্রশস্ত প্রাঙ্গণে এসে নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়ালেন।

তাঁদের সামনে রাখা হয়েছিল সারি সারি কামান। ঐ সকল কামানের পাশে যোদ্ধার বেশে দাঁড়িয়ে ছিল ইউরোপীয় সৈন্যরা।

নিরস্ত্রীকরণের সময়ে যদি কেউ অবাধ্যতা দেখায় তাহলে তাঁকে সমুচিত শাস্তি দেবার জন্যে ঐ কামানগুলি সাজিয়ে রাখা হয়েছিল।

কিন্তু সিপাইরা অবাধ্যতা দেখালেন না। তাঁদের বীরোচিত সম্মানের এই অধোগতির সময়েও তাঁরা সেনাপতির আদেশ পালনে বিমুখ হলেন না।

তাঁরা নীরবে দণ্ডায়মান অবস্থায় সেনাপতির বক্তৃতা ও গভর্ণমেণ্টের আদেশ শুনলেন।

নীরবে নিজেদের দেহ হতে সাজপোষাক এবং সামরিক চিহ্নগুলি খুলে দিলেন।

অদূরে দাঁড়িয়েছিলেন ৩৪নং দলের সিপাইরা। তাঁরাও নীরবে নিজেদের পুরানো বন্ধুদের এইপ্রকার অধোগতি চেয়ে দেখলেন।

দু'দিন আগে এই সিপাইরা তাঁদের সেনাপতির কাছে অবিশ্বস্ত বলে আখ্যাত হয়েছিলেন। দু'দিন আগে এই দলের মঙ্গল পাঁড়ে নিষ্কাসিত অসি নিয়ে ইউরোপীয় অফিসারকে খুন করতে উদ্যত হয়েছিলেন। আজ ভিন্ন অবস্থা। আজ অনেক প্রাক্তন বিদ্রোহী সিপাই সেনাপতিকে উচিত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নানাপ্রকার শলাপরামর্শ দিতে লাগলেন যাতে ১৯নং দলের কোন সিপাই উত্তেজিত হয়ে কোনরকম গোলযোগ না ঘটাতে পারে।

কিন্তু তাঁদের এরূপ অনুমান অসত্য বলে প্রমাণিত হলো। ক্ষণিকের তরেও তাঁরা কোনরকম গোলমাল করেননি।

সবকিছু হয়ে গেল ধীর-স্থির এবং শান্তভাবে। দণ্ডিত সিপাইরা অস্ত্র পরিত্যাগ করে আগের মত নীরবে বিষণ্ণভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

হিয়ারসে তাঁদের লক্ষ্য করে সদয়ভাবে এবং স্নেহ সহকারে বললেন, গভর্ণমেণ্টের আদেশে তারা সৈনিক আবাস হতে বহিষ্কৃত হলো বটে কিন্তু তাদেরকে যেসব পরিচ্ছদ দেওয়া হয়েছে সেইসব তাদের গা হতে খুলে নেওয়া হবে না। তারা নিজেদের সেনাপতির আদেশের অনুবর্তী হয়ে ধীরভাবে বহরমপুর হতে ব্যারাকপুরে এসেছে। এই ধীরতার পুরস্কার স্বরূপ গভর্ণমেণ্ট নিজের ব্যয়ে তাদেরকে তাদের আপন আপন বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতে প্রস্তুত আছেন।

সেনাপতির এই শেষ বাক্য নিরস্ত্র সিপাইদের মর্মে প্রবেশ করলো। সকলেই এই দয়া ও শিষ্টতার জন্যে সেনাপতিকে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন।

সিপাইগণ স্বীকার করলেন, আমাদের কোন দোষ নেই। আমরা অন্যের প্ররোচনায় সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলাম। তার ফলে আজ এই দণ্ড ভোগ করতে হচ্ছে। এ আমাদের অদৃষ্টের দোষ। আর এই অদৃষ্টকে চালনা করেছে ৩৪নং দলের সিপাইরা। তাদের শাস্তি দিতে আমরা প্রস্তুত আছি।

এই সিপাইদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে সেনাপতি হিয়ারসেকে জানালেন, আমাদেরকে অন্ততঃ দশ মিনিটের জন্যে পুনরায় অস্ত্র ধারণ করতে আদেশ দিন। আমরা ৩৪নং সিপাইদের সঙ্গে উপস্থিত বিষয়ের সমুচিত মীমাংসা করে নিই।

১৯নং দলের সিপাইরা নিরস্ত্র হলে সেনাপতি হিয়ারসে অন্যান্য সিপাইদেরকে বললেন, এই সৈনিকদলের মধ্যে চারশো ব্রাহ্মণ ও দেড়শো রাজপুত আছে। এরা সকলেই নিজেদের বাড়ী যেতে অনুমতি

পেল। এরা সকলেই ইচ্ছানুসারে নিজেদের পবিত্র তীর্থস্থানে যেতে পারবে। এদের পূর্বপুরুষেরা যেসব দেবতার উপাসনা করেছেন এরাও সেই সকল দেবতার উপাসনা করতে পারবে। গভর্ণমেণ্ট এদের চিরন্তন ধর্মের চিরাচরিত আচার-ব্যবহারের ওপর হস্তক্ষেপ করবে না। গভর্ণমেণ্ট সকলের ধর্মনাশে উদ্যত হয়েছেন বলে যে জনরব প্রচারিত হয়েছে এতে প্রমাণ হয়েছে যে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

সমবেত সিপাইরা নীরবে এবং ধীরভাবে শুনলেন সেনাপতির কথা।

যখন তাঁদেরকে আবাসগৃহে যেতে অনুমতি দেওয়া হলো তখন তাঁরা নীরবে ও ধীরভাবে নিজের নিজের জায়গায় যেতে লাগলো।

তখন বেলা প্রায় ৯টা। এই সময়ের মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ হয়ে গেল।

ইউরোপীয় রক্ষকের অধীন হয়ে নিরস্ত্র সিপাইরা ব্যারাকপুর হতে যাত্রা করলেন।

যাবার সময় তাঁরা আবার সেনাপতিকে আশীর্বাদ করে গেলেন।

সেনাপতি হিসারসে অত্যন্ত দুঃখপূর্ণ হৃদয়ে বিদায় দিলেন ১৯নং দলের সিপাইদের। তাঁর হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হতে লাগলো। ৩১শে মার্চ তারিখের প্রাতঃকালে তাঁকে যে কাজ করতে হলো নিজের জীবনে তিনি আর কখনো তার চেয়ে অধিকতর বেদনাদায়ক কাজে লিপ্ত হননি। কারণ এই দিন তাঁকে একটি একান্ত বিশ্বস্ত সিপাই দলকে নিরস্ত্র ও সৈন্যশ্রেণী হতে বহিষ্কৃত করতে হলো।

সে যাক, এই কাজটি যে নির্বিঘ্নে শেষ করতে পেরেছেন তার জন্যে ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ জানালেন সেনাপতি হিয়ারসে।

ওদিকে গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং-এর মন শান্ত ও সুস্থির হলো যখন তিনি শুনলেন যে ১৯নং সিপাইদলকে নির্বিঘ্নে নিরস্ত্রীকরণ করা হয়েছে।

খবর পাওয়া মাত্র লর্ড ক্যানিং প্রধান সেনাপতির কাছে এক টেলিগ্রাম পাঠালেন। সেই সঙ্গে সমস্ত নগরে এই সংবাদটি ব্যাপক ভাবে প্রচারিত হলো।

এর ফলে নগরবাসী ইউরোপীয় অফিসার ও সৈনিকরা শান্তির নিঃশ্বাস ফেললো। কারণ এতকাল তারা দেশীয় সশস্ত্র এবং বিদ্রোহী সিপাইদের বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের কথা চিন্তা করে সদাসর্বদা সন্ত্রস্ত থাকতো।

এবার তাদের মন থেকে সেই আশঙ্কা চিরতরে দূর হয়ে গেল।

ইংরেজ সরকারও খানিকটা স্বস্থির হলেন। এতদিন ১৯নং দলের সিপাইদের কথা চিন্তা করতে হতো। এবার আর তাদের কথা চিন্তা করতে হবে না। কারণ তারা বিনাসর্তে সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আর সরকারও তাদের দোষ ক্ষমা করে তাদের নিজেদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং তাদের প্রতি সরকারী কর্তব্য একপ্রকার শেষই হয়েছে বলা যেতে পারে।

তাই সরকার এবার ৩৪নং দলের সিপাইদের বিষয় চিন্তা করবার অবসর পেলেন।

৬ই এপ্রিল, ১৮৫৭ সাল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি বিখ্যাত স্মরণীয় দিন। এই দিনে মঙ্গল পাঁড়ের বিচার হলো।

বিচারপতিরা মঙ্গল পাঁড়ের অপরাধের বিষয়গুলি বেশ ভালভাবে তন্নতন্ন করে বিচার করবার পর একবাক্যে রায় দিলেন—মঙ্গল পাঁড়ের ফাঁসি হোক।

ফাঁসির আদেশ শুনেও মঙ্গল পাঁড়ে কিছুমাত্র ভীত হলেন না। কারণ তিনি ইতিমধ্যেই চেয়েছিলেন এই নিষ্ঠুর ও নির্দয় মানবসমাজ হতে বিদায় নিতে। তাঁর যে স্বপ্ন ছিল তা তাঁর সহকর্মীদের দ্বারা সফল করাতে পারলেন না ভেবে তার আপশোষের অন্ত ছিল না। রাগে ক্ষোভে ও অভিমানে মঙ্গল পাঁড়ের মন পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিল।

আর মন একবার ভাঙলে তাকে জোড়া দিয়ে দৃঢ়ভাবে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা ভয়ঙ্কর কষ্টকর।

সিপাইয়ের কাজ করলেও মঙ্গল পাঁড়ের এটুকু বিচার শক্তি ছিল যে তাঁর স্বপ্ন অর্থাৎ ফিরিঙ্গীদের হাত থেকে নিজের ধর্ম, জাতি ও দেশকে রক্ষা করার সংগ্রাম যদি ব্যর্থ হয়ে যায় তাহলে তাঁর কপালে ইংরেজ শাসকের দণ্ড নেমে আসতে বেশী দেরী হবে না। এইরূপ চিন্তা করেই তিনি বন্দুকের গুলির দ্বারা নিজের হাতে জীবন বিনাশ করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসের জন্যে তিনি এই কাজে ব্যর্থকাম হন।

আহত অবস্থায় তিনি ইংরেজের হাতে ধরা পড়লেন। তাঁর ভাগ্যের খাতায় যে দুর্দশা ও নির্য্যাতনের লিপি লেখা ছিল তা সত্য হয়ে প্রকাশিত হলো জীবনের বাস্তব ঘটনার মাধ্যমে।

সহকর্মীদের অসহযোগিতা এবং নিজের শরীরের ক্ষতস্থানের জ্বালা এতটুকু বিচলিত করলো না বীর শহীদ পাঁড়ের হৃদয়।

মৃত্যুর জন্যে ধীরভাবে অপেক্ষা করতে লাগলেন। মৃত্যুকে তিনি ভয় করেন না বরং তাকে আলিঙ্গন করতে চান। তিনি হিন্দু। বিশ্বাস করেন পুনর্জন্ম। তাই ভাবলেন, এই জীবন তো হতাশ্বাস আর ব্যর্থতায় পূর্ণ। এ যদি চলে যায় তো মন্দ কি। আবার জন্ম গ্রহণ করবো ভারতবর্ষের এই পবিত্র ভূমিতে। সার্থক করবো আমার জীবনস্বপ্ন।

১৮৫৭ সালের ৮ই এপ্রিল। এই ঐতিহাসিক দিনে ব্যারাকপুরের সমস্ত সৈন্যের সামনে হাসতে হাসতে ফাঁসির রজ্জু নিজের গলায় ধারণ করলেন মঙ্গল পাঁড়ে।

সকলে তাঁর এই প্রকার বীরত্ব এবং হৃদয়ের স্বচ্ছভাব লক্ষ্য করে অবাক হলেন।

কেউ কেউ মঙ্গল পাঁড়ের চির বিদায়ের কথা চিন্তা করে অসহ্য বিরহ যাতনায় অধীর হয়ে পুনঃ পুনঃ অশ্রুজল বর্ষণ করতে লাগলেন।

বীর এবং মৃত্যুঞ্জয়ী মঙ্গল পাঁড়ে চলে গেলেন অমর লোকে।

বিখ্যাত ৮ই এপ্রিলের পর এলো ১০ই এপ্রিল। এই দিনটিও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন।

এই দিনে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বিতীয় বলি ঈশ্বরী পাঁড়ে নামক জনৈক জমাদারের বিচার আরম্ভ হয় এবং ১১ই এপ্রিল বিচার সমাপ্ত হয়।

বিচারপতিরা ঈশ্বরীকে জিজ্ঞেস করলেন, যখন মঙ্গল পাঁড়ে ইউরোপীয়ান অফিসারদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছিল তখন তুমি নির্বিকার ছিলে কেন? কেন তুমি মঙ্গল পাঁড়েকে সংযত করার জন্যে এগিয়ে আসোনি?

ঈশ্বরী দৃঢ় ভাবে বললেন, আমার ওপর নিষেধ ছিল।

কার নিষেধ ছিল? গর্জে উঠলেন বিচারপতিরা।

আজ্ঞে সিপাই মঙ্গল পাঁড়ের, উত্তর দিলেন ঈশ্বরী।

বিচারপতিগণ একবাক্যে বলে উঠলেন, সেকথা আমরা জানি। তাই তোমাকে আমরা রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধের জন্যে ফাঁসির দণ্ডাদেশ দিলাম।

দণ্ডাদেশের কথা শুনে কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না ঈশ্বরী। হাসি মুখে দণ্ডাদেশ মেনে নিয়ে আসন্ন মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ঈশ্বরী পাঁড়ের ফাঁসি হলো ২১শে এপ্রিল। মঙ্গল পাঁড়ের তুলনায় একটু বেশী সময়ের ব্যবধানে তাঁর ফাঁসি হলো। তার পেছনে অবশ্য কারণ ছিল। এই সময়ে প্রধান সেনাপতি সিমলায় গ্রীষ্মাবাসে অবস্থান করছিলেন। সেনাপতি হিয়ারসের ওপর জমাদারের প্রাণদণ্ডের ভার দেওয়া তাঁর কাজ ছিল। কিন্তু তিনি প্রথমে হিয়ারসেকে এই ভার দিতে রাজী হলেন না।

অবশেষে তাঁর মত পরিবর্তিত হলো। তিনি ২০শে এপ্রিল

হিয়ারসেকে দণ্ডাদেশ কাজে পরিণত করতে আদেশ দেন। ২১শে এপ্রিল প্রাতঃকালে সেই আদেশ কার্য্যকরী হলো।

সিপাই বিদ্রোহ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সংঘটিত হয়েছিল। এর সূচনা দেখা দেয় বাংলাদেশে এবং এর প্রথম বলি হচ্ছে শহীদ মঙ্গল পাঁড়ে আর শেষ বলি তাতিয়া তোপী। এই দু'জন বীর সৈনিক ছাড়া এই বিদ্রোহে অনেক ইউরোপীয় এবং ভারতীয় সিপাই প্রাণ বিসর্জন দেয়। তাঁদের কথাও একে একে লিখছি। তার আগে আমি এখানে সিপাই বিদ্রোহের পটভূমিকা প্রসঙ্গে দু'একটি কথা বলতে চাই যদিও আগে এই প্রসঙ্গে কিছু বলা হয়েছে।

ভারতবর্ষে সিপাইরা বহুদিন হতে নানা অশান্তির মাঝে কাল কাটাচ্ছিলেন। তাঁদের মন শোষক এবং অত্যাচারী বৃটিশ শাসকদের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছিল এবং তার প্রতিকারের অপেক্ষায় দিন গুণছিলেন। পরে এক সময় সেই ধূমায়িত অসন্তোষের অগ্নি সময় ও সুযোগ মত দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো এবং বৃটিশ শাসকদের কাছে ঐ বিদ্রোহ মহাভীতির কারণ হয়ে উঠেছিল। এই বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে শাসক সম্প্রদায়কে বেশ কিছুটা নাজেহাল হতে হয়েছিল।

সিপাই বিদ্রোহের একনিষ্ঠ গবেষক ও সুলেখক শ্রীপ্রবোধ সেনগুপ্ত লিখেছেন: '....১৮৫৭ সালের জাতীয় অভ্যুত্থান আকস্মিকও নয়, অথবা কেবলমাত্র সিপাহীদেরই একটি সামরিক বিদ্রোহও নয়। সিপাহীদের দ্বারা শুরু হলেও সকল শ্রেণীর লোকই এতে দেখা দিয়েছিল। এই বিদ্রোহ ঘটেছিল কতকগুলি সুদূরপ্রসারী জাতীয় কারণ বশতঃ। এই বিদ্রোহ অনেকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনারই পুঞ্জীভূত ফল। মিরাট ও দিল্লীতে বিদ্রোহের প্রথম বিস্ফোরণের মাত্র কয়েকদিন পরেই সমকালীন সত্যদর্শী সাংবাদিক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই বিদ্রোহের রূপ ও কারণ বিশ্লেষণে যে দ্ব্যর্থহীন মত ব্যক্ত করেছেন, তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও সকলের অনুধাবন যোগ্য:

"এই বিদ্রোহ এখন আর সিপাহীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এ এখন ব্যাপক বিদ্রোহ। সিপাহীরা তাদের জীবনের সর্ব স্বার্থ উৎসর্গ করেছে। এবং দেশবাসীরাও তাদের মহান জাতীয় আদর্শরূপ পবিত্র ব্রতে উৎসর্গীকৃত প্রাণ শহীদ রূপে গণ্য করেছে। বেসামরিক জনসাধারণ এই বিদ্রোহে সিপাহীদের সঙ্গে দেখা দিয়েছে এবং তাদের সাহায্য করেছে।···ভারতবাসীদের মধ্যে এমন কেউই নেই, পরাধীনতার ক্ষোভ ও তার পীড়ন যে সম্যক অনুভব না করে, সে ক্ষোভের একমাত্র কারণই হচ্ছে ভারতে বৃটিশ শাসনের অস্তিত্ব এবং সে ক্ষোভ বিদেশী শাসনের আধিপত্যের সঙ্গে একেবারে অবিচ্ছেদ্য। ভারতীয় শিক্ষিতদের মধ্যে এমন একজনও নেই যিনি চিন্তা করেন না যে তাঁর ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা ও তাঁর উচ্চাকাঙ্খা এই বিদেশীদের আধিপত্যের ফলে খর্ব হচ্ছে না।"—(হিন্দু পেট্রিয়ট-২১শে মে, ১৮৫৭)। ব্যারাকপুরে বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই হরিশচন্দ্র ঐ পত্রিকাতেই ৯ই এপ্রিল লিখেছিলেন যে, সাধারণ সংস্কারের দ্বারা সিপাহীদের মনকে আর এবার ঠাণ্ডা করা যাবে না, "সব টোটাগুলি যদি সিপাহীদের চোখের সামনে গুঁড়িয়েও ফেলে দেওয়া হয়, তা হলেও তাদের অসন্তুষ্টির কারণ সুদূর প্রসারী এবং তা এই সব উপায়ে দূর হবার নয়। এইরূপ মনোভাব তাদের একদিনে জন্মায়নি এবং একদিনে দূর হবারও নয়। সকলেই আজ স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন যে সিপাইদের মনে এক স্থায়ী পরিবর্তন ঘটেছে।"

'একশত বর্ষ ধরে ইংরেজের অবাধ লুণ্ঠন ও শোষণের প্রতিক্রিয়ার ফলেই এই মহাবিদ্রোহ ঘটে। রাজা, নবাব, জমিদার, ব্যবসায়ী, কৃষক, শিল্পজীবি, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকেই বৃটিশের সর্বগ্রাসী ক্ষুধানল নিবৃত্তির জন্যে উপকরণ যোগাতে হয়েছিল। এই ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনের অর্থ ও ঐশ্বর্যের দ্বারা ইংরেজ যেমন একাধারে তাদের দেশের নূতন-পুরাতন সকল শিল্পকে বড় করে গড়ে তুলতে

লাগল, তেমনি এই নূতন ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে ভারতের সমৃদ্ধিশালী শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি ধ্বংস করে ভারতের শিল্পজীবী, ব্যবসায়ী ও কৃষকদের সর্বশান্ত করে দিতে লাগল।'

বিখ্যাত দার্শনিক কার্ল মার্কস ১৮৫৭ সালের সিপাই বিদ্রোহকে ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সূচনা বলে অভিহিত করেছেন।

রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের প্রধান নেতা মহাত্মা লেনিনও ভারতের সিপাই বিদ্রোহকে অতি উচ্চে স্থান দিয়েছেন।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে লেনিন জার্মানী থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তার নাম ইসক্রা। ঐ পত্রিকায় লেনিন 'চীনা যুদ্ধ' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাতে ভারতের 'সিপাই বিদ্রোহ'কে বৃটেনের বিরুদ্ধে এবং বুভুক্ষার বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের বিদ্রোহ বলে বর্ণনা করেন।

যাই হোক, সেদিনকার সিপাই বিদ্রোহ ছিল ভারতের জাগ্রত চেতনার উজ্জ্বল এক জ্যোতিষ্ক বিশেষ। নিজের ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠ আস্থা, জাতীয়তাবোধ এবং বৃটিশ শাসকদের একচেটিয়া শোষণের বিরুদ্ধাচারণ—এই তিনটি প্রধান কারণ ভারতবর্ষের সিপাই বিদ্রোহের মূলে নিহিত ছিল বললে কিছুমাত্র অন্যায় বলা হবে না।

মঙ্গল পাঁড়ের ফাঁসির দু'মাস পরে চট্টগ্রামের ৩০০ জন সিপাই বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাঁরা ইংরেজদের ধনাগার লুণ্ঠন করে এবং জেল ভেঙ্গে কয়েদীদের খালাস করেন। এরপর তাঁরা শহরের কোন ক্ষতি না করে ত্রিপুরা পাহাড়ের ধার দিয়ে সিলেট হয়ে কাছাড়ের দিকে চলে যায়। সেখানে কয়েকজন ধরা পড়লেন। আর বাদবাকী সকলেই গুর্খা বাহিনী ও কুকী স্কাউটের সঙ্গে লড়াই করে মারা যায়।

এরপর সিলেটের লাচু নামে এক জায়গায় ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে বিদ্রোহীদের সংঘর্ষ হয়। লাচুর যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের অনেক সৈন্য প্রাণ দেয়। তাদের মধ্যে অধিনায়ক মেজর বিং অন্যতম।

এরপর কাছাড় অঞ্চলের ১২ই, ২২শে ও ২৬শে জানুয়ারি তারিখের খণ্ড খণ্ড যুদ্ধে বহু সিপাই প্রাণ দেয়।

মণিপুর রাজ্যের লক্ষ্মীপুর নামে এক জায়গায় সিপাইদের সঙ্গে বৃটিশ সৈন্যের সংঘর্ষ বাঁধে। এই যুদ্ধে বহু সিপাই প্রাণ দেয়।

২২শে নভেম্বর তারিখে ঢাকা দুর্গেও বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়। এই যুদ্ধে ৪১ জন সিপাইয়ের মৃত্যু হয় এবং ২০ জন সিপাই ইংরেজের হাতে বন্দী হন। কয়েকদিন পর তাঁদের ফাঁসি হয়। অবশিষ্ট বিদ্রোহীরা দুর্গ ত্যাগ করে সাঁতার কেটে নদী পেরিয়ে যায়। পার হবার সময় কয়েকজন সিপাই মারা যান।

দিল্লীর বিদ্রোহে কমিশনার ফ্রেজারের গুলিতে একজন সিপাই প্রাণ হারায়। বিদ্রোহীরা ফ্রেজারকে লালকেল্লার প্রাসাদের সিঁড়িতে পায়ে দলে মেরে ফেলেন। এ ছাড়া যে কয়েকজন ইংরেজ সেখানে উপস্থিত ছিল পাদ্রী জেনিংস ও তাঁর কন্যা সমেত সকলেই অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে প্রাণ হারায়।

দিল্লীর সেলিমগড়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সংঘর্ষে কর্ণেল রিপন ও অন্যান্য ইংরেজ অফিসাররা প্রাণ হারায়।

দিল্লীর ইংরেজ ব্যাঙ্ক লুঠ হলো। ম্যানেজার ব্রেসফোর্ড ও তাঁর পরিবারবর্গ বিদ্রোহীদের হাতে খুন হয়। এ ছাড়া বিদ্রোহীরা ব্যাঙ্কে আগুন দেবার ফলে দু'জন ইউরোপীয়ান পুরুষ, তিনজন ইউরোপীয়ান স্ত্রীলোক ও ও দু'জন শিশু প্রাণ হারায়।

৩৮শ বাহিনীর সিপাইরা দিল্লীর দরওয়াজা পাহারা দিচ্ছিলেন। তার অনতিদূরে একটি অস্ত্রাগার ছিল। এই অস্ত্রাগারটি এত বড় ছিল যে তখনকার বৃটিশ ভারতে এত বড় অস্ত্রাগার অন্যত্র বিরল ছিল। এই অস্ত্রাগারে ছিল ১০ হাজার রাইফেল ও ৯ লক্ষ গুলি। ১০ হাজার ব্যারেল বারুদ আর প্রচুর কামান ও গোলা ছিল। লেফ্‌টেনাণ্ট উইলোবি ৮ জন ইংরেজ ও একদল সিপাই নিয়ে পাহারা দিচ্ছিল। বিদ্রোহীরা আক্রমণ করতে এলে উইলোবি

অস্ত্রাগার রক্ষা করার উপায় না দেখতে পেয়ে নিজেই আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে সে সসৈন্যে নিহত হয় এবং দিল্লীর অনেক নিরীহ অধিবাসীও প্রাণ হারায়।

এই দুঃসংবাদ পাওয়া মাত্র সিপাইরা ইংরেজের ওপর ক্ষেপে যায়। ফলে যে সকল ইংরেজ অফিসার দিল্লীতে ছিল এবং কাশ্মীর দরওয়াজায় স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল বিদ্রোহী সিপাইদের হাতে তারা নিহত হয়।

এবার হিন্দু রাও-এর বাড়ী দখল করলো বৃটিশ সৈন্য। দিল্লীর টিলার দক্ষিণে ও মোরী বুরুজ থেকে ১২০০ গজ পশ্চিমে অবস্থিত এই বাড়ী।

অল্প সংখ্যক গোর্খা সৈন্য নিয়ে ইংরেজরা বিদ্রোহী সিপাইদের সঙ্গে যুদ্ধ করলো। একটানা ১৬ ঘণ্টা যুদ্ধের পর ইরেজ সৈন্য হিন্দু রাও-এর বাড়ী দখল করে নেয়।

এই যুদ্ধে অনেক বৃটিশ সৈন্য নিহত হয়। অনেক ভারতীয় সৈন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। প্রমোদ সেনগুপ্ত লিখেছেন: 'তারা তিন মাসের মধ্যে ২৬ বার ঐ বাড়ী আক্রমণ করেছিল এবং তার মধ্যে একবারের আক্রমণ চলেছিল একটা সম্পূর্ণ দিন ও রাত্রি ধরে। তাছাড়া মোরী বুরুজ থেকেও সর্বদাই এই বাড়ীর ওপর কামানের গোলা ছোঁড়া হত। এটা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, দিল্লী যুদ্ধের শেষে ১০০০ গুর্খা সিপাহীর মধ্যে ৫০ জনও প্রাণ নিয়ে তাদের দেশে ফিরে যেতে পারেনি। ১৪ই সেপ্টেম্বর যেদিন ইংরেজ বাহিনী বিদ্রোহী দিল্লীকে শেষ আঘাত হানবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল, সেই ভয়ঙ্কর পরীক্ষার দিন ১০০ জন গুর্খাকেও সক্ষম অবস্থায় এই কাজের জন্য পাওয়া যায়নি।

এর আগে অর্থাৎ আগষ্ট মাসে নজফগড়ের যুদ্ধে প্রায় ১৫০০ বিদ্রোহী সিপাই প্রাণ বিসর্জন দেন।

১৪ই সেপ্টেম্বরের যুদ্ধে ইংরেজ-পক্ষের হতাহতের সংখ্যা ছিল ৬৬

জন অফিসার ও ১১৭৮ জন সৈন্য। অর্থাৎ যারা সেদিন যুদ্ধে নেমেছিল তার এক-তৃতীয়াংশ। ঐতিহাসিক ফরেস্টের মতে ৭ই থেকে ২০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দিল্লীতে বিদ্রোহীদের ১৫০০ জনের মৃত্যু হয়েছিল এবং যাদের তাঁরা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল তাঁদের মধ্যে প্রচুর লোক আহত হয়েছিল।

এরপর ইংরেজের হাতে শেষ মোগল বাদশাহ বাহাদুর শাহ, তাঁর কনিষ্ঠ বেগম জিন্নৎ মহল এবং জওয়ান বখত বন্দী হন। এ হলো ২১শে সেপ্টেম্বরের ঘটনা।

২২শে সেপ্টেম্বর হড্‌সন আবার হুমায়ুনের কবরে গেলেন এবং মির্জা মোগল, খিজির সুলতান ও আবু বকরকে আত্মসমর্পণ করবার হুকুম দিলেন। কিছুক্ষণ ধরে বাদ-বিতণ্ডা করার পর শেষকালে তাঁরা আত্মসমর্পণ করলেন। ঐ সময় সশস্ত্র বিদ্রোহী সিপাই তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। অথচ তাঁরা এই ব্যাপারে কোনরকম প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিলেন না। লাহোর গেট পর্যন্ত সিপাইরা বন্দীদের সঙ্গে এলেন। গেট পেরিয়ে গেলে আর এগোলেন না।

তখন হড্‌সন বন্দীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা গরুর গাড়ী থেকে নামো।

ইংরেজ অধিনায়কের আদেশ মত বন্দীরা গরুর গাড়ী থেকে নেমে পড়লেন।

এবার দ্বিতীয় আদেশ হলো, তোমরা নিজেদের পোষাক-পরিচ্ছদ খুলে ফেল।

অতঃপর তাঁরা কাঁপতে কাঁপতে তাই পালন করলেন। কিন্তু তাতেও শান্ত হলেন না হড্‌সন। তিনি গুলিভরা বন্দুক নিয়ে বন্দীদের সামনে এগিয়ে গেলেন। তাঁদের একে একে হত্যা করলেন গুলি করে।

এরপর হড্‌সন দিল্লীতে প্রবেশ করে তিনজন বন্দীর মৃতদেহ কোতোয়ালির সামনে প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখলেন।

সেদিন আহত মন দিল্লীবাসীগণ বিষণ্ণ নয়নে দেখলো বর্বর ইংরেজ শাসকের চরম নৃশংসতার দৃশ্য।

পাঞ্জাবেও সিপাই বিদ্রোহ দেখা দেয় '৮৫৭ সালের জুন মাসে। ৭ই জুন জলন্ধরের সিপাইরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। তাঁরা অনায়াসে জলন্ধর শহর দখল করে স্থানীয় ইংরেজ অধিবাসীদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা সে সুযোগ পায়নি। চতুর ইংরেজ আগে থাকতে বুঝতে পেরেছিল সিপাইদের মনোভাব। তাই তারা নিরাপদ জায়গায় চলে গিয়েছিল।

জলন্ধরে সিপাইরা কেবল বিদ্রোহ করেছিলেন। তাঁদের হাতে তখনও কোন ইংরেজ সৈন্য বা অফিসার নিহত হয়নি।

অতঃপর বিদ্রোহী সিপাইরা চলে এলেন ফিলুরে। এখানে ৩য় বাহিনী এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেয়। তাঁরা স্থির করলেন, শতদ্রু নদী পার হয়ে লুধিয়ানা হয়ে দিল্লী পৌঁছবেন। ফিলুরের অন্য দিকে আর একটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান হচ্ছে লুধিয়ানা।

জলন্ধরের বিদ্রোহের খবর পেয়েই লুধিয়ানার ইংরেজ গোলন্দাজ-গণ ও একদল নাভা সৈন্য বিদ্রোহীদের বাধা দেবার জন্যে প্রস্তুত হলো।

নদীর ওপর ছিল নৌকোর সেতু। সেতু ভেসে যাবার ফলে বিদ্রোহীরা ৪ মাইল উত্তরে নৌকোয় করে সেতু পার হবার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু ইংরেজ সৈন্য এসে তাঁদের বিরুদ্ধে কামানের গোলা নিক্ষেপ করতে লাগলো। এতে করে তাঁরা মাঝ নদীতে বেশ বিপদের সম্মুখীন হলেন। তখন বিদ্রোহীদের হাতে একটি কামানও ছিল না।

তা সত্ত্বেও দেশহিতৈষী ও স্বধর্মানুরক্ত বীর সিপাইরা অমন সাহসের সঙ্গে নদী পার হলেন। তারপর নৌকো হতে নেমে বন্দুক ও তরোয়াল নিয়ে ইংরেজদের আক্রমণ করলেন।

নাভার রাজার শিখ সৈন্য ইংরেজদের সঙ্গে বিদ্রোহী সিপাইদের

বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে প্রস্তুত ছিল। তারা বিদ্রোহীদের রণহুঙ্কার শুনে তাড়াতাড়ি ভয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল।

এরপর বিদ্রোহী সিপাইরা ইংরেজ বাহিনীর ওপর বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বাহিনীর অধিনায়ক উইলিয়াম ও আরও কিছু ইংরেজ মারা যায় বিদ্রোহীদের হাতে। তাই দেখে ইংরেজ গোলন্দাজ বাহিনী রণে ভঙ্গ দিল।

৮ই জুন মধ্যাহ্ন। বিজয়ী বীর সিপাইরা লুধিয়ানা শহরে প্রবেশ করে এক আনন্দোৎসবে মেতে উঠলেন।

লুধিয়ানায় বিদ্রোহী সিপাইদের মধ্যে কেউ হতাহত হননি। তবে ফিলুরে যে ৩য় সিপাইবাহিনী বিদ্রোহ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে দু'জন বিদ্রোহী ইংরেজ সৈন্যের হাতে ধরা পড়েন। তাঁদের একজন ঝেলামের মুসলমান আর একজন মাঞ্ঝা শিখ। তাঁরা লেফটেনান্ট ইয়ার্ককে গুলি করে মারার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তা তারা পারেন নি। উল্টে ইংরেজ সৈন্যের গুলিতে তাঁদের প্রাণ দিতে হলো।

ইচ্ছে করলে বিদ্রোহী সিপাইরা লুধিয়ানা শহর নিজেদের হাতে রাখতে পারতেন। কিন্তু নিজেদের বোকামির জন্যে তা আর সম্ভব হলো না। পরের দিন অর্থাৎ ৯ই জুন তাঁরা লুধিয়ানা ত্যাগ করে দিল্লী অভিমুখে রওনা হলেন।

লুধিয়ানাকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহী সিপাইরা যদি জলন্ধর-দোয়াব দখল করে বসতেন এবং শিখ ও পাঞ্জাবীদের স্বাধীনতার সংগ্রামে আহ্বান জানাতেন তাহলে বিদ্রোহীদের নৈতিক ও সামরিক শক্তি অনেক বেড়ে যেত। তাই লক্ষ্য করে বৃটিশরাও আর বেশীদিন পাঞ্জাবে থাকতে সাহস পেতনা। তখনকার দিনে এই প্রকার বিপজ্জনক অবস্থার কথা ইংরেজরা খুব ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিল। বৃটিশ ঐতিহাসিক স্যার জন উইলিয়ামকে লিখেছেন ঃ'দুর্গ দখল করে, কামান-গুলিতে গোলন্দাজ বসিয়ে ধনাগার হস্তগত করে এবং জনসাধারণের অধিকাংশের সাহায্য পেয়ে বিদ্রোহীরা অনায়াসে অন্ততঃ কিছু দিনের

জন্যে আমাদের উপেক্ষা করতে পারতো। ইংরেজদের পক্ষে পাঞ্জাব থেকে দিল্লী যাবার প্রধান রাস্তার ওপর এই শহর হারানো বাস্তবিকই অত্যন্ত ক্ষতিকর হতো। দিল্লী অধিকারের প্রচেষ্টা অনির্দিষ্ট কালের জন্যে পিছিয়ে যেত ও তার ফলে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সমগ্র অভিযানেরও সর্বনাশ হয়ে যেত।'

বিদ্রোহীরা লুধিয়ানা শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যরা বীরবিক্রমে ঐ শহরে প্রবেশ করে ব্যাপকভাবে গণহত্যা ও লুঠতরাজ আরম্ভ করে দিল। কত লোককে যে গুলি করে মারলো এবং ফাঁসিকাঠে ঝোলালো তার ইয়ত্তা নেই। শুধু তাই নয় শহর-বাসীদের ওপর পাইকারীহারে জরিমানা ধার্য হলো।

ইংরেজ অফিসার এবং সৈনিকদের বেশী রাগ ছিল থানেশ্বর জেলার গুজার গ্রামের ওপর। ঐ গ্রামটিকে ইংরেজরা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয় এবং পাইকারীভাবে গ্রামবাসীদের হত্যা করে।

এছাড়া থানেশ্বর শহরের ২২জন লোককে ফাঁসি দেওয়া হলো। তাদের অপরাধ, তারা বিদ্রোহী সিপাইদের সাহায্য করেছিল।

লুধিয়ানা ত্যাগ করার সময় বিদ্রোহী সিপাইদের একটি অংশ হোসিয়ারপুর জেলায় শতদ্রু পার হয়ে তারপর সমস্ত আম্বালা জেলা অতিক্রম করে যমুনা নদীর অন্যদিকে পৌঁছে গেলেন। সর্বত্রই জনসাধারণের কাছ থেকে তাঁরা প্রচুর সাহায্য পেলেন।

ঠিক এই সময়ে নাভা রাজ্যে জেইটো নামে এক জায়গায় জনসাধারণ গুরু শ্যামদাসের নেতৃত্বে ইংরেজ সৈন্যদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো।

সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিদ্রোহের বহ্নি ফরিদকোটে ছড়িয়ে পড়লো।

এইসব খবর শুনে ইংরেজ অফিসারগণ স্থিরভাবে বসতে পারলেন না। ফিরোজপুরের ডেপুটি কমিশনার মেজর মার্সডেন ছুটে এলেন দু'টি কামান সহ ১০ম ইংরেজ অশ্বারোহী এবং পাতিয়ালার কিছু সৈন্য নিয়ে। তার সঙ্গে জেইটোতে দেখা হলো শ্যামদাসের। শ্যামদাসের

অধীনে তিন হাজার গ্রামবাসী এলো। তারা বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লো অত্যাচারী শাসক ইংরেজদের ওপর।

ঐ যুদ্ধে গুরু শ্যামদাস এবং অন্যান্য অনেক গ্রামবাসী মৃত্যুবরণ করেন।

জেইটো যুদ্ধের কয়েকদিন পর বিদ্রোহীরা এলেন থানেশ্বরের জেল-খানায়। এখানে কয়েকজন বিদ্রোহীকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল।

ইংরেজরা বিদ্রোহী সিপাইদের আগমনের সংবাদ পেয়ে আতঙ্কিত হলো এবং ভাবলো থানেশ্বরের জেলে যেসব বিদ্রোহী আছে তাদের আম্বালা জেলে স্থানান্তরিত করা দরকার। নচেৎ সমূহ বিপদ দেখা দিতে পারে।

এইরূপ চিন্তা করে ইংরেজ অফিসাররা বন্দীদের অন্যত্র নিয়ে যাবার জন্য উদ্যোগ আয়োজন করতে লাগলেন।

বন্দীরা যথাসময়ে আম্বালা জেলখানার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তাই লক্ষ্য করে বিদ্রোহী সিপাইরা স্থানীয় গ্রামবাসীদের সাহায্য নিয়ে অত্যাচারী শাসক ইংরেজ অফিসার ও সৈন্যদের ওপর ব্যাপকভাবে আক্রমণ করলেন।

তাঁদের সংখ্যা দেখে অবাক হলেন ইংরেজ নায়ক। তখন বিদ্রোহীদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে অন্য একটি ইংরেজ বাহিনীকে কামানসহ তলব করা হলো।

তারা এলো এবং স্থানীয় ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বীর বিক্রমে থানেশ্বরের অধিবাসী এবং বিদ্রোহী সিপাইদের সঙ্গে সংগ্রাম করলো। ঐ সংগ্রামে উভয় পক্ষের বহু বিদ্রোহী সৈন্য এবং অসামরিক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন।

এইসব ঘটনা থেকে এটা মনে করা যেতে পারে যে তখনকার ঐ বিদ্রোহ কেবলমাত্র সিপাইদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তা গণবিদ্রোহের আকার নিয়েছিল। ইংরেজদের সঙ্গে কেউ সহযোগীতার মনোভাব দেখায়নি। ঐতিহাসিকও লিখেছেন, 'সর্ব শ্রেণীর নেটিভরা

দূরে সরে ছিল। তারা ঘটনাগুলি লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। আমাদের ক্ষমতা কিছুদিনের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে ভেবে, ধনী থেকে কুলী পর্যন্ত কেউই আমাদের কোনরকম সাহায্য করছিল না।'

কিছুদিন আগে মীয়ান মীরে সিপাইদের নিরস্ত্রীকরণ করেছিলেন বৃটিশ কর্তারা। তাঁরা তখনকার মত এই অপমানের বোঝা সহ্য করে গেলেও পরে কিন্তু সইলেন না।

বহুদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বিক্ষোভের রূপ নিলো। ২৬শ বাহিনীর ৭৫০ জন সিপাই একদিন বৃটিশ অফিসার ও সিপাইদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। তাঁদের হাতে কিন্তু কোন অস্ত্র ছিল না। তাঁরা সমবেতভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করে 'ইংরেজ রাজ নিপাত যাও' বলে ধ্বনি দিতে লাগলেন।

তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল এইভাবে ধ্বনি দিতে দিতে অন্যত্র চলে যাওয়া।

তাঁদের ঐ মিলিত কণ্ঠস্বর শোনার পর ইংরেজ অফিসারগণ আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনার কুপার ১৫০ জনের একটা মিলিটারী পুলিশের দল নিয়ে তখুনি সিপাইদের পেছন পেছন দৌড়লেন, ভূতপূর্ব খালসা বাহিনীর একজন পুরোনো জেনারেল হরসুখ রায় আর ইংরেজদের একজন প্রাচীন বন্ধু সিন্ধনওলার পরিবারের সর্দার পরতাব সিং কিছু অনুচর নিয়ে কুপারের সঙ্গে যোগ দিলেন।

সিপাইরা দৌড়তে দৌড়তে আজনালা গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। এই গ্রামটি অমৃতসর থেকে ২২ মাইল দূরে অবস্থিত। সিপাইরা এই গ্রামের ধারে বয়ে যাওয়া নদীতে এসে দুটি নৌকো হস্তগত করতে যাবেন এমন সময় স্থানীয় পুলিশ অফিসার দেওয়ান প্রেমনাথ পুলিশ ও গ্রামবাসীদের নিয়ে নদীর ধারে এলেন এবং বিদ্রোহীদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালালেন। তাঁদেরকে মারতে মারতে নদীতে ফেলে দিলেন। এভাবে ১৫০ থেকে ২০০ জন সিপাই পুলিশের গুলিতে নয়ত জলে ডুবে প্রাণ হারালেন।

বাকি সিপাইরা সাঁতার দিয়ে নদীর মাঝখানে একটা ছোট দ্বীপে এসে আশ্রয় নিলেন। তাঁদের কাছে খাবার ছিল না। এর ওপর তাঁদের শরীরের ওপর দিয়ে অনেক পরিশ্রম চলে গেছে। এই সব কারণে তাঁরা ক্লান্ত হয়ে দ্বীপের ওপর মরার মত পড়ে রইলেন।

ধূর্ত ইংরেজ অফিসার কুপার তাঁদের দুর্বলতার কথা জানতে পেরে দলবল নিয়ে চলে এলেন দ্বীপের ওপর এবং সেখানে ১৬০ জন বিদ্রোহীকে বন্দী করে আজনালায় নিয়ে এলেন।

এর মধ্যে পরতাব সিং চারদিকের গ্রাম থেকে ৬৬ জনকে গ্রেপ্তার করে আনলেন। অন্যান্য ইংরেজ সিপাই আরও কিছু বিদ্রোহী সিপাই এবং অশান্ত গ্রামবাসীদের বন্দী করে আনলে।

এভাবে ২৮২ জন বন্দীকে ৩১শে জুলাইয়ের রাতে একটি ছোট ঘরে বন্দী করে রাখা হলো। তারপর কুপার তাঁদের ফাঁসি দেওয়ার জন্যে ব্যাপকভাবে দড়ি সংগ্রহ করতে আদেশ দিলেন অনুচরদের।

তারা কিছু দড়ি আনলো। তাই দিয়ে অল্প কয়েকজন বিদ্রোহীকে ফাঁসি দেওয়া হলো। বাকি বিদ্রোহীদের মধ্যে অধিকাংশকে গুলি করে হত্যা করা হলো। আর কিছু বন্দী অন্ধকার ঘরে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যান।

এভাবে ২৬শ বাহিনীর অধিকাংশ সিপাই মারা গেলেন ইংরেজদের হাতে। যাঁরা বেঁচে ছিলেন তাঁদের ভাগ্যও সুপ্রসন্ন হলো না। তাঁদের মধ্যে ৪১ জন বিদ্রোহীকে ধরে মীয়ান মীরে নিয়ে যাওয়া হলো এবং সেখানে কামানের মুখে তাঁদের উড়িয়ে দেওয়া হলো।

এর কিছুদিন পর ৮০ জন বিদ্রোহী সিপাইকে গুরুদাসপুরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ২৬শ বাহিনীর অতি অল্প সিপাই প্রাণ বাঁচিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদেরকে এভাবে শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হতো না যদি তাঁদের হাতে উপযুক্ত পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র থাকতো।

এরপর স্মরণ করা যেতে পারে মুরী ও গোগারীয়ার দুটি বিদ্রোহের কথা। পাঞ্জাবের মধ্যে এই দুটি বিদ্রোহ খুবই উল্লেখযোগ্য।

আগষ্ট মাসের শেষাশেষি হাজারা জেলার কাড়াল জাতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ১লা সেপ্টেম্বর মধ্য রাতে তাঁরা মুরীর পার্বত্য গ্রীষ্মাবাস আক্রমণের জন্যে অগ্রসর হয়।

মুরীর কর্তৃপক্ষ তৈরী ছিলেন। কাড়ালদের সঙ্গে কিছুক্ষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে কাড়ালরা হটে যায় এবং মুরী পরিত্যাগ করে তার কাছাকাছি কয়েকটি পাহাড় দখল করে।

ওদিকে ইংরেজ সিপাইরা এসে তাদের বাধা দিতে আরম্ভ করে।

তারা কাড়ালদের সমস্ত গ্রামে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং তাদের গরু-বাছুর সব কেড়ে নেয়।

পরে অনেক কাড়ালকে বন্দী করে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়।

মুরীর দু'জন হিন্দুস্থানী সরকারী ডাক্তার ও আরও ৫০ জন লোকের ফাঁসি হয়।

গোগারীয়ার বিদ্রোহ অনেক কাল স্থায়ী ছিল। কারণ এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তি। লাহোর হতে ৭৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মুলতান বিভাগে অবস্থিত এই গোগারীয়া অঞ্চল। এখানে মুসলমান খুরুল জাতির বাস। বারী দোয়াবের ঘুতিয়াল জাতি এবং ভুচে জাতিও এই বিদ্রোহে অংশ নেয়। বুচোকী থানা ছিল শিখদের একটি বড় ঘাঁটি। তারা ছিল অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ এবং জাতীয়তাবাদী। তাঁরাও এই বিদ্রোহে যোগ দেয়।

এই বিদ্রোহ এমনি ভয়াবহ আকার নিয়েছিল যে একে দমন করতে ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে বেশ কিছুটা বেগ পেতে হয়েছিল। লাহোর ও মুলতান হতে সৈন্য আনা হলো এই বিদ্রোহ দমন করার জন্যে।

অনেক দিন ধরে যুদ্ধ করার পর বিদ্রোহের নেতা আহম্মদ খান যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যান। কিন্তু এর ফলে বিদ্রোহীরা ক্ষান্ত হলো না। তারা নতুন নেতা মীর বাহাওয়াল ফতোয়ানার নেতৃত্বে অনেক দিন ধরে

বনে-জঙ্গলে যুদ্ধ চালিয়ে গেলো। শেষকালে বাওহালপুরের নবাবের সহায়তায় ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহীদের দমন করতে সক্ষম হয়।

এরপর এলো ১৮৫৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী। এই তারিখটি ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এই দিনে ২১ জন শিখকে লুধিয়ানায় ফাঁসি দেওয়া হয়। এই শিখেরা ঝান্সীর বেঙ্গল আর্মির ১২শ রেজিমেন্টের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁরা বেঙ্গল আর্মির সঙ্গে ঝান্সীতে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন।

পাতিয়ালা, নাভা, বিন্দি আর কাপুরতলা—এগুলি শিখ রাজ্য। এগুলি পাঞ্জাব প্রদেশের অধীন। যমুনা ও শতদ্রু নদীর মাঝামাঝি ১৫,০০০ বর্গ মাইল জুড়ে এই রাজ্যগুলি অবস্থিত। এই অঞ্চলগুলির অধিকাংশ মানুষ বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিলেন। ইংরেজরা অনেক বেসামরিক ব্যক্তিকে হত্যা করে এবং তাদের মূল্যবান দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করে।

এরপর রূপুরে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ রূপুরের বিদ্রোহ দমন করবার জন্যে দু'টি শিখ পুলিশ কোম্পানীকে সেখানে পাঠায়। তারা সেখানে গিয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাদের উত্তেজিত করে তুললো।

ঐ বিদ্রোহে ছ'জনকে গ্রেপ্তার করা হলো এবং বিচারে তাদের ফাঁসি হয়।

একই সময়ে ফিরোজপুর জেলায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। স্থানীয় সিপাই এবং জনসাধারণ দিল্লীর বাদশাহের সমর্থনে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এর ফলে রানিয়ার নবাব ও আরও ১৭জন বিদ্রোহীকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

মিরাট ও দিল্লীর বিদ্রোহের খবর এসে পৌছল লখনৌতে। 'গরুর চর্বি মাখানো টোটা ব্যবহার করতে দেওয়া হয় সিপাইদের'—এই

খবর শোনামাত্র লখনৌর সিপাইদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা দেখা দেয়। তাঁরা ঐ টোটা ব্যবহার করতে অস্বীকার করলেন। এর ফলে কিছু সংখ্যক সিপাইকে চাকরী হতে বরখাস্ত করা হয়।

এই বরখাস্তই কাল হয়ে দাঁড়াল। সিপাইদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়লো।

ইংরেজ সামরিক অফিসারগণ সিপাইদের মতিগতি বিলক্ষণ জানতে পারলেন। তাঁরা সিপাইদের বিপ্লব প্রতিরোধ করার জন্যে রেসিডেন্সী ভবনে প্রচুর সৈন্য ও গোলাবারুদ মজুত করতে লাগলেন।

ওদিকে বিদ্রোহী সিপাইরা ইংরেজ বাহিনীকে পর্যুদস্ত করার আশা নিয়ে রেসিডেন্সী ভবন আক্রমণ করলেন।

১লা জুলাই রেসিডেন্সী অবরোধ শুরু হলো। রেসিডেন্সীতে ১,৭২০ জন সৈন্যের মধ্যে ১,০০৮ জন ছিল ইংরেজ আর ৭১২ জন ভারতীয়। এ ছাড়া অনেক বেসামরিক মানুষও ছিলেন।

মোট ৮৭ দিন ধরে যুদ্ধ চলে। অবশেষে ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে রেসিডেন্সীর অবরুদ্ধদের ইংরেজ কর্তৃপক্ষ উদ্ধার করতে সক্ষম হন।

ইংরেজ সৈন্য ছিল ১,০০৮ জন। ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে মাত্র ৫৭৭ জনকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

৯জন ইংরেজ গোলন্দাজ অফিসারের মধ্যে মাত্র ৪ জন বেঁচে ছিলেন। ৯জন স্ত্রীলোক ও ৫৩ জন শিশু মারা যায়।

ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে নিহত হয়েছিলেন ১৩০ জন আর পালিয়ে-ছিলেন ২৩০ জন।

ইংরেজ সৈন্যবাহিনী যখন হ্যাভলকের নেতৃত্বে কানপুর থেকে লখনৌ রেসিডেন্সী অভিমুখে আসছিল তখন পথে বিদ্রোহী ভারতীয় সিপাইদের সঙ্গে ছ'দিন ধরে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে ৭১১ জন সৈন্য ও ৩১ জন অফিসার মারা যায়।

কানপুর থেকে ৮০ মাইল দূরে গঙ্গার ধারে ফতেগড় শহর। এটি ইংরেজদের একটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। সিপাইরা ফরাক্কাবাদের

নবাবের অধীনে এখানে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং স্বাধীন রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন। তাঁদের ঐ প্রকার কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করে কর্ণেল স্মিথ ও অন্যান্য ইংরেজগণ পালিয়ে গেলেন।

১৮৫৮ সালের জানুয়ারি মাস। এই সময় ফতেগড়ে আরম্ভ হয় প্রবলতম সংগ্রাম। ফতেগড়ের দু' দিক থেকে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ আক্রমণ চালালেন এবং বিদ্রোহী সিপাইদের দ্বারা অধিকৃত শহর মুক্ত করার জন্যে প্রাণ পণ চেষ্টা করলেন। ঐ ইংরেজ সৈন্যদের মধ্যে একদল এলো দিল্লী থেকে অন্য দল কানপুর থেকে।

ভারতীয় সিপাইরা বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেও চতুর দুর্ধর্ষ এবং একতাবদ্ধ ইংরেজ গোলন্দাজ বাহিনীর সঙ্গে সংগ্রামে জয়লাভ করতে সমর্থ হলেন না।

১৮৫৮ সালের ৩রা জানুয়ারী তারিখে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ পুনরায় ফতেগড় অধিকার করলেন। ঐ দিনই ফরাক্কাবাদের নবাবকে ফাঁসি দেওয়া হলো।

কমিশনার পাওয়ার হুকুম দিলেন, নবাবকে ফাঁসির মঞ্চে ওঠাবার আগে ওর সারা অঙ্গে আচ্ছা করে শুয়োরের চর্বি মাখিয়ে দেওয়া হোক।

যেমন আদেশ তেমনি কাজও হলো। যে নবাব একসময় ভারতীয় সিপাইদের শুয়োরের চর্বি মাখানো ইংরেজ কর্তৃপক্ষের দেওয়া টোটা ব্যবহার করতে নিষেধ করে বিদ্রোহের পথে চালিত করেছিলেন আজ ইংরেজগণ নবাবের ওপর সেই আচরণের চরম প্রতিশোধ নিতে লাগলেন।

ইংরেজ সিপাইরা বালতি বালতি শুয়োরের চর্বি এনে নবাবের গায়ে মাখিয়ে দিলো।

নবাব ইংরেজদের ঐপ্রকার পাশবিক আচরণ নীরবে সহ্য করতে লাগলেন। প্রতিবাদ করবার উপায় ছিল না। কারণ তিনি তখন নিরস্ত্র এবং শত্রুহস্তে বন্দী।

চর্বি মাখানো হয়ে গেলে ইংরেজ সিপাইরা নবাবকে ধরে নিয়ে এলো ফাঁসির মঞ্চে। তারপর জহ্লাদ এসে নবাবের গলায় দড়ি পড়িয়ে দিল।

এভাবে সেদিন ফাঁসির মঞ্চে বিদ্রোহী এবং স্বাধীনতাকামী নবাব জীবনের জয়গান গেয়ে গেলেন। তাঁর সেদিনকাব সংগ্রাম ব্যর্থ হযনি। তাঁর স্বপ্ন ও সংগ্রাম সার্থক করেছিলেন তাঁর উত্তরসূরীগণ।

নবাবকে ফাঁসি দেওয়ার পর কমিশনার পাওয়ার সমগ্র ফতেগড জেলা ঘুরে বেডালেন এবং যেখানে যত জোয়ান মানুষ দেখতে পেলেন তাদেব ধরে ফাঁসি কাঠে ঝুলিযে দিলেন। একমাত্র মাও নামে একটা ছোট গ্রামে তিন দিনের মধ্যে একটা বড পিপ্পল গাছের শাখায় ১০০ লোককে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছেন।

সেদিন ইংরেজ অফিসার পাওযাবের আদেশে ফতেগড়ে যে নৃশংস ঘটনা ঘটে তার এক সুন্দর এবং রোমহর্ষক বিবরণ দিয়েছেন জনৈক ইংরেজ: 'কমিশনার পুলিশ ষ্টেশনে তাঁব আদালত বসালেন। আমি জানি না বন্দীদের কিভাবে বিচার করা হয়েছিল অথবা কি বকম সাক্ষী প্রমাণ তাদের বিরুদ্ধে লেখা হযেছিল। আমি এটুকু মাত্র জানি যে বন্দীদের দলে দলে মার্চ কবিযে নিয়ে যাওযা হয়েছিল এবং তার পরেই পুলিশ ষ্টেশনের সামনেই যে একটি মস্ত বড বটগাছ ছিল সেখানে আবার মার্চ কবিয়ে নিযে গিয়ে তাদের ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল। এই কাজ শুরু হয় বেলা ৩টার সময় এবং অনবরত চলতে থাকে পরের দিন সকালবেলা পর্যন্ত। তখন দেখা গেল যে, গাছে আর একটুও জায়গা খালি নেই আর ঐ সময়ের মধ্যে ১৩০ জনকে ঝোলানো হয়ে গেছে।'

৮ই জুন তারিখে কানপুরের সিপাইরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। সুবেদার টীকা সিং এই বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক ছিলেন। এছাড়া পেশোয়া নানা সাহেবও অন্তরালে থেকে এই বিদ্রোহ সমর্থন করেছিলেন।

প্রথম দিকে নানা সাহেবের সঙ্গে ইংরেজের হৃদ্যতা ছিল। তিনি ইংরেজদের অনেক সৈন্য ও কামান দিয়ে সাহায্যও করেছিলেন। পরে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ যখন তার সঙ্গে নানা রকম দুর্ব্যবহার দেখাতে লাগলো তখন নানা সাহেব বেঁকে বসলেন। এই সময় একদল বিদ্রোহী সিপাই নানা সাহেবের সঙ্গে দেখা করে বললেন, মহারাজ, আপনি যদি আমাদের সঙ্গে যোগ দেন তাহলে একটা রাজ্য আপনার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, কিন্তু আপনি যদি শত্রুদের সঙ্গে যান তাহলে আপনার মৃত্যু অনিবার্য।

উত্তরে নানা সাহেব বললেন, ইংরেজদের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ? আমি সম্পূর্ণ রূপে তোমাদেরই।

ওদিকে কানপুরের সিপাইরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিল্লী অভিমুখে রওনা হলেন।

তাঁরা ৬ মাইল চলে গিয়েছেন। এই সময় নানা সাহেব আদেশ দিলেন, তোমরা ফিরে এসো।

বিদ্রোহীরা নেতার আদেশ শুনলেন। তাঁরা মাথা নত করে ফিরে এলেন। ইনট্রেঞ্চমেন্ট অবরোধ করলেন।

২৬শে জুন নানা সাহেব হুইলারের কাছে প্রস্তাব করে পাঠালেন, যাঁরা লর্ড ডালহৌসির কাজের জন্যে দায়ী নয় ও যাঁরা আত্মসমর্পণ করবেন তাদের নিরাপদে এলাহাবাদ যেতে দেওয়া হবে।

এই শর্তে ঐ তারিখেই জেনারেল হুইলার আত্মসমর্পণ করলেন। তারপর তাঁরা এলাহাবাদ অভিমুখে রওনা হবার জন্যে প্রস্তুত হলেন।

১৭শে জুলাই এলেন সতীচৌরা ঘাটে। ওখানে এসে নৌকোয় উঠলেন। তাঁরা খুব সকাল সকাল এসেছিলেন।

বেলা ৯টার সময় এলেন মেজর ভিবার্ট। তিনি এলেন সকলের শেষে।[৭]

তারপর নৌকো ছাড়ার আদেশ হলো।

নৌকো চললো। একটা আধটা নৌকো নয়, একসঙ্গে অনেকগুলি নৌকো যাত্রা সুরু করলো। কয়েকটি নৌকোয় আবার দেশীয় মাঝি-মাল্লা ছিল। তারা প্রত্যেক নৌকোয় ন'জন করে ছিল। কিছু দূর যাবার পর তারা নদীতে ঝাঁপ দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সিপাইরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লো।

তাদের গুলিতে কিছু মাঝি প্রাণ হারাল আবার কিছু নদীর পারে গিয়ে পৌঁছলো।

ইংরেজদের ঐ রকম ব্যবহার দেখে তীরে যে সকল বিদ্রোহী ছিলেন তারাও গুলি ছুঁড়লেন। একটা ছোট খাটো সংঘর্ষ সুরু হয়ে গেল। এই সংঘর্ষে অনেক স্ত্রী-পুরুষ-শিশু নিহত হলেন। টমসনকে নিয়ে মাত্র চার জন পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আগেই লেখা হয়েছে লখনৌ হতে ভারতীয় সিপাইরা বৃটিশ সৈন্যদের হটিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা রেসিডেন্সী দখল করে নিয়েছেন। তাই বৃটিশ সৈন্যরা মনে মনে লখনৌ পুনর্দখল করার মতলব আঁটতে লাগলো।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী। ভারতের তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং লিখলেন, এখনই লখনৌ আক্রমণ করতে হবে, রোহিলখণ্ড নয়।

গভর্ণরের আদেশমত ইংরেজ সৈন্যদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

সেনাপতি ক্যাম্পবেল লখনৌ আক্রমণ করবার জন্যে কানপুর থেকে তৈরী হচ্ছিলেন।

ইংরেজ বাহিনীগুলি কলকাতা, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব থেকে আসতে লাগলো। দিল্লী থেকে এক ট্রেন ভর্তি সৈনিক এলো। এলাহাবাদ থেকেও এলো ভারি কামান। পীলের নাবিক বাহিনীও এলো নদী পেরিয়ে।

স্থির হলো, ক্যাম্পবেল দক্ষিণ-পশ্চিম আর জঙ্গবাহাদুর ও জেনারেল ফ্রাঙ্ক পূব দিক থেকে একই সঙ্গে অযোধ্যার রাজধানী লখনৌ আক্রমণ করবেন।

এছাড়া জেনারেল আউটরামও একটি ৮,০০০ হাজারের বাহিনী নিয়ে লখনৌর কাছে আলমবাগে অপেক্ষা করছিলেন।

কিন্তু বিদ্রোহীরা আউটরামকে একদিনের জন্যেও শান্তিতে থাকতে দিলেন না। তাঁরা জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী—এই দু'মাসের মধ্যে দু'বার ভয়ানকভাবে আক্রমণ করলেন আউটরামের বাহিনীকে।

এই রকম একটা আক্রমণের সময় বেগম হজরত মহল নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে বিদ্রোহীদের উৎসাহ দিচ্ছিলেন।

এই সব আক্রমণের ফলে নিজের বাহিনীর এত ক্ষতি হচ্ছিল যে আলমবাগ ত্যাগ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন জেনারেল আউটরাম।

এইসব আক্রমণে বিদ্রোহীদের সাহস, বীরত্ব ও দৃঢ়চিত্ততার কোন অভাব দেখা যায়নি। দিল্লীতে তাঁরা যে সাহস দেখিয়েছিলেন এখানেও ঠিক তেমন সাহস দেখালেন। তবে ঠিক দিল্লীর মতই এই সব জায়গায় উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব, সামরিক পরিকল্পনা এবং রণকৌশলের অভাব ছিল।

আলমবাগের যুদ্ধে ইংরেজ ও ভারতীয় সিপাইদের মধ্যে অনেকে প্রাণ হারাল। তার মধ্যে ভারতীয় ফৌজের মৃত্যু সংখ্যা ছিল সর্বাধিক।

আলমবাগ যুদ্ধ প্রসঙ্গে ফরেস্ট লিখছেন: 'সিপাইরা তাদের অত্যধিক মৃত্যুসংখ্যার দ্বারাই প্রমাণ করেছে যে, তাদের সাহসের কোন অভাব ছিল না। দিল্লীর মত এখানেও তাদের যেটার অভাব ছিল সেটা হচ্ছে নেতৃত্ব। তারা যদি যুদ্ধ বিদ্যায় জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের নেতৃত্ব পেত তাহলে ইংরেজ সেনানায়কের পক্ষে তাঁর ঘাঁটি রক্ষা করা ও কানপুরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা খুবই কঠিন হত।'

যাহোক বিদ্রোহী সিপাইদের হাত থেকে লখনৌ পুনর্দখল করার

আশা নিয়ে ইংরেজ সেনাপতি ও সৈনিকগণ দীর্ঘদিন যাবৎ প্রাণপণ শক্তি নিয়ে প্রস্তুত হতে লাগলো।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ। সেনাপতি ক্যাম্পবেল আক্রমণ করলেন লখনৌ। সেই দিনই তিনি অধিকার করলেন দিলখুসা।

এরপর ইংরেজ সৈন্যরা ৪ঠা মার্চ তারিখে গোমতীর ওপর দু'টি সেতু নির্মাণ করলো।

জেনারেল ফ্রাঙ্ক এলেন ৫ই মার্চ। এখন ক্যাম্পবেলের অধীনে মোট ২৫,৬৬৪ জন সৈন্য ও ১৬৪টি কামান—এ পর্যন্ত ভারতে এইটিই সবার তুলনায় বড় এবং সর্বোৎকৃষ্ট সৈন্যবাহিনী।

গভীর রাত। ক্যাম্পবেল ও আউটরাম ভাবলেন, এই তো মহা সুযোগ শত্রুপক্ষের ব্যূহ আক্রমণ করার। এই সময় অধিকাংশ বিদ্রোহী সিপাই নিদ্রামগ্ন থাকে। সুতরাং আর দেরী নয়। এবার আক্রমণ করা যাক।

যেমন চিন্তা তেমনি কাজও হলো তড়িঘড়ি করে। উভয়েই গভীর রাতে নদী পার হলেন। চারদিক নিস্তব্ধ। ইংরেজ সৈন্য ও সেনাপতিরা সতর্কতার সঙ্গে নদী পার হলো।

৯ই মার্চ, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ।

ইংরেজ সিপাইদের সঙ্গে বিদ্রোহী ভারতীয় সিপাইদের সংঘর্ষ বাঁধলো লা মার্টিনিয়ের ও ছক্কর মঞ্জিলে। কিছুক্ষণ যুদ্ধ হবার পর ইংরেজ সৈন্য জয়লাভ করলো। তারা অনায়াসে লা মার্টিনিয়ের ও ছক্কর মঞ্জিল দখল করে নিলো।

১০ই মার্চ, ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দ।

ঐ দিন জং বাহাদুর ১০,০০০ গুর্খা সৈন্য নিয়ে পৌছলেন লখনৌতে। তিনি এই বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বৃটিশ সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হলেন। তারপর আক্রমণ হলো বেগমকুঠি।

১১ই মার্চ, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ। ঐদিন সমস্ত দিনরাত যুদ্ধ হলো বেগম-কুঠির ভেতরে এবং বাইরে। বিদ্রোহী ভারতীয় সিপাইরা কিছুতেই

ঐ কুঠি হাতছাড়া করতে চাইছিলেন না। তাঁরা প্রাণপণে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছিলেন। কুঠির অনেকগুলি কামরা ছিল। প্রতি কামরার মধ্যে বিদ্রোহী সিপাইরা ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে বেয়নেট ও হস্তযুদ্ধে রত হলেন।

কুঠির মাঝখানে প্রশস্ত প্রাঙ্গনে যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো তাতে ৮৬০ জন বিদ্রোহী সিপাই প্রাণ হারালেন। ইংরেজ সেনাপতি হডসন নিহত হলেন।

১৮৫৮ সালের ১৯শে মার্চ। ঐদিন ইংরেজ সৈন্যগণ বিদ্রোহীদের শেষ ঘাঁটি মুসাবাগ দখল করলো। কিন্তু তখনো পর্যন্ত সিপাইদের মনোবল ক্ষুন্ন হয়নি। তাঁরা ফয়জাবাদের মৌলভীর নেতৃত্বে ২২শে মার্চ পর্যন্ত লড়াই করলেন। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন বিশ হাজার। কিন্তু হলে কি হবে তাঁদের মধ্যে রণকৌশলের অভাব থাকার জন্যে পেছু হটতে বাধ্য হন শেষ পর্যন্ত। ইংরেজরা তাঁদের ঘেরাও করে। তখন বাধ্য হয়ে মৌলভী সৈন্যসামন্ত নিয়ে লখনৌ ত্যাগ করলেন।

এভাবে ২০ দিন ধরে যুদ্ধ করার পর ২২শে মার্চ তারিখে পতন হয় লখনৌ শহরের। ৮

এই যুদ্ধে অনেক মেয়ে সৈন্য যোগ দিয়েছিলেন। স্বয়ং বেগমও বহু রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে থেকে সৈন্য পরিচালনা করেছেন। অনেক নারী সৈন্য পুরুষের বেশে বিরাট সমরাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ইংরেজ সেনাপতি ও সিপাইরা তাঁদের সাজ পোষাক ও রণকৌশল দেখে বুঝতে পারেননি তাঁরা নারী সৈন্য। জনৈক ইংরেজ অফিসার মন্তব্য করেন: 'তারা হিংস্র বেড়ালের মত যুদ্ধ করেছিল আর তারা যে স্ত্রীলোক তা তারা নিহত হবার আগে বোঝা যায়নি।'

লখনৌ দখল করেছে ইংরেজরা। এবার এদের নজর পড়লো রোহিলখণ্ডের দিকে। সেনাপতি ক্যাম্পবেল জোর কদমে তোড়জোড় সুরু করলেন।

রোহিলখণ্ডের রোহিলারা আগে স্বাধীন ছিলেন। ১৭৭৪ সালে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে মিলিত হয়ে রোহিলখণ্ড আক্রমণ করেন। তখন রোহিলখণ্ডের নেতা হাফিজ রহমত খানের নেতৃত্বে যুদ্ধ করেন রোহিলারা।

হাফিজ রহমত সেই যুদ্ধে নিহত হন এবং রোহিলখণ্ড যুক্ত হয় অযোধ্যা রাজ্যের সঙ্গে। কিন্তু ১৮০১ সালে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ সরাসরিভাবে এই প্রদেশ নিজেদের রাজ্যভুক্ত করে নেন। ঐ বছরেই স্বাধীনচেতা রোহিলারা ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

মিরাট ও দিল্লীর বিদ্রোহের পর রোহিলখণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। ১৯শে মে মোরাদাবাদের ২৯ ম বাহিনী বিদ্রোহ করেন। তাঁর সঙ্গে বেরিলি বিগ্রেডও যোগ দেন ৩:শে তারিখে।

বিদ্রোহ করার সঙ্গে সঙ্গে সিপাইরা দিল্লী কিংবা লখনৌতে চলে যান।

হাফিজ রহমত খানের পৌত্রের নাম খান বাহাদুর খান। ৮০ বছর বয়সে দিল্লীর বাদশাহের অধীনে রোহিলখণ্ডে বিদ্রোহী সরকার প্রতিষ্ঠা করলেন।

বিদ্রোহের শুরুতে শক্তিশালী রাজপুত ঠাকুররা বিদ্রোহে যোগ দিলেন এবং খান বাহাদুরকে তাঁদের নেতা বলে মেনে নিলেন।

খান বাহাদুর খানের মন্ত্রী সভায় একজন ছাড়া আর সকলেই ছিলেন হিন্দু। রাজপুতদের নেতা জয়মল সিং ছিলেন তাঁর দক্ষিণ হস্ত।

চতুর ও ভেদবুদ্ধি পরায়ণ ইংরেজ শাসকরা এই ব্যাপারটি বিশেষ ভাল নজরে দেখলেন না। তাঁরা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করে বিদ্রোহীদের শক্তি দুর্বল করার জন্যে তৎপর হলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা সে কাজে কৃতকার্য হতে পারেননি।

বিদ্রোহী খান বাহিনীর অস্ত্রবল বিশেষ উন্নত ধরণের ছিল না। মাত্র কয়েকটি কামান ও বন্দুক ছাড়া তাঁদের সঙ্গে ছিল কয়েকটি বর্শা

ও তলোয়ার। এই সামান্য অস্ত্রবল নিয়ে সুসজ্জিত ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করার মনোবল ছিল রোহিলাদের। কারণ তাঁরা একটি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞও ছিলেন। সেটি হচ্ছে গেরিলা যুদ্ধ।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস। ইংরেজরা চারদিক থেকে রোহিলখণ্ড আক্রমণ করলো। এদের একটি শ্রেষ্ঠ বাহিনী জেনারেল ওয়ালপোলের অধীনে ১৫ই এপ্রিল রাজপুত রাজা নিরপত সিং-এর রুইয়া দুর্গ আক্রমণ করে। ইংরেজদের এই বাহিনীতে অনেক দক্ষ সেনাপতি ও যুদ্ধ বিশারদ সৈনিক থাকা সত্ত্বেও বিদ্রোহী এবং জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ভারতীয় সিপাইরা এমন প্রাণপণে যুদ্ধ করলেন যে অনেক ইংরেজ অফিসার ও সৈন্য রণাঙ্গণে প্রাণ হারালেন।

শেষকালে ইংরেজদের শোচনীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করে রাজার মন কেঁদে উঠলো। তিনি পরাজিত ও ভগ্নোদ্যম ইংরেজ বাহিনীকে পুনরায় আক্রমণ করবার মতলব পরিত্যাগ করলেন।

আক্রমণ না করে তিনি সুযোগ বুঝে একসময় রাতের অন্ধকারে দুর্গ ত্যাগ করে চলে গেলেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে তারিখে ইংরেজ বাহিনী বেরিলি শহর আক্রমণ করলো। রোহিলারা অপূর্ব বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। জনৈক ইংরেজ বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে মন্তব্য করেছেন: রোহিলারা যেরকম দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের বাম পার্শ্বের ব্যূহ ভেদ করে আক্রমণ করছিলেন তা এই বিদ্রোহের ইতিহাসে অতুলনীয়।

....রোহিলারা সোজা গিয়ে আমাদের একটি সেনা বাহিনী, ৪র্থ পাঞ্জাব বাহিনীর ওপর আক্রমণ করলো ও তাদের ছত্রভঙ্গ করে পেছনে হটিয়ে দিল। পেছনেই ছিল কামাণ্ডার-ইন-চীফের সঙ্গে ৪২ম হাইল্যাণ্ডাররা।....তলোয়ার উঁচু করে তীব্র গতিতে ঐ উন্মত্তের দল এক মুহূর্তের মধ্যে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, একদল তাদের কেন্দ্র আক্রমণ করল, আর একদল তাদের বাম পার্শ্ব আক্রমণ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে পশ্চাদ্‌ভাগে আক্রমণ শুরু করলো।

অনেকক্ষণ ধরে বেয়নেটে আর তলোয়ারে লড়াই হল।···জেনারেল ওয়ালপোল গুরুতরভাবে আহত হলেন। আরও কয়েকজন ইংরেজ এসে পড়াতেই তিনি বেঁচে গেলেন। রোহিলারা প্রত্যেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়ে প্রাণ দিয়েছিল।'

রোহিলারা ফিরে যাবার জন্যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসেননি। তাঁদের পণ ছিল, হয় মরবো না হয় মারবো। তাঁরা প্রাণপণে যুদ্ধ করেও পরাজয় বরণ করলেন। দুদিন ধরে যুদ্ধ চললো বেরিলিতে। অবশেষে ৭ই মে তারিখে বেরিলি অধিকার করলেন রোহিলারা।

খান বাহাদুর খান আরও কয়েকটি জায়গায় যুদ্ধ করেন। শেষ-কালে তিনি নানা সাহেবের সঙ্গে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের শেষে নেপালে প্রবেশ করেন।

জঙ্গবাহাদুরের সৈন্যদের হাতে তিনি বন্দী হন। কিন্তু সেখান থেকে পালিয়ে ছদ্মবেশে বেরিলিতে প্রত্যাবর্তন করেন।

এর কিছুদিন পরে কোতোয়াল তাহির বেগের হাতে ধরা পড়েন। পরে ইংরেজের বিচারালয়ে তাঁর ফাঁসি হয়।

বিদ্রোহী ভারতীয় সিপাইরা লখনৌ শহরে ইংরেজদের কাছে পরাজয় স্বীকার করলেও একেবারে ভগ্নোদ্যম হলেন না। তাঁরা অতঃপর অযোধ্যায় ছড়িয়ে পড়লেন।

ওদিকে ক্যাম্পবেল যখন বেরিলিতে যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন তখন ফয়জাবাদের মৌলভী এক দল সৈন্য নিয়ে ইংরেজ সেনাপতির পেছনে ধাওয়া করলেন। সাজাহানপুরে এসে মৌলভী ও তাঁর বাহিনীর সঙ্গে ক্যাম্পবেল ও তাঁর বাহিনীর যুদ্ধ হলো।

বেরিলির যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে মৌলভী অযোধ্যায় ফিরে যাবার জন্যে তৈরী হতে লাগলেন।

৫ই জুন তারিখে অযোধ্যা রোহিল-খণ্ডের সীমানায় পোভেইন নামে এক জায়গার এক রাজার দুর্গ আক্রমণ করেন। ঐ রাজা

ছিলেন অতিশয় রাজভক্ত। একটা হাতীর পিঠে বসে তিনি দুর্গের দরজা ভাঙবার চেষ্টা করছিলেন। তখন শত্রুপক্ষের গুলির আঘাতে তিনি নিহত হন।

তখন রাজভক্ত রাজা মৌলভীর দেহ থেকে মাথাটা কেটে নিয়ে সাজাহানপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে পাঠান।

ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ ছিন্ন মুণ্ডটি দেখে আহ্লাদে আটখানা। তিনি কোতোয়ালির সামনে ঐ মুণ্ডটি অনেকদিন ধরে ঝুলিয়ে রাখেন। তার পর রাজভক্ত রাজাকে বেশ কিছু মোটা টাকা উপহার দিলেন।

মৌলভী মারা যেতে বিদ্রোহীরা হতাশ হয়ে পড়লেন। বাস্তবিক মৌলভীর দেশভক্তির তুলনা নেই। তিনি ইংরেজের শত্রু ছিলেন। তা সত্বেও ইংরেজরা তাঁর গভীর দেশপ্রেমের পরিচয় পেয়ে তাঁর প্রতি সসম্ভ্রম স্বীকৃতি জানিয়ে লিখলেন 'দেশপ্রেমিক যদি তিনিই হন, যিনি তাঁর মাতৃভূমির স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য ষড়যন্ত্র করেন ও যুদ্ধ করেন, তা হলে মৌলভী নিশ্চয়ই একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক ছিলেন। তিনি কোন হত্যার দ্বারা তাঁর তরবারি কলঙ্কিত করেননি, কিংবা কোন হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতও হননি। যে বিদেশীরা অন্যায়ভাবে তাঁর দেশের স্বাধীনতা অপহরণ করেছে ও তাঁর দেশকে দখল করেছে, তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষের মতো, সম্মানজনকভাবে লড়েছেন। সর্বদেশের সাহসী ও সৎপ্রকৃতির মানুষেরই তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত।'

লখনৌ ও রোহিলখণ্ড জয় করার পর অযোধ্যার বিদ্রোহীদের দমন করার জন্যে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর ইংরেজরা অভিযান সুরু করলো। এই অভিযান চলেছিল ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। অযোধ্যার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন তারিখে যুদ্ধ হয়েছে। অনেকগুলি যুদ্ধ হলো বটে কিন্তু সেগুলির মধ্যে একটিও ভারতীয় সিপাইরা জিততে পারেননি। ভারতীয় সিপাইদলের নেতৃত্ব নেন শঙ্করপুরের রাজা

বেনীমাধব, নানাসাহেব এবং বেগম হজরত মহল। ইংরেজ বাহিনী গুলির নেতৃত্ব নেন লর্ড ক্লাইভ, ওয়েদার অল ও গ্র্যান্ট হোপ।

শেষ যুদ্ধ হয় বরবাঁকীতে। ওখানকার একটা খোলা মাঠে যুদ্ধ হবার পর বিদ্রোহীরা জঙ্গলে প্রবেশ করলেন। সেখানে নিজেদের পুনর্গঠন করে তারা ইংরেজদের ওপর ভালভাবে লক্ষ্য করে গুলি চালালেন।

ইংরেজ গোলন্দাজবাহিনী জঙ্গলের ভেতর বিদ্রোহীদের গুলি করতে পারছিল না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ চললো।

বেশ কয়েক দিক হতে ইংরেজরা সিপাইদের ঘিরে ফেললো।

বিদ্রোহীরা তখন জঙ্গলের ধার দিয়ে চলতে লাগলেন। সেই সময় হঠাৎ ইংরেজ সৈন্যবাহিনী তাঁদের ওপর আক্রমণ করলো। তাই দেখে সিপাইরা নদীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সেখানেও অনেকক্ষণ ধরে যুদ্ধ হলো। তার ফলে অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। কোন কোন সিপাই নদীর স্রোতে ভেসে গেলেন।

ভারতীয় বিদ্রোহীদের মধ্যে অনেকে তাঁদের নেতাসহ নেপালের জঙ্গলে আশ্রয় নেন। ওখানে কেউ কেউ ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। ফরাক্কাবাদের নবাব তফজ্জল হুসেন, মেন্দি হুসেন, মহম্মদ হাসান প্রভৃতি কয়েকজন ইংরেজের কাছে আত্মসমর্পণ করেন নেপাল সরকার মাম্মু খান, জওলা প্রসাদ ও আরও কয়েকজনকে ইংরেজ সরকারের হাতে সমর্পণ করেন।

এরপর নেপালের সৈন্যরা বেণীমাধবকে ধরবার জন্যে এগোতে থাকে। তখন তিনি, তাঁর ভাই যোগরাজ সিং ও তাঁদের অনেক সিপাই মারা যান। নানা সাহেবের আর কোন খবর পাওয়া যায়নি। বেগমকে ভারতে আনার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তিনি সেখান থেকে আসতে চাননি। অবশিষ্ট জীবন নেপালেই কাটিয়ে দেন। ইংরেজ সরকার তাঁর জন্যে পেন্সন বরাদ্দ করলেন। বেগম সেই পেন্সনও প্রত্যাখ্যান করলেন।

সিপাই যুদ্ধের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো জগদীশপুরের রাজা কুমার সিং-এর দুর্ধর্ষ ইংরেজ সৈন্যদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। রাজার বয়েস হয়েছিল আশি বছর। ঐ বয়সে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যেভাবে সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন তা সত্যিই রোমহর্ষক।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই। পাটনার কাছে দানাপুরে একদল সিপাই বিদ্রোহ করে জগদীশপুরে কুমার সিং-এর কাছে এসে বললেন, আপনি আমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করুন। আমরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবো।

বৃদ্ধ কুমার সিং বয়সের ভারে নত হলেও মনে মনে তখনো পর্যন্ত বিদ্রোহী ছিলেন। তিনি সিপাইদের কথা শুনে দমে গেলেন না। বরং উৎসাহ দিলেন। বললেন, তোমরা যখন বিদ্রোহের জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছ তখন আমিও প্রস্তুত আছি। চলো এবার অভিযান চালাই।

সিপাইরা নতমস্তকে কুমার সিং-এর নেতৃত্ব মেনে নিয়ে প্রাণপণে সংগ্রাম করার জন্যে এগিয়ে এলেন।

বৃদ্ধ কুমার সিং সিপাইদের নিয়ে সাহাবাদ জেলার প্রধান শহর আরা আক্রমণ করলেন।

ইংরেজরা প্রাণপণে যুদ্ধ করলো। কিন্তু সুশিক্ষিত ও অমিতবিক্রম সিপাইদের কাছে তারা পরাজয় মানতে বাধ্য হলো। কেবলমাত্র একটি সুরক্ষিত গৃহ ইংরেজদের অধিকারে রইলো। সিপাইরা এই গৃহের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিল।

ওদিকে কুমার সিং-এর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার জন্যে দানাপুর থেকে ডানবারের নেতৃত্বে প্রায় ৩৫০ জন ইংরেজ ও ১৫০ জন শিখ মাঝরাতে আরার ৩ মাইলের মধ্যে এলো। ঠিক এখানেই কুমার সিং-এর বাহিনী তৈরী হয়ে ছিল। তাঁরা ইংরেজ বাহিনীকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। প্রথমে ডানবার প্রাণ হারালেন।

তাই লক্ষ্য করে ইংরেজরা প্রমাদ গুণলো। তারা পালাবার পথ অনুসন্ধান করতে লাগলো কিন্তু পেলো না। যেদিক দিয়ে পালাতে যাবে সেদিকেই দেখে কুমার সিং-এর সৈন্য।

কুমার সিং-এর নেতৃত্বে বিদ্রোহী সিপাই সেদিন অনেক ইংরেজ সৈন্যর প্রাণ হরণ করেন। মাত্র ৫০ জন ইংরেজ প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিলেন।

কিন্তু ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এর প্রতিশোধ নিলেন পরে।

৩রা আগষ্ট মেজর এইর কাশী থেকে একটি বড় বাহিনী ও কামান নিয়ে তারা আক্রমণ করলেন।

কুমার সিং তখন আরা ছেড়ে চলে গেলেন জগদীশপুরে। কিন্তু সেখানে গিয়েও তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারলেন না।

১২ই আগষ্ট মেজর হাউইটজার কামান দিয়ে জগদীশপুর ধ্বংস করে দেন। এর ফলে বহু লোক হতাহত হয়। তাঁরা সকলেই ছিলেন ভারতীয়। যাঁরা আহত এবং নিহত হলেন তাদেরকে দেড় মাইল ব্যাপী রাস্তার দু'ধারে গাছের শাখা থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো।

এবার কুমার সিং জগদীশপুর থেকে এলেন ৮ মাইল দূরে আতাউরা শহরে। সেখানে তাঁর প্রাসাদে এসে আশ্রয় নিলেন। সেই সময় এইর তাঁর বাহিনী নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করলেন।

কুমার সিং সেই স্থানও ত্যাগ করলেন। এলেন রেওয়া রাজ্যে। এখানে তাঁর এক আত্মীয় থাকতেন। তিনি তাঁর কাছে আশ্রয় চাইলেন। কিন্তু আত্মীয়টি তাঁকে আশ্রয় দিতে রাজী হলেন না।

এবার কুমার সিং বাধ্য হয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিলেন। ছয় সাত মাস তিনি জঙ্গলে কাটালেন।

ইংরেজরা তাঁকে ঘেরাও করে অনেক রকম নির্যাতন করতে সুরু করলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কুমার সিং ও তাঁর বাহিনীর কোন রকম ক্ষতি করতে সমর্থ হলো না।

১৭ই মার্চ তারিখে ইংরেজরা আর একটা নতুন খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল। ইংরেজরা সতর্ক দৃষ্টি মেলে দিল চারদিকে। তাদের সেই দৃষ্টি এড়িয়ে কুমার সিং গঙ্গা পার হয়ে পূর্ব-অযোধ্যায় আজিমগড় থেকে ২০ মাইল দূরে আত্রোলিয়া নামে একটি জায়গায় এসে শিবির স্থাপন করলেন।

কুমার সিং আত্রোলিয়া এসেছেন এই সংবাদ জানতে পারলেন ইংরেজ কর্তৃপক্ষ।

আজিমগড় কেন্দ্রের কমাণ্ডার কর্ণেল মিলম্যান ২১শে মার্চ কুমার সিংকে আত্রোলিয়াতে আক্রমণ করলেন।

সামান্য যুদ্ধ করার পর বিদ্রোহীরা পিছু হটলেন। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ মনে করলেন, তাঁদের বিরাট জয় হয়েছে।

তখন তাঁরা অস্ত্র-শস্ত্র নামিয়ে রেখে আনন্দে আহার করতে বসলেন। এই মহা সুযোগ নিয়ে কুমার সিং ইংরেজদের আক্রমণ করলেন।

ইংরেজরা বিভ্রান্ত হয়ে জিনিষপত্র ফেলে মিলম্যানের নেতৃত্বে পালিয়ে গেল।

মিলম্যান প্রাণ বাঁচাবার জন্যে কোন মতে আজিমগড়ে এসে তাঁর দুর্গে আশ্রয় নিলেন। তারপর কাশী, লখনৌ ও এলাহাবাদে খবর পাঠালেন।

খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাশী থেকে কর্ণেল ডেইমস একটা বাহিনী নিয়ে মিলম্যানকে বাঁচাবার জন্যে এলেন।

কিন্তু আজিমগড়ে আসার সময় ডেইমসের বাহিনীও প্রায় শেষ হয়ে এলো। বাকি কিছু সৈন্য নিয়ে তিনি মিলম্যানের দুর্গে আশ্রয় নেন।

কুমার সিং-এর বীরত্বের পরিচয় পেয়ে গভর্ণর জেনারেল ক্যানিং বড় চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ভাবলেন, কি ভাবে এবং কাকে দিয়ে কুমার সিংকে শায়েস্তা করা যায়।

অবশেষে তিনি স্থির করলেন, জেনারেল মার্ক কে-র ওপর ভার দেওয়া যাক বিদ্রোহী সিপাইদের জব্দ করার জন্যে।

মার্ক কে মনোনীত হলেন কুমার সিং-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে।

৬ই এপ্রিল তারিখে মার্ক কে কাশী হতে তার বিরাট ইংরেজ বাহিনী ও আটটি কামান নিয়ে কুমার সিংকে আজিমগড়ের ৮ মাইল দূরে আক্রমণ করেন।

কুমার সিং-এর কোন কামান ছিল না। কিন্তু তিনি এমন চতুরতার সঙ্গে যুদ্ধ করলেন যে ইংরেজ বাহিনীর অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠলো।

ইংরেজরা রণক্ষেত্র ত্যাগ করে আজিমগড় অভিমুখে চলে গেল।

মার্ক কে নতুনভাবে কুমার সিংকে জব্দ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি কাশী হতে কুমার সিংকে আক্রমণ করবার জন্যে আসছিলেন। ঠিক ঐ সময় আর একটি ইংরেজ বাহিনী জেনারেল স্যার এডোয়ার্ডলুগার্ডের অধীনে এলাহাবাদ থেকে রওনা হয়েছিলেন।

ইংরেজ কর্তৃপক্ষের অভিসন্ধি ছিল যে তাদের এই দুই বাহিনী দিয়ে কুমার সিং-কে বিব্রত করে তুলবেন।

কিন্তু চতুর কুমার সিং ইংরেজ কর্তৃপক্ষের ঐ প্রকার মতলব বানচাল করে দিয়ে জগদীশপুর অভিমুখে রওনা হলেন।

এদিকে জেনারেল লুগার্ড বিদ্রোহীদের প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছেন। টন্স নদীর সেতু পার হতে পারলেই তিনি বিদ্রোহীদের পথরোধ করে দাঁড়াতে পারবেন।

কিন্তু কুমার সিং তা হতে দিলেন না। তিনি নিজের কয়েকজন সিপাইকে সেতুর প্রবেশ পথে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজের বৃহত্তর বাহিনী নিয়ে চলে গেলেন অন্যত্র।

তাঁর সেতুর মুখে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সিপাইয়ের সঙ্গে জনাকয়েক

ইংরেজের সামান্য যুদ্ধ বাঁধে। তাতে করে বিহারের কুখ্যাত নীলকর ভেনাবেল নিহত হন।

এভাবে কুমার সিংকে ইংরেজরা কয়েকবার ঘেরাও করার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রতিবারেই ব্যর্থ হয়। একসময় নদী পার হতে গিয়ে কুমার সিং ইংরেজ সিপাইয়ের গুলিতে আহত হন। ফলে তাঁর একটি হাত চিরদিনের মত নষ্ট হয়ে যায়। তবু তাঁর মনোবল অক্ষুণ্ণ ছিল।

এভাবে দীর্ঘ ৮মাস ধরে অনবরত যুদ্ধ করার পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল ১০০০সৈন্য ও ২টি কামান নিয়ে কুমার সিং আবার তাঁর জন্মস্থান জগদীশপুরে প্রত্যাবর্তন করলেন। নিজের প্রাসাদে বৃটিশ পতাকা নামিয়ে তার জায়গায় তুললেন স্বাধীন ভারতের জাতায় পতাকা।

ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে ঐ খবরটি যাবার পর তাঁদের মন মেজাজ গেল বিগড়ে। তাঁরা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বিশেষ করে কমাণ্ডিং অফিসার লেগ্রাণ্ড বড়ই বিচলিত হলেন। তিনি তক্ষুনি হাউইটজার কামান আর একদল ইংরেজ ও শিখ সৈন্য নিয়ে তক্ষুনি জগদীশপুর আক্রমণ করলেন।

কুমার সিং এবং তাঁর বাহিনী আট মাস যুদ্ধ করে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তবু তাঁরা বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ইংরেজ সৈন্যদের ওপর এবং এমন সুকৌশলে যুদ্ধ করলেন যে কয়েকশত ইংরেজ সৈন্যের মধ্যে মাত্র ৮০জন প্রাণ নিয়ে ফিরতে সক্ষম হয়েছিল। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এমন শোচনীয় পরাজয়ের মুখে কখনো পড়েননি। ঐতিহাসিক চার্লস বল তাঁর মন্তব্য করেছেন, এরূপ একটা লজ্জাকর কাহিনীর বিবরণ লিখতে আমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে।

যাক, ঐ বিজয়ের পর আর বেশীদিন বেঁচে ছিলেন না কুমার সিং। মাত্র তিনদিন পরে ১৮৫৮ সালের ২৬শে এপ্রিল স্বাধীন পতাকার তলায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

কুমার সিং-এর মৃত্যুর পরও কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রাম স্তব্ধ হয়ে গেল

না। তার ভাই অমর সিং গেরিলা যুদ্ধ নীতি অনুসরণ করে পশ্চিম বিহারের স্বাধীনতা সংগ্রাম অক্টোবর মাস পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে গেলেন।

১৯শে অক্টোবর লেনাদী নামে এক গ্রামে শেষ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে তাঁর ৪০০ সিপাইয়ের মধ্যে ৩০০জন মারা যান। বাকী ১০০ সিপাই নিয়ে তিনি ইংরেজের ব্যূহ ভেদ করার চেষ্টা করছিলেন। তার ফলে ৩জন ছাড়া সকলেই প্রাণ হারান। ঐ জীবিত ৩জনের মধ্যে অমর সিং হচ্ছেন অন্যতম। পরে তিনি কোথায় গেলেন সে খবর কেউ বলতে পারেনি।

'মেরী ঝান্সী নেহি দেউঙ্গী' তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন কথাটি তেজস্বিনী মহিলা ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ যখন ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাঁর রাজ্য নিজেদের সাম্রাজ্যভুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ঝান্সীর রাজা গঙ্গাধর রাও মারা যান। তাঁর দত্তককে ইংরেজ শাসক রাজ্যের অধিকার দিতে অস্বীকার করলেন। রাণীকে যখন বৃটিশ শাসকদের সিদ্ধান্ত জানানো হলো তখন তিনি তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে উপরোক্ত মন্তব্যটি উচ্চারণ করেন।

ইংরেজ শাসক কেবল যে তাঁর সম্পত্তির অধিকার নিয়ে নিলেন এমন নয়, তাঁর দেবোত্তর সম্পত্তিও দখল করে নিলেন।

মিরাট ও দিল্লীর বিদ্রোহের কিছুদিন পরে ৪ঠা জুন ঝান্সীর ১২শ বাহিনীর ৬০০ সিপাই বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। প্রায় ১ ০জন ইংরেজ পুরুষ, স্ত্রী ও শিশু দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নেয়।

৬ই জুন তারিখে বিদ্রোহীরা দুর্গ অবরোধ করলেন। একজন ভৃত্য দুর্গ থেকে পালাবার চেষ্টা করলে লেফটেনান্ট পেইস তাকে হত্যা করেন।

তাই দেখে পেইসের নিজের ভৃত্য মণিবকে তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেললো।

সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ কর্তাদের মধ্যে তুমুল আলোড়ন পড়ে গেল। ভৃত্যরা বিশ্বাসঘাতক এই ধ্বনি তুলে ইংরেজ কর্তারা দুর্গের অভ্যন্তরে দু'জন ভৃত্যকে খুন করলেন।

সিপাইগণও ইংরেজদের এই কীর্তি মনে রেখে তার বদলা নিলেন। ৮ই জুন তারিখে জোকার বাগে ৫৬ জন ইংরেজকে দুর্গ হতে বের করে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়। এর আগে অবশ্য ইংরেজ বিদ্রোহীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

এরপর বিদ্রোহী সিপাইরা রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা নিয়ে দিল্লী চলে যান। রাণী এই বিদ্রোহে অংশ নেননি। বরং তিনি স্ত্রী ও শিশুদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন।

সিপাইরা দিল্লী চলে যাবার পর ঝান্সী সম্পূর্ণ অরক্ষিত হয়ে পড়লো। রাণীর মাত্র ৪০ জন দেহরক্ষী থাকলো। রাণী তখন সাগর বিভাগের লেফটেনান্ট এরস্কিনকে সমস্ত ব্যাপারটি জানালেন। এবং সাহায্য চাইলেন।

এরস্কিন রাণীর হাতে ঝান্সীর শাসনভার ছেড়ে দিলেন। এখন থেকে রাণী রাজ্যে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় এবং পুলিশ বাহিনী গঠন করে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারবেন।

এর মধ্যে ঝান্সীকে অসহায় অবস্থা দেখে পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক কলহ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো।

গদাধর রাওএর মৃত্যুর পর সদাশিব রাও ঝান্সীর রাজ্য দাবি করেছিলেন। এই সুযোগে তিনি ঝান্সী রাজ্য আক্রমণ করেন এবং নিজেকে মহারাজা বলে ঘোষণা করলেন।

রাণী লক্ষ্মীবাঈ সদাশিব রাওকে দুর্গের মধ্যে বন্দী করে রাখলেন।

মারাঠা রাজ্য ঝান্সীর সঙ্গে রাজপুত রাজাদের বিরোধ ছিল অনেকদিনের। তাঁরাও রাণীর এইপ্রকার নিঃসহায় অবস্থা লক্ষ্য করে ঝান্সী আক্রমণ করে বসলো।

রাণী তখন ইংরেজদের কাছে সৈন্য সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। কিন্তু

ইংরেজ শাসক রাণীর কথায় কর্ণপাত করলেন না। এমন কি তাঁর শত্রুদের লক্ষ্য করে কোনরকম সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন না।

রাণী একাই শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে ঝান্সীকে শত্রু মুক্ত করলেন। এর ফলে তাঁর মনে সাহস এলো তিনি নতুন করে এক ঝান্সী বাহিনী গঠন করার পরিকল্পনা করলেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ কর্তপক্ষ ঝান্সী রাজার যে সমস্ত সৈন্যদের বরখাস্ত করেছিলেন রাণী লক্ষ্মীবাঈ তাঁদের ডেকে নতুন এক সৈন্যবাহিনী গঠনের দিকে মনোনিবেশ করলেন। সৈন্যদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন। রাণী তাঁদের মধ্যে প্রীতির ভাব বজায় রাখবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁদের শিক্ষা, অভাব অভিযোগ এইসব ব্যাপারে খুব সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে লাগলেন। এমন কি আহত সৈনিকদের কাছে গিয়ে তাঁর সেবা-শুশ্রূষার ভার নিজের হাতে নিলেন।

কেবল সৈনিক কেন অন্য নাগরিকদের সেবাযত্নের ভারও নিজের হাতে নিতেন। এর ফলে রাণী সামরিক ও বেসামরিক উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের চিত্ত জয় করতে পেরেছিলেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত রাণী লক্ষ্মীবাঈ ইংরেজ শাসকদের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে তা আর সম্ভব হলো না যখন তিনি জানতে পারলেন যে ইংরেজ সরকার সিপাই বিদ্রোহের অন্যতম সহায়ক হিসাবে তাঁকে দায়ী করছেন এবং তাঁর বিচারের গোপন আয়োজন চলছে। তখন রাণী স্থির করলেন বিচারের কাঠগড়ায় আসামী রূপে দাঁড়ানোর চেয়ে ইংরেজ সরকারের হীন মনোভাব এবং নিপীড়নমূলক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়াই অধিকতর সম্মানজনক। তাই রাণী অতি অল্পকালের মধ্যে বিরাট সৈন্য বাহিনী গঠন করে ফেললেন। তাঁর এই প্রকার অদ্ভুত সংগঠনী শক্তির পরিচয় পেয়ে শত্রুপক্ষ ইংরেজ সরকার পর্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

১৮৫৭ সালের শেষ ভাগে মধ্য ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠলো। গোয়ালিয়র, মালোয়া, ইন্দোর, বান্দা, গড়কোটা, বানপুর, চিরখরী, চান্দেরী, ও শাহগড় রাথগড়ের অধিবাসীরা ইংরেজ শাসকদের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। গোয়ালিয়র, ইন্দোর, বরোদা প্রভৃতি বৃটিশাশ্রিত রাজারা বিদ্রোহ দমন করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন কিন্তু সমর্থ হলেন না।

রাণী লক্ষ্মীবাঈও জানুয়ারী মাসে খোলাখুলি ভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন।

দুর্গের ওপর উড়িয়ে দিলেন সংগ্রামের প্রতীক নাকাড়া ও চামর চিহ্নিত লাল পতাকা। আগে সেখানে শোভা পেত ক্ষমা ও ত্যাগের প্রতীক মারাঠা গৈরিক পতাকা। রাণীর অধীনে বিরাট সিপাইবাহিনী অধীর অপেক্ষায় দিন গুণছিলেন সংগ্রামের জন্য।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস। মধ্য ভারতের ইংরেজ বাহিনীর সেনানায়ক হিউগ রোজ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করলেন।

তিনি রাথগড়, বারোদিয়া, গড়কোটা, নারুত ও মদনপুরে বিদ্রোহী সিপাইদের পরাজিত করে ঝান্সীর দুর্গের সামনে এসে অবস্থান করতে লাগলেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ। এই সময় আর একটি ইংরেজ বাহিনী ব্রিগেডিয়ার ষ্টুয়ার্টের নেতৃত্বে চান্দেরী দখল করার পর ঝান্সীতে এলো। এভাবে রোজের বাহিনীর সঙ্গে ষ্টুয়ার্টের বাহিনী মিলিত হয়ে ইংরেজ সরকারের সামরিক শক্তি বাড়িয়ে তুললো।

পরে ইংরেজ বাহিনী আক্রমণ স্থুরু করলো। উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ চললো। ১৫দিন ধরে দু'পক্ষের মধ্যে কামান যুদ্ধ চললো।

এর মধ্যে নানা সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র রাও সাহেব ১০,০০০ সৈন্যের এক বাহিনী তাঁতিয়া তোপীর নেতৃত্বে রাণীকে সাহায্য করার জন্য পাঠালেন। কিন্তু সেই বাহিনী বেশীক্ষণ রাণীর পক্ষে থেকে যুদ্ধ করতে

রাজা হলেন না। বেতোয়া নদীর তীরে কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পর তাঁরা আবার ফিরে গেলেন রাও সাহেবের শিবিরে।

এসব ব্যাপার লক্ষ্য করে ইংরেজ বাহিনীর মনে সাহস ও শক্তি বেড়ে গেল।

তারা দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে ঝান্সী বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। রাস্তায় রাস্তায় বাড়ীতে বাড়ীতে যুদ্ধ আরম্ভ হলো। পরে সে যুদ্ধ প্রাসাদের অভ্যন্তরে এসে পৌছলো। তাই দেখে রাণীর দেহরক্ষীরা আস্তাবলে এসে আশ্রয় নিলেন।

ইংরেজ সৈন্যরা আস্তাবলে আগুন ধরিয়ে দিল। তখন রাণীর দেহরক্ষীরা গায়ে জ্বলন্ত আগুনের শিখা নিয়ে আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এসে আক্রমণকারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু শেষরক্ষা আর হলো না।

ইংরেজ বাহিনী অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রাসাদ দখল করে নিলো। তারপরও এক'দিন ধরে সমানে যুদ্ধ চালিয়ে গেল ইংরেজ বাহিনী। যুদ্ধের পর শুরু হলো ব্যাপক ভাবে লুণ্ঠন আর নরহত্যা। ইংরেজরা তখন এমনই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল যে সামনে যাকে পেয়েছিল তাকেই হত্যা করে নিজেদের জিঘাংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে লাগলো।

বিদ্রোহী সিপাইদের মধ্যে অনেকে ইংরেজের চোখে ধূলো দিয়ে অন্যত্র পালিয়ে গেলেন। যাঁরা পালাতে পারলেন না তাঁরা নিজেদের শিশু ও স্ত্রীদের আগে কূয়োর মধ্যে নিক্ষেপ করলেন। তারপর নিজেরা কুয়োর মধ্যে ঝাঁপ দিলেন।

এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও রাণী কিন্তু বিচলিত হলেন না। তিনি একদল পাঠান সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে ঘোড়ায় চড়ে ইংরেজ বাহিনীর ব্যূহ ভেদ করে কল্পি অভিমুখে অগ্রসর হতে লাগলেন। সেখানে তিনি রাও সাহেব, বান্দার নবাব এবং তাঁতিয়া তোপীর সঙ্গে মিলিত হলেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ। কল্পির কিছু দূরে কুঞ্জে আবার

যুদ্ধ হলো। বিদ্রোহীরা এই যুদ্ধে হেরে গেলেন। তখন তারা গোয়ালিয়রে এলেন। ১লা জুন বিনা যুদ্ধে শহর দখল করলেন।

এই সংবাদ পেয়ে ইংরেজ বাহিনী গোয়ালিয়র দখল করবার জন্যে তোড়জোড় করতে লাগলো। ইতিমধ্যে গোয়ালিয়রের মহারাজা পালিয়ে গিয়ে ইংরেজের আশ্রয় নিয়েছেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন। এই দিনটি ভারতের ইতিহাসে অক্ষয় এবং স্মরণীয় হয়ে আছে। এই দিন ইংরেজ বাহিনী গোয়ালিয়র আক্রমণ করলো।

রাণী লক্ষ্মীবাঈ এবং তাঁর সৈন্য বাহিনী বিপুল বিক্রমে ইংরেজদের সঙ্গে সংগ্রাম চালালেন। এই যুদ্ধ ইতিহাসে 'কোট-কী-সরাই' যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারলেন না রাণী। ইংরেজদের অস্ত্রাঘাতে তিনি প্রাণ হারালেন। তাঁর বীরত্বময় মহিয়সী জীবনের অনির্বাণ শিখা অকালে নির্বাপিত হলো। আক্রমণের তিন দিন পর অর্থাৎ ২০শে জুন তারিখে রাণী মহাপ্রস্থানে যাত্রা করলেন।

রাণী লক্ষ্মীবাঈ দেহ রক্ষা করলেন। সিপাইরা রাণীর মৃত্যুতে সাময়িকভাবে বিচলিত হলেও তাঁতিয়া আর রাও সাহেবকে দেখে তাঁরা আবার বুকে বল পেলেন।

তাঁতিয়া ও রাও সাহেব আগে কয়েকটি সিপাই নিয়ে গোয়ালিয়র ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁরা এক নতুন ধরণের সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন।

এখন বিদ্রোহী সিপাইদের মনোবল অনেকটা ক্ষুন্ন হয়ে পড়েছে। কারণ ইতিমধ্যে বেরিলি, লখনৌ ও কানপুরের মত বড় শহর ইংরেজদের হস্তগত হয়েছে। এর ওপর ইংরেজরা স্বদেশ অর্থাৎ ইংল্যাণ্ড হতে বহু সৈন্য এনে ভারতীয় সিপাইদের বিদ্রোহ ষোল আনার মধ্যে বারো আনা নষ্ট করে ফেলেছে।

তাই ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিক অন্ধকার। এই অন্ধকারে জয়ের আলো দেখতে পাচ্ছিলেন না সিপাইগণ, তাঁরা হতাশ হয়ে নতুন নেতার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এই হতাশার অন্ধকারে —নিরাশার কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশে কে তাঁদের আশার সূর্য্য দেখাতে পারবে ?

অবশেষে তাঁদের আশা আংশিকভাবে পূর্ণ হবার সুযোগ এলো। মনের দিগন্ত হতে হতাশার কালো মেঘ অপসৃত হবার উপক্রম হলো যখন তাঁরা শুনলেন বীর সৈনিকদ্বয় তাঁতিয়া তোপী ও রাও সাহেব নতুন পরিকল্পনা নিয়ে শিবাজীর গেরিলা যুদ্ধনীতি অবলম্বন করে ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন।

অটুট মনোবল নিয়ে তাঁতিয়া দক্ষিণ দিক অভিমুখে যাত্রা করলেন। সেই সময় আগ্রা থেকে একটি ইংরেজ বাহিনী ২০শে জুন তারিখে তাঁকে গোয়ালিয়র থেকে ২০ মাইল পশ্চিমে জৌরা আলিপুরে আক্রমণ করে। ইংরেজ জেনারেল রবার্ট নেসিয়ার মনে করেছিলেন যে এভাবে তিনি তাঁতিয়াকে জব্দ করবেন। কিন্তু চতুর তাঁতিয়া তাঁর সে আশা নির্মূল করে অন্যদিকে যাত্রা করলেন।

তাঁতিয়া স্থির করলেন জয়পুর আক্রমণ করবেন। কারণ জয়পুরের মহারাজা ইংরেজ সরকারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও তাঁর প্রজা, সৈন্য ও পুলিশ বাহিনী অন্তরে অন্তরে হয়ে উঠেছিলেন ইংরেজ বিদ্বেষী।

তাঁতিয়া তাই এই সুযোগ নেবার জন্যে জয়পুর অভিমুখে যাত্রা করলেন।

তাঁতিয়া জয়পুর যাচ্ছেন এই সংবাদ পেয়ে গেলেন রাজপুতানার ইংরেজ সেনা-নায়ক রবার্টস।

তিনি তখনি নাসিয়াবাদ থেকে চলে এসে সৈন্যবাহিনী নিয়ে জয়পুর অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং অতি সত্বর ঐ রাজ্য দখল করলেন।

এবার তাঁতিয়া টঙ্কের দিকে রওনা হলেন। টঙ্কের নবাব কিছু

অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে তাঁর বাহিনীকে পাঠালেন তাঁতিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে।

আশ্চর্যের বিষয় ঐ নবাব বাহিনী তাঁতিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করে তাঁর পক্ষে যোগ দিলেন।

তাঁতিয়ার এবার মহা সুযোগ এসে গেল। তাঁর ভাগ্যদেবী হলেন সুপ্রসন্ন। তিনি অস্ত্রবল ও সৈন্যবল দুই-ই পেলেন।

তাঁতিয়া দলবল নিয়ে দক্ষিণ দেশ অভিমুখে যাত্রা করলেন।

এর মধ্যে রবার্টস ও হোমস দু'ধার থেকে দু'টি ইংরেজ বাহিনী নিয়ে টঙ্কে এসে দেখলেন যে তাঁতিয়া সেখানে অনুপস্থিত। তিনি সেখান থেকে অনেক দূরে চলে গেছেন।

তারপর তাঁতিয়া ও তাঁর গেরিলা বাহিনী গোয়ালিয়রের দাক্ষণ-পশ্চিমে ২০০ মাইল দূরে চম্বল নদীর ধারে ইন্দ্রগড়ে এসে পৌঁছলেন।

তখন ছিল বর্ষাকাল। চম্বল নদী স্ফীতকায় হয়ে উঠেছিল। তাই তাঁতিয়া কামান সহ বিরাট গেরিলা বাহিনী নিয়ে ঐ নদী অতিক্রম করতে অসমর্থ হলেন।

এবার তাঁতিয়া বুঁদির দিকে রওনা হলেন এবং দ্রুত মার্চ করে নিমচ নাসিরাবাদ অঞ্চলে এলেন। পরে গেলেন উদয়পুরে। সেখানকার মহারাজা ও জনসাধারণ তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন।

এবার তাঁতিয়া উদয়পুর ত্যাগ করে ৮০ মাইল দূরে এসে জানতে পারলেন যে তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে দুই ইংরেজ সেনাপতি—বরার্টস আর হোমস্।

তখন তিনি ভীলওয়ারা নামে একটি জায়গায় ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন।

যুদ্ধ হয়েছিল ঘোর অন্ধকার রাত্রে। তাই তাঁতিয়া কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পর আত্মগোপন করলেন।

কিন্তু বেশীক্ষণ আত্মগোপন করে থাকতে পারলেন না। ইংরেজের শক্তিশালী এবং বিপুল বাহিনী তাঁকে চারদিক হতে ঘিরে ধরলো।

যেদিকেই তিনি যাবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন সেদিকেই দেখেন ইংরেজ সৈন্য।

আরাবল্লী পর্বতমালায় পরিবেষ্টিত রাজসমন্দ হ্রদের কাছেই রয়েছে কাকোলী। তার কাছে ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ হয় তাঁতিয়ার বাহিনীর।

বেশ কয়েকদিন ধরে যুদ্ধ হলো। অবশেষে তাঁতিয়া সুকৌশলে কিছুসংখ্যক সৈন্যকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্যস্ত রেখে বাকী সৈন্য নিয়ে বান নদী সাঁতরিয়ে পুনরায় আত্মগোপন করলেন।

এবার তাঁতিয়া একেবারে অস্ত্রহীন অবস্থায় পড়লেন। তিনি ছুটে চললেন নর্মদার তীরে। ওদিকে ইংরেজ বাহিনীও বসে ছিল না। তারাও তাদের শেষ শত্রুকে নিধন করার জন্যে তাঁতিয়াকে অনুসরণ করতে লাগলো। তারা চতুর্দিক হতে তাঁতিয়াকে ঘিরে ফেলে তাঁর ও তাঁর সৈন্যদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার করতে লাগলো

তাঁতিয়াও অত্যন্ত কৌশলে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রায় ২০০ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে এসে পৌঁছলেন চম্বল নদীর তীরে ২০শে আগষ্ট তারিখে।

কিন্তু এখানে এসেও ইংরেজদের হাত থেকে নিস্তার পেলেন না তাঁতিয়া। তিনি দেখলেন নদীর দু' পাড়েই দাঁড়িয়ে রয়েছে ইংরেজের বিপুল সৈন্যবাহিনী।

ওদিকে চম্বল নদী পার হওয়াও তখন দুঃসাধ্য ছিল। বর্ষাকাল বলে নদী স্ফীতকায় হয়ে উঠেছে।

তথাপি তাঁতিয়া একপ্রকার মরিয়া হয়ে ইংরেজদের আক্রমণ উপেক্ষা করে স্ফীতকায় চম্বল নদী পার হয়ে দ্রুতবেগে ঝালোয়ার রাজ্যের রাজধানী ঝালরাপতনে এসে পৌঁছলেন।

ওখানকার ইংরেজভক্ত রাজা রাণা পৃথ্বীসিং তাঁতিয়াকে বাধা দিতে উদ্যত হলেন। কিন্তু রাণার সৈন্য বাহিনী তাঁতিয়ার পক্ষে যোগ দিলেন। এবার নিরস্ত্র ও নিঃসহায় তাঁতিয়ার পক্ষে অনেক সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত হলো।

ঝালরাপতনে ৫দিন বিশ্রাম নেওয়ার পর তাঁতিয়া আবার যাত্রা শুরু করলেন রায়গড় হয়ে ইন্দোর অভিমুখে। ইন্দোরে যাওয়ার জন্যে তাঁতিয়া বড় উদ্‌গ্রীব হলেন। কেন না ওখানকার বিরাট সৈন্যবাহিনী তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল। আর তাঁতিয়া বুঝতে পারলেন, একবার যদি ইন্দোর তাঁর হস্তগত হয় তাহলে তাঁর পক্ষে স্বাধীন মহারাষ্ট্র রাজ্য পত্তন করা বিশেষ অসুবিধে হবে না।

কিন্তু বিধি হলেন বিরূপ। রায়গড় পৌঁছুতে তাঁতিয়ার বেশ-কিছু দিন দেরী হয়ে গেল। এই সুযোগে ইংরেজরা তাঁতিয়ার ইন্দোরে আসার পথ বন্ধ করে দিলো।

জেনারেল মিচেল ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে বিওউরাতে তাঁতিয়াকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু বিশেষ সুবিধে করতে পারলেন না।

বিদ্রোহী সিপাইরা চান্দেরী দখল করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। অতঃপর তাঁরা ১০ই অক্টোবর তারিখে মাং গোলীতে মিচেলের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন।

এখানে তাঁতিয়া ইংরেজের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে নর্মদা নদী পার হয়ে নাগপুরে চলে গেলেন। তারপর তিনি অসিরগড় ও কুরগাঁও যুদ্ধে লিপ্ত হন। এইসব জায়গায় ইংরেজরা তাঁকে চারদিক থেকে এমনভাবে ঘিরে ফেললো যে তাঁর পক্ষে মহারাষ্ট্রে পৌঁছানার স্বপ্ন সফল করা দুষ্কর হয়ে দাঁড়াল।

তখন তাঁতিয়া ও রাওসাহেব নর্মদা পার হয়ে উত্তর দিকে যাত্রা করলেন। তিনি যাবেন মারাঠা রাজ্য বরোদার রাজধানীতে।

কিন্তু সেখানে তাঁর পক্ষে যাওয়া হয়ে উঠলো না। ইংরেজবাহিনী বরোদা থেকে ৫০ মাইল দূরে ছোট উদয়পুরে তাঁকে আক্রমণ করলো। তখন তাঁতিয়া বাঁসোয়ার, মেওয়ার প্রতাপগড়, মন্দিসোর ও জিয়াপুর হয়ে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কোটা রাজ্যে এলেন।

এখানে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন নারওসারের বিদ্রোহী রাজপুত রাজা মান সিং।

ওদিকে শাহজাদা ফিরোজ শাহ ইন্দ্রগড়ে এসে তাঁতিয়ার সঙ্গে মিলিত হলেন।

১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী। এই দিন ইংরেজ বিগ্রেডিয়ার সাওয়ার্স জয়পুর ও ভরতপুরের মাঝামাঝি দোভাষা নামে এক জায়গায় তাঁতিয়া ও তাঁর দলবলকে ঘেরাও করে।

তাঁতিয়া ও ফিরোজ শাহ অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলেন। এই যুদ্ধে তাঁতিয়ার পক্ষে প্রায় তুশো জন নিহত হন।

তবু তাঁতিয়া হতোদ্যম হলেন না। রাও সাহেব ও ফিরোজ শাহকে সঙ্গে নিয়ে ইংরেজদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে অন্যত্র প্রস্থান করলেন।

ইংরেজ কর্তৃপক্ষ চুপ করে রইলেন না। তাঁরা বিদ্রোহীদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন।

প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেল। জয়পুর থেকে ৬৪ মাইল দূরে শিকোর নামে এক জায়গায় ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহীদের সংঘর্ষ হলো।

কিন্তু এই যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতির হাতে বিদ্রোহী নেতারা ধরা পড়লেন না।

এবার তাঁতিয়া অন্যরকম মতলব আঁটতে লাগলেন। তিনি রাও সাহেব ও ফিরোজ শাহকে বললেন, আপনারা যে যার ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরে যাত্রা করুন আর আমিও যাই অন্যদিকে। আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে ইংরেজরা সহজে আমাদের ধরতে পারবে না।

তাঁরা একত্রে বসে মন্ত্রণা করে তাই করলেন। তিনজনে তিন দিকে যাত্রা করলেন।

কিছুদিন কেটে গেল। রাওসাহেব ও ফিরোজ শাহ আবার মিলিত হয়ে মার্চ মাসে সেরঞ্জ-এর জঙ্গলে প্রবেশ করলেন। এখানেও তুর্ধর্ষ ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ হলো বিদ্রোহীদের। তু'পক্ষের বহু লোক হতাহত হলো। তা সত্ত্বেও ইংরেজ বাহিনী বিদ্রোহী নেতাদের পাকড়াও করতে পারলেন না।

সেরঞ্জ-এর যুদ্ধের পর রাওসাহেব ও ফিরোজ শাহ আবার পৃথক হলেন।

ছদ্মবেশে রাওসাহেব চলে গেলেন উজ্জয়িনীতে। তারপর উদয়পুর হয়ে সস্ত্রীক চলে এলেন দিল্লীতে। সেখানেও নিরাপদ নয় ভেবে আবার তিনি চলে যান জম্মুর চেনানি নামে একটি জায়গায়।

চতুর ইংরেজ গোয়েন্দা তাঁকে অনুসরণ করেছিল। তাই একদিন চেনানিতে তিনি ধরা পড়লেন ইংরেজদের হাতে। বিচারে তাঁর ফাঁসির আদেশ হয়। যথাসময়ে তিনি ফাঁসির মঞ্চে নির্ভিক বীর সৈনিকের মত মৃত্যুবরণ করেন।

ওদিকে ফিরোজ শাহ অনেক পরিশ্রম সহ্য করে ছদ্মবেশে কান্দাহার, কাবুল, তেহরান ও ইস্তাম্বুল হয়ে মক্কায় পৌঁছান। বেশ কয়েকবছর পরে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁতিয়া চলে যান মান সিং-এর সঙ্গে পেরনের জঙ্গলে।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল। মান সিং ইংরেজের কাছে আত্ম-সমর্পণ করলেন। তিনি ইংরেজ সেনাপতিকে আশ্বাস দিলেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি যেমন করে পারি আপনাকে তাঁতিয়ার সন্ধান বলে দেবো। তখন আপনি দলবল নিয়ে তাঁকে বন্দী করতে সক্ষম হবেন।

মান সিং-এর কথা শুনে খুশী হলেন ইংরেজ সেনাপতি। শত্রুকে ধরবার জন্য তৈরী হতে লাগলেন।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল। মান সিং-এর পরামর্শমত একজন বুদ্ধিমান নেটিভ অফিসারের নেতৃত্বে বোম্বাই নেটিভ পদাতিক বাহিনীর একদল সিপাইকে জঙ্গলে পাঠিয়ে দিলেন ইংরেজ সেনাপতি মীড।

তারা জঙ্গলের মধ্যে রাত দুটো পর্যন্ত লুকিয়ে রইলো।

তারপর তাঁতিয়া যেখানে দু'জন সঙ্গীর সঙ্গে নিদ্রা যাচ্ছিল মান সিং ইংরেজ সিপাইদের নিয়ে সেখানে এলেন। তিনি তাঁতিয়ার অস্ত্র হস্তগত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সিপাইরা তাঁতিয়াকে বন্দী করলো। পরে তারা তাঁতিয়াকে নিয়ে এলো সেনাপতি মীডের ক্যাম্পে।

সিপ্রি। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল সামরিক আদালতে বিচার হলো তাঁতিযার। বিচারে ইংরেজ হাকিম তাঁতিয়াকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন।

১৮ই এপ্রিল তারিখে তাঁতিয়া বীর সৈনিকের মত ফাঁসির মঞ্চে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে ভারতে সিপাইদের দ্বারা মহাবিদ্রোহেব অবসান ঘটলো।

বিপ্লবী তাঁতিয়া হচ্ছেন সিপাই বিদ্রোহের সর্বশেষ বলি

ব্যর্থতাব মধ্যে দিয়ে বিরাট সিপাই বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটলো। লক্ষাধিক সিপাই এই বিদ্রোহে প্রাণ হারালেন।

বিদ্রোহে পরাজয় বরণ করলেও ভারতীয়গণ মনে মনে ইংরেজ সরকারের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতে লাগলেন। তার পরিণাম স্বরূপ সিপাই বিদ্রোহের আগে ও পরবর্তী ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ছোটখাটো বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল।

১৮৩১-৩২ খৃষ্টাব্দে বাংলায় তিতুমীরের অধীনে কৃষক বিদ্রোহ হয়। পরে তিতুমীরের ফাঁসি হয়।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে ওযাহাবী ও ফরাজী আন্দোলন হয়েছিল।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়। এরপর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে নীল বিদ্রোহ হয়।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কুকা আন্দোলন হয। এই আন্দোলনের পরণতি-স্বরূপ মল্লারকোটলা নামক স্থানে বেশ কয়েকজন পাঞ্জাববাসীকে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর কামানের গোলাতে প্রাণ হারাতে হলো। তাঁরা হচ্ছেন লোহনা সিং, নাথা সিং, শের সিং, শোহেন সিং, সুজন সিং উত্তম সিং এবং ওয়ারজাম সিং।

এছাড়া বাংলাদেশে সন্ন্যাসী বিদ্রোহও ঘটে।

১৮৯৯—১৯০০ খৃষ্টাব্দে বিহারে সাঁওতাল বিদ্রোহও হয়। বিদ্রোহে বহু সাঁওতাল ইংরেজের বন্দুকের গুলিতে প্রাণ বিসর্জন

দেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম পাওয়া গেছে। তাঁরা হচ্ছেন গয়া মুণ্ডা, হরি মুণ্ডা, হাতিরাম মুণ্ডা, বিরসা মুণ্ডা, নরসিং মুণ্ডা, সাণ্ডে মুণ্ডা, সম্ব্রাই মুণ্ডা এবং সিঙ্গড়াই মুণ্ডা।

একমাত্র সিপাই বিদ্রোহ ছাড়া এই সব ছোটখাটো বিদ্রোহগুলিকে ঠিক ঠিক স্বাধীনতা সংগ্রাম নাম দিলে ভুল বলা হবে। এগুলি ছিল সাময়িক কালের জন্যে শাসকগোষ্ঠির অন্যায় ও অসন্তোষজনক কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মাত্র।

একমাত্র সিপাই বিদ্রোহই তখনকার দিনে ছিল প্রথম জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বা গণ সংগ্রাম। ঐ বিদ্রোহে যদি ব্যর্থতা না দেখা দিতো তাহলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থার গতির পরিবর্তন দেখা দিতো।

এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের সিপাই বিদ্রোহের একনিষ্ঠ গবেষক এবং কাহিনীকার প্রমোদ সেনগুপ্ত লিখেছেন: ১৮৫৭—৫৯ সালের মহাবিদ্রোহে ভারতীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ করাটাই হয়েছিল সব থেকে বড় বৈপ্লবিক ঘটনা। জনসাধারণের শ্রেণী-চেতনা তখন যে স্তরেই থাকুক না কেন এমন কি তাদের চেতনা সামন্তযুগের পর্য্যায়ে থাকলেও তারা মহাবিদ্রোহে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদকেই আঘাত করে নি, ভারতের সামন্ত ব্যবস্থার উপরও প্রবলভাবে আঘাত করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ভারত আর মধ্যযুগীয় মোগল ভারত ছিল না। সে তখন অর্থনৈতিক ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার অংশ বিশেষ। সুতরাং ১৮৫৭—৫৯ সালে জাতীয় গণবিদ্রোহ সফল হলে, ভারতের পক্ষে মধ্যযুগে ফিরে যাওয়া সম্ভবপর হত না, কাজেই তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশও ঔপনিবেশিক দেশের মতো হত না বরং একটা স্বাধীন দেশের মতোই প্রগতির পথেই তা দ্রুত অগ্রসর হত।'

স্বনামধন্য ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন: 'সব গলদ থাকা সত্ত্বেও সিপাহীরা ও ভারতীয় বিদ্রোহীরা তাদের সংখ্যার

জোরে ও অনুকূল অবস্থার জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে ধ্বংস করবার উপক্রম করেছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভাগ্য একটা সুতোয় ঝুলছিল এবং তার প্রায় যায়-যায় অবস্থা হয়েছিল। যদি অদৃষ্ট ভারতীয়দের প্রতি সামান্য একটুও অনুকূল হত, তা হলে ফলাফল হয়ত অন্যরকম হত।'

সিপাই বিদ্রোহের বিফলতার পেছনে অনেকগুলি কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে ভারতবাসীদের মধ্যে তখন শিক্ষার প্রচলন বিশেষ হয়নি, বিশেষ করে নানারকম সংস্কারমূলক এবং বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক শিক্ষার। তাদের মন ধর্ম ও জাতিবিভাগের কুসংস্কারপূর্ণ জটিলতার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। তখনকার ভারতবর্ষের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় আকার ধারণ করেছিল। কি রাজনৈতিক, সামাজিক, কিংবা ধর্মনৈতিক সকল ব্যাপারে একটা অস্বস্তিকর ভাব বিরাজ করছিল।

ভারতবর্ষ হচ্ছে ধর্মের দেশ। অথচ ধর্মের নামে এদেশে তখন কুসংস্কারপূর্ণ নানা প্রকার আচার-অনুষ্ঠান সমাজশক্তিকে পঙ্গু করে তুলেছিল—জাতির মেরুদণ্ড শক্তিহীন করে তুলছিল। আর জাতির মেরুদণ্ড দুর্বল হলে বহিঃশত্রুর আক্রমণ ভারতবর্ষের ওপর সহজ সরল আকারে প্রকাশ হয়েছিল। ইংরেজরা বণিকের বেশে এদেশে এসে রাজ্য বিস্তার করে ভারতবাসীদের জীবন এবং তার আনুসঙ্গিক সবকিছু পরাধীনতার বদ্ধ কূপে নিক্ষিপ্ত করতে প্রয়াস পেয়েছিল।

তখন ভারতবর্ষের প্রথম শ্রেষ্ঠতম চিন্তানায়ক রাজা রামমোহন অধঃপতিত ভারতবাসীদের জীবন লক্ষ্য করে ব্যথিত হন। তিনি এর প্রতিকারের উপায় অনুসন্ধান করে ঠিক করলেন, একমাত্র ধর্মের ওপর নির্ভর করে এই এককালের মহান ও ঐতিহ্যময় কৃষ্টিসম্পন্ন জাতির পুনরুত্থান সম্ভবপর। তাই তিনি স্বধর্ম সমন্বয় ঘেঁষা একধর্মের প্রবর্তন করলেন। সে ধর্মের নাম হচ্ছে ব্রাহ্মধর্ম। তাঁর উদ্দেশ্য হলো, হিন্দু, মুসলমান, খৃশ্চান সকলের ঈশ্বর একই। তিনি নিরাকার ব্রহ্ম।

তাঁর কাছে যাবার বিভিন্ন পথ থাকতে পারে। আসলে তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্। সেই একক পূজো করার অধিকার সকলের আছে, সে মুসলমান হোক, খৃশ্চান হোক আর হিন্দু হোক না কেন। এই একক সেবা করার উপায় অবলম্বন করে রাজা রামমোহন ভারতবর্ষের শতধা বিভক্ত খণ্ড জাতি ও উপজাতিগুলিকে একসূত্রে বাঁধবার উপায় বের করলেন। তিনি মনে করলেন, এভাবে ধর্মের একছত্র শুভ্র পতাকাতলে যদি আবালবৃদ্ধ বণিতা এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষ একত্র হয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের আস্বাদন করতে পারে তাহলে ভারতবাসীদের পক্ষে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক সুব্যবস্থা ফিরে আসতে বেশী সময় লাগবে না।

তাই তিনি হিন্দুদের কুসংস্কারপূর্ণ এবং বহু ভাগে বিভক্ত ও কুপথগামী ধর্মমতের মূলে সর্বপ্রথম কুঠারাঘাত করেছিলেন। এ তাঁর বিরাট দূরদৃষ্টি ও অখণ্ড প্রতিভারই অভিনব আবিষ্কার বলতে পারা যায়। তিনি এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করছেন: হিন্দুদের ধর্মপ্রণালী তাদের রাজনৈতিক উন্নতির অনুকূল নয়। জাতিভেদ ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ—তাঁদেরকে স্বদেশানুরাগে বঞ্চিত করেছেন। এ ছাড়া বহুসংখ্যক বাহ্য অনুষ্ঠান ও প্রায়শ্চিত্তের বহুপ্রকার ব্যবস্থা থাকাতে তাঁদেরকে কোন গুরুতর কার্যসাধনে সম্পূর্ণ অশক্ত করেছে। আমার বিবেচনায় তাঁদের ধর্মের কোন পরিবর্তন হওয়া দরকার। অন্ততঃ তাঁদের রাজনৈতিক সুবিধে ও সামাজিক সুখস্বাচ্ছন্দের জন্যেও ধর্মের পরিবর্তন আবশ্যক।

ধর্মের প্রকৃত রূপ, আদর্শ শিক্ষা এবং আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য এইসব জিনিষের প্রতি :আমাদের আকর্ষণ অনেক কমে গিয়েছিল। একতাবোধ একেবারেই ছিল না। অথচ একতাবোধ না হলে কোন গঠনমূলক বৃহত্তর কাজই সফল হতে পারে না। আর এই একতাবোধ আসতে পারে ধর্মের মাধ্যমে—উপযুক্ত শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে। রাজা রামমোহন তাঁর মহান প্রতিভাবলে এই সত্য উপলব্ধি

করেছিলেন। তাঁর আগে এই ভারতবর্ষে শ্রীকৃষ্ণ, গৌতম বুদ্ধ এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ধর্মের মাধ্যমে ভারতীয় মহান জাতিকে একতাবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং তারা এই কাজে কিছুটা যে সফলকাম হয়েছিলেন ইতিহাস তার সাক্ষী দিচ্ছে।

রামমোহনের পরবর্তী যুগে দেবেন্দ্রনাথ 'কেশব সেন' রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সময় রামমোহনের স্বপ্ন ও আশা অনেকখানি এগিয়ে গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ তার অপরূপ ও অভূতপূর্ব সমন্বয় সাধনার বলে ঘোষণা করলেন, 'যত মত তত পথ'। তার এই একটি কথার মধ্যে সকল ধর্মের মানুষদের মধ্যে সমস্ত রকম বিবাদ-বিসম্বাদ মিটে যেতে পারে। তার যোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ তারই মহান আদর্শ সারা বিশ্বে প্রচার করলেন এবং বললেন এক ব্রহ্মই রয়েছেন সকল জীবের অন্তরে। সুতরাং এই ব্রহ্মরূপী জীবকে সেবা করলে—শিবরূপী জীবকে পূজা করলে প্রকারান্তরে সেই একেশ্বর ব্রহ্মকেই সেবা করা হয়। তিনি মুক্ত কণ্ঠে বললেন।

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে রামমোহন ভারতবর্ষে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এবং তার সূত্রপাত করেছিলেন পরবর্তীকালে অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের যুগে তা পত্রে-পুষ্পে ফলে পরিণতি লাভ করলো। উনবিংশ শতাব্দীর শেষকালে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও কর্ম দেশের আবালবৃদ্ধ বনিতাকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্দীপ্ত করেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে পরাধীন ভারতবর্ষের দীর্ঘকালব্যাপী নিদ্রা ও তামসিক ঘোর নষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ভারতবাসীকে আহ্বান জানিয়ে বললেন: 'হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে

তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয় সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয়, ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত, ভুলিও না—তোমার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিনরাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'

এর তুলনায় আরও শক্তিশালী জাগরণী মন্ত্র আর কে শুনিয়েছেন ভারতবাসীদের কানে?

স্বামীজীর এই আহ্বান ব্যর্থ হয়নি। পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধীকে দেখেছি স্বামীজীর বাণীর মহাবিস্ময়কর প্রতীকরূপে। তিনি 'কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া' সমগ্র ভারতবাসীর মনে-প্রাণে দেশসেবার —দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে নবশক্তি সঞ্চার করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ৬ষ্ঠ দশক হতে ভারতবর্ষে রেনেসাঁর যুগ আরম্ভ হয়েছিল। সাহিত্য, দর্শন, কাব্য, বিজ্ঞজ্ঞান, ধর্ম প্রভৃতি বিভাগে এক এক বিরাট দিকপাল মনিষীর আবির্ভাব ঘটেছিল। বিশেষ করে সাহিত্যই হচ্ছে জাতির মূল শক্তি। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, রমেশ চন্দ্র দত্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কবি ও সাহিত্যিকগণ সাহিত্যের মাধ্যমে

দেশবাসীদের মনে নতুন চেতনা এনে দিলেন। যার জন্যে দেশবাসীরা নব উদ্যমে দেশের সেবা করবার জন্যে তৎপর হয়ে উঠলো।

ইংরেজ শাসকসম্প্রদায় যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে ভারতবর্ষের শাসনভার পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করলেন তখন থেকে এদেশে ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার আলো আসতে লাগলো। সেই আলোতে এ দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নতুন এক জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হলো। সিপাই বিদ্রোহের সময় এদেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ছিল বটে কিন্তু তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে—সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে ছিল। ব্যাপকভাবে প্রসারিত হতে পারেনি। তাই তখনকার মধ্যবিত্ত সমাজ সিপাই বিদ্রোহের গুরুত্বকে ভাল মনে নিতে পারেনি। তারা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও উদাসীন ছিল। তারা এভাবে না থেকে যদি সিপাইদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারতো তাহলে হয়তো ভারতবর্ষ অনেক আগে স্বাধীনতার স্বাদ পেত।

কিন্তু তা সম্ভব হলো না। তার একমাত্র কারণ হলো শিক্ষার অভাব।

পরবর্তীকালে ভারতবাসীরা ইংরেজ শাসকদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষালয়ে অধ্যয়ন করে এবং স্বাধীনচেতা ইংরেজের কাছ থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা পেয়ে স্বদেশের মুক্তির জন্যে তৎপর হলো।

রাজা রামমোহনের সময় থেকেই এ দেশে রাজনৈতিক ও সমাজ-সংস্কারের প্রচেষ্টা করবার জন্যে শিক্ষিত মহলে সাড়া পড়ে যায়।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হলো। এই এসোসিয়েশন কয়েকজন ধনী মানুষদের বুদ্ধি ও মতামতের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে তাকিয়ে দেশের স্বার্থের নামে ইংরেজ শাসকদের কাছ থেকে কিছু সুযোগ-সুবিধা নেওয়ার তালে থাকতেন।

ফলে এর স্থায়িত্বও বেশীদিন হলো না। ক্রমশ এর শক্তি কমে আসে।

তখন দেশের বুদ্ধিজীবী মানুষ অনেক ভেবে চিন্তে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে একটি নতুন এসোসিয়েশন গঠন করলেন। তার নাম হলো ইন্‌ডিয়ান এসোসিয়েশান বা ভারতসভা। এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতায়। এই সভাই সর্বপ্রথম দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে।

কলকাতার শিক্ষিত যুবকরা এই এসোসিয়েশন মারফৎ এক সম্মেলন আহ্বান করলেন। এ্যালবার্ট হলে তিন দিন ব্যাপী এই সভার অধিবেশন হয়। এই সভার উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঠিক একই সময়ে ভারতবর্ষের তদানীন্তন সরকারী ও বেসরকারী মানুষ নিখিল ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠন করার পরিকল্পনা করছিলেন।

মিঃ এ, ও, হিউম ইংরেজ অফিসার হলেও ভারতীয়দের কল্যাণের প্রতি তাঁর মনোযোগ ছিল অসীম। প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে তিনিই ভারতীয়দের মন থেকে পরাধীনতার গ্লানি দূর করে স্বাধীনতার নতুন চেতনা নিয়ে আসতে সক্ষম হন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সিভিল সার্ভিস হতে অবসর নেন। সেই সময় তিনি ভাবতে লাগলেন একটি পরিকল্পনার বিষয় যার দ্বারা ভারতীয়দের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিকভাবে দেশের কল্যাণকর কাজ করা যায়। এই উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ন্যাশনাল লীগ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

তখনকার দিনে কলকাতার প্রভাবশালী এবং ধনী ব্যক্তি পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর পরিবারের মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই লীগের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

এই লীগের উদ্দেশ্য ছিল তিন রকম। প্রথমত, ভারতের বিচিত্র

জাতিকে একটি অখণ্ড জাতিতে সম্মিলিত করা। দ্বিতীয়ত, দেশের সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ের উন্নতি সাধন। তৃতীয়ত, ভারতীয় ক্ষতিকর আইনের সংশোধন ও ব্রিটিশের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন।

এর কয়েক বছর পরে কংগ্রেসের গঠনকালে হিউম ঠিক এইরকম পরিকল্পনা পেশ করেন। তিনি দেখলেন যে ভারতীয় শিক্ষিত সমাজ ও ইংরেজ শাসকদের মধ্যে বোঝাপড়ার জন্যে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান দরকার। এই প্রতিষ্ঠানের অধিবেশন হবে প্রতি বছর কোন একটি সময়ে। সেই অধিবেশনে শিক্ষিত সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ একত্র হয়ে দেশের সমাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করবে। এমন কি প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে ছোট প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠা দরকার।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ। হিউম তৎকালীন বড়লাট লর্ড ডাফরিনের সঙ্গে দেখা করে এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেন।

তাঁর কথা ও পরিকল্পনা শুনে ডাফরিন বললেন, বিলেতে যেমন একদল মানুষ মন্ত্রী হয়ে দেশ শাসন করেন আর একদল প্রতিপক্ষরূপে সরকারের কাজের ও মতবাদের সমালোচনা করেন ভারতে তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। এ দেশের সংবাদ পত্রগুলির অবস্থা এরকম নয় যে তাতে করে জনমতের স্বরূপ ঠিকমত বুঝতে পারা যায়। সুতরাং এই অবস্থায় ভারতীয় রাজনীতিকরা যদি বছর বছর একত্র হয়ে দেশের মঙ্গলামঙ্গলের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন তাহলে শাসকগোষ্ঠীর বিশেষ উপকার হবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ভারতীয় জাতীয় সমিতি গঠন এবং তার কার্য্যাবলীর প্রতি তদানীন্তন ইংরেজ শাসকদের পূর্ণ সমর্থন ছিল যদিও পরে আর তা রইলো না যখন এই সমিতি ইংরেজ-শাসকদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো তাদের কতরকম কুশাসন ভারতবাসীদের ওপর চাপানো হয়েছে।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ। ডিসেম্বর মাস। বড়দিন। ভারতের জাতীয়

মহাসমিতির প্রথম অধিবেশন বসলো পুনাতে। এই সভায় সভাপতি হলেন কলকাতার ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় যে সকল প্রস্তাব পাশ করা হলো তাতে রাজভক্তি ও রাজানুগত্যের কথার সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা দূরীকরণের কথাও ছিল। কিন্তু তখন ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করা হয়নি।

এরপর ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় কলকাতায়। তার সভাপতি হন দাদাভাই নৌরজী।

কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন বসে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে।

এই তিনটি রাজনৈতিক অধিবেশনে যেসব প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, নেতারা যেসব বক্তৃতা দেন তার ফলে ইংরেজ কর্তাদের মনে অসন্তোষ-বহ্নি ধূমায়িত হতে লাগলো।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ। এই বছরে এলাহাবাদে কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশনে সরকার পক্ষ হতে কোনরকম সহানুভূতি ও সহযোগিতা পাওয়া গেল না।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ) তৎকালীন ছোটলাট অক্ল্যাণ্ড কল্‌ভিন কংগ্রেস ও হিউমের বিরুদ্ধতা আরম্ভ করলেন।

হিউম তার উত্তরে লিখলেন, 'আমাদের কর্ম দোষের জন্যে ভারতবর্ষে যে ভীষণ শক্তি মাথা নাড়া দিয়ে ওঠবার উপক্রম হচ্ছে তা থেকে রক্ষা পাবার জন্যে একটা নিরাপদ প্রতিষ্ঠানের দরকার হয়ে পড়েছিল। কংগ্রেসের চাইতেও কোন নিরাপদ প্রতিষ্ঠানের কল্পনা করাও অসম্ভব।

ঠিক এই সময় হতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পার্থক্যের সূত্রপাত হয়। এই ব্যাপারে স্যার সৈয়দ আহমদ হলেন প্রথম ব্যক্তি। তিনি কংগ্রেসের শুরু হতেই তার বিরোধিতা করে আসছিলেন। তিনি মুসলমানদের পরামর্শ দিতে লাগলেন যাতে তারা কংগ্রেস হতে দূরে থাকে।

আসল কথা দ্বিজাতিতত্ত্বের বীজ ভারতের মাটিতে সেদিনই প্রথম

রোপিত হয়েছিল যার বিষয় ফল আমরা পাই ১৯০৫ এবং ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে।

সেদিন লর্ড :ডাফরিন বললেন, 'ভারতে হিন্দু ও মুসলমান স্বতন্ত্র জাতি।'

স্যার সৈয়দও বললেন, "Is it possible that under these circumstances two nations—the Muhammedan and Hindu could sit on the same throne and remain equal in power ? most certainly not—"

সৈয়দ সাহেব এই বক্তৃতা দেন ১৮৮৭-৮৮ খৃষ্টাব্দে যখন কংগ্রেস সকল জাতির মধ্যে মিলনের স্বপ্ন দেখছিল।

লর্ড ডাফরিন ঠাট্টার সুরে একবার বললেন, কংগ্রেসের সদস্য-সংখ্যা অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখতে হয়।

যাই হোক তখনকার দিনে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে সরকার পক্ষের বড় থেকে ছোট সকল শ্রেণীর মানুষ হেয়জ্ঞান করতে লাগলো।

এমনিভাবে কেটে গেল দশটি বছর।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ। এখন থেকে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে নতুন চেতনার সঞ্চার হলো। কারণ এর মধ্যে অনেক ভারতবাসী পাশ্চাত্ত শিক্ষা গ্রহণ করেছে। তার ফলে তারা বুঝতে পেরেছে ইংরেজ রাজপুরুষ, সাধারণ ইংরেজ-ব্যবসায়ী এবং সাধাবণ ইংরেজ নাগরিকরা ভারতবাসীদের প্রতি কিরকম দুর্ব্যবহার করে থাকে।

কংগ্রেস বড় বড় শহরে তিন দিনের জন্যে মিলিত হয়ে অনেক কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করতো। তাদের সামনে তখন দেশের দৃঢ়তর স্বার্থের কথা জেগে উঠতো। তাদের কাছে তখন প্রাদেশিক স্বার্থ বা সমস্যা স্থান পেত না। অথচ প্রাদেশিক স্বার্থকে একেবারে অবহেলা করা যায় না। কারণ প্রদেশ নিয়েই তো এই বিরাট দেশ।

এইসব ভেবেচিন্তে বাংলার নেতারা বাঙালীদের জন্যে একটা রাজনৈতিক সমিতি স্থাপন করলেন। এর নাম দেওয়া হলো 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি'।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় এর প্রথম অধিবেশন হয়। তারপর ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে এই সভার কাজ চলে।

এই প্রাদেশিক সমিতি ভারতীয় কংগ্রেসের এক ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র। কালে এটি প্রাদেশিক কংগ্রেস নামে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে জনপ্রতিনিধিত্ব করে।

বাংলা দেশের মত মহারাষ্ট্রেও রাজনীতিকে দেশব্যাপী প্রচার করার আয়োজন চলতে থাকে। সেখানে মহামান্য বালগঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে 'গণপতি পূজা' 'সার্বজনিক পূজার' রূপ নেয়। এই 'গণপতি' শব্দের দুরকম অর্থ করা হয়। লৌকিক গণেশের মূর্তি পূজা ছাড়া এর অন্য অর্থ হচ্ছে যিনি 'গণ'-এর 'পতি' বা 'ঈশ' অর্থাৎ জনগণ বিধায়ক।

দশদিন ধরে এই উৎসব চললো। এবং এই উৎসবকে কেন্দ্র করে জনতার মনে মহারাষ্ট্রের প্রাচীন কৃষ্টি ও বীরত্ব-গাথার প্রচার করা হয়। বীর শিবাজীর কার্যকলাপ স্মরণ করা হয়। এভাবে মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে হিন্দু সর্বস্ব জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করা হয়।

এর কিছুকাল আগে অর্থাৎ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে পুনাতে গো-বধ-নিবারণী সভা স্থাপিত হলো। এর ফলে জাতীয়তাবাদের গণ্ডী ছোট হয়ে যায়। গো-হত্যা নিষেধ করার ফলে মুসলমান সম্প্রদায়ের মন হিন্দুবিদ্বেষী হয়ে ওঠে। কালে এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে ফাটল ধরতে থাকে।

গো-মাতাকে কেন্দ্র করে বোম্বাই ও বিহারে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়। ইংরেজ সরকার এই দাঙ্গা দেখে বিচলিত হলেন না। কারণ তাঁরা বুঝলেন, এই হাঙ্গামা জিইয়ে রাখতে পারলে হিন্দু-মুসল-

মানের মধ্যে মিলন হবে সুদূর পরাহত। তার ফলে ভারতে ইংরেজ রাজত্বের ভিত সহজে কেউ টলাতে পারবে না।

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-এর জন্যে মহারাষ্ট্রীয়দের গো-বধ-নিবারণী সভা স্থাপন ও উগ্র হিন্দুত্ব অভিমান খানিকটা দায়ী।

এরপর আছে ধর্মবোধের পক্ষে রাজনৈতিক চেতনা যুক্ত করে' 'শিবাজী উৎসবের' প্রচলন। তিলকের চেষ্টায় শিবাজীর ভগ্ন 'ভবানী মন্দিরের' সংস্কার করা হয়।

শিবাজী ভারতে ধর্মরাজ্য স্থাপনের আশা নিয়ে ক্ষাত্রবলের সাহায্য নেন। এই কথা মহারাষ্ট্রীয়দের মনে জাগিয়ে তোলার জন্যেই শিবাজী উৎসবের আয়োজন করা হয়।

মোটকথা তখন মহারাষ্ট্রে শিবাজীর নামে গোঁড়া হিন্দুদের মধ্যে ধর্মকেন্দ্রীক জাতীয়তাবোধ মাথা তুলে দাঁড়াল। ফলে অন্য ধর্মের মানুষদের মনে অসন্তোষ দেখা দিল।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ। ডিসেম্বর মাস। পুনায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ হলেন এর সভাপতি।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রাও বাহাদুর ভিড়ে বললেন, আমরা প্রথমে ভারতবাসী,' পরে হিন্দু-মুসলমান, পার্শি-খ্রীষ্টান, পাঞ্জাবী-মারাঠী, বাঙালী-মাদ্রাজী।

উপস্থিত মুসলমানগণ এই কথা আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করলো না। কারণ দাদাভাই নৌরজী আগেই একথা উচ্চারণ করেছিলেন।

তাছাড়া দু'বছর আগে পুনায় গো-বধ-নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দুরা গো হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন করে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হয়েছিল। ফলে ভারতে অখণ্ড জাতীয়তা-বোধের ভাঙন ঘটে।

তিলকের এই আন্দোলনে ভারতীয় কংগ্রেসের পূর্ণ সমর্থন ছিল না। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বোম্বাই-এর রহিমতুল্লা মহম্মদ সিয়ানী।

সিয়ানী তাঁর ভাষণে মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদানের সতেরো দফা আপত্তির প্রত্যেকটি নাকচ করে দিয়ে বললেন, কংগ্রেস মুসলমানদেরও প্রতিষ্ঠান।

পুনা শহরের রাজনৈতিক হাওয়া অন্যদিকে বইতে আরম্ভ করলো ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে। এই সময় পুনাতে দুরারোগ্য প্লেগের আবির্ভাব হয়। তিলক তাঁর অনুচরদের নিয়ে রোগগ্রস্ত জনতার সেবা করতে লাগলেন। ফলে তিনিও তাঁর অনুচরগণ জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন।

পুনার প্লেগ অফিসার ছিলেন মিঃ র‍্যানড্। তাঁর দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল জনগণ। তাই তিলকের অনুবর্তী দু'জন যুবক চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় মিঃ র‍্যানড্‌কে গুলি করে হত্যা করে। আর একজন ইংরেজ অফিসারও গুলিবিদ্ধ হন। তাঁর নাম লেফটেনান্ট আয়ার্স্ট।

এই চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে একজনের নাম বাসুদেব চাপেকার আর অন্যজনের নাম দামোদর চাপেকার।

এঁরা ইংরেজের হাতে বন্দী হন। বিচারে ফাঁসির আদেশ হয়। পুনার যারবেদা জেলের ফাঁসির মঞ্চে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল তারিখে দামোদর চাপেকার আত্মাহুতি দেন। পরে বাসুদেব চাপেকার ঐ একই জেলে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে তারিখে দামোদরের পথ অবলম্বন করে বীর শহীদ আখ্যা লাভ করেন।

এই দু'জন মারাঠি যুবক ছাড়াও আরও দু'জন মারাঠি যুবকের এই একই ব্যাপারে ফাঁসির আদেশ হয়। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম হচ্ছে রানাডে মহাদেও আর অন্যজনের নাম বালকৃষ্ণ চাপেকার। এঁদের ফাঁসি হয় ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে তারিখে।

শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠান এবং 'কেশরী' পত্রিকায় শিবাজী প্রসঙ্গে প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার অল্প দিন পরে পুনায় হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তিলককে পরোক্ষ ভাবে জড়িত থাকার সন্দেহে ইংরেজ সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করলেন।

জনপ্রিয় নেতা তিলকের বিচার হলো ইংরেজের আদালতে। বিচারে তিলক ১৮ মাসের জন্য কারাদণ্ড লাভ করলেন।

এই রায়ের বিরুদ্ধে তিনি লণ্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করলেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হলো না।

তিলকই স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর যোদ্ধা যিনি নাকি প্রথম কারাবরণ করেন।

তিলকের কারাবরণের কথা শুনে মহারাষ্ট্রবাসীগণ ইংরেজ শাসকদের ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। এমন কি বাংলা দেশ থেকেও এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও প্রতিবাদধ্বনি প্রকাশ পায়। তিলকের মামলা চালাবার জন্যে বাংলা দেশ হতে অর্থ সংগৃহীত হলো।

ইংরেজ সরকার ভেবেছিলেন যে তিলকের মত নেতাকে শাস্তি দিলে ভারতবাসীদের মন থেকে জাতীয়তাবোধ এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাপ নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। তারা ইংরেজ রাজমুকুটের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে তার অধীনে নিশ্চিন্তভাবে জীবনযাত্রা চালিয়ে যাবে।

কিন্তু হায়, তাঁদের সে আশা নিস্ফল হলো। তিলকের প্রতি ইংরেজ সরকারের এরূপ ব্যবহারে ভারতবাসীরা মনের ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলো নানাভাবে। সরকারের বিচার পদ্ধতিকে জনগণ আর শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারলো না। কারণ তিলকের বিচারের সময় ৯জন জুরির মধ্যে ৬ জন সাহেব জুরি তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করলেন আর তিন জন দেশীয় জুরি তাঁকে নির্দোষ বললেন। এর ফলে জনচিত্ত হতে ইংরেজ আদালতের প্রতি শ্রদ্ধা পূর্বাপেক্ষা অনেকাংশে হ্রাস পেল।

এরপর থেকে ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি নতুন পথে পরিবর্তিত হতে আরম্ভ করলো। একদিকে ভারতীয়দের পক্ষ থেকে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে নানাভাবে আন্দোলনের বীজ রোপিত হতে লাগলো অন্য দিকে সরকারের পক্ষ থেকে ঐ বীজ উৎপাটিত

করার জন্যে নিত্য-নতুন কলাকৌশল আবিষ্কৃত হয়ে জনগণের ওপর সেগুলির প্রয়োগ চলতে লাগলো।

ভারতে জাতীয় আন্দোলনের আসল রূপ প্রকাশ পেল ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জনের আমলে। তিনি একাধারে ছিলেন ভারতের কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাশীল আবার ভারতীয়দের স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘোরতর বিরোধী। ভারতবাসীদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা বা ভালবাসা আদৌ ছিল না। অথচ ভারতের প্রাচীন কীর্তি-কলাপ সংরক্ষণের জন্যে তিনি এক নতুন আইন প্রবর্তন করলেন। তাঁর চরিত্রে ছিল অদ্ভুত কয়েকটি পরস্পর বিরোধী গুণের সমন্বয়।

ভারতবাসীদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ থেকে ভারতীয় মন স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্যে আরও প্রগতিশীল হয়ে উঠলো।

লর্ড কার্জন ভারতে বড়লাট হয়ে আসার এক বছর পর মহারাণী ভিক্টোরিয়া মারা যান। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে আগ্রার তাজমহলের অনুকরণে কলকাতায় একটি স্মৃতিশৌধ গড়ে ওঠে। লর্ড কার্জন এই স্মৃতিশৌধ নির্মাণের কাজে ছিলেন প্রধানতম উদ্যোক্তা। তিনি আগ্রহভরে তদানীন্তনকালের দেশীয় নৃপতিদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে এই শৌধ নির্মাণ করান। তারপর তিনি নতুন ভারত সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের অনুপস্থিতিতে দিল্লীতে অভিষেকের বিরাট দরবার আহ্বান করে নিজেই রাজসম্মান গ্রহণ করেন সম্রাটের প্রতিভূরূপে।

কার্জনের দিল্লী দরবার উপলক্ষ্যে শিক্ষিত ভারতবাসীগণ নানাভাবে বক্র সমালোচনা করলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 'অত্যুক্তি' নামক প্রবন্ধে লিখলেন : 'আমাদের বিদেশী কর্তারা ঠিক করিয়া বসিয়া আছেন যে, প্রাচ্য হৃদয় আড়ম্বরেই ভোলে, এই জন্য ত্রিশ কোটি অপদার্থকে অভিভূত করিতে দিল্লীর দরবার নামক একটি সুবিশাল অত্যুক্তি বহু চিন্তার চেষ্টায় ও হিসাবের বহুরূপ কষাকষি দ্বারা খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন দয়াহীন, দানহীন দরবার ঔদার্য হইতে উৎসারিত নহে, তাহা প্রাচুর্য হইতে উদ্বেলিত হয় নাই।'

তিনি আরও লিখলেন : 'এ দিকে আমাদের প্রতি সিকি পয়সার বিশ্বাস ইংরেজের মনের মধ্যে নাই ; এত বড় দেশটা সমস্ত নিঃশেষে নিরস্ত্র অথচ জগতের কাছে সাম্রাজ্যের বল প্রমাণ উপলক্ষ্যেও আমাদের অটল ভক্তি রটাইবার বেলা আমরা আছি।'

নানাভাবে বাংলা দেশে জাতীয়তাবোধ আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো।

বাংলাদেশে বিপ্লববাদ প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেন রাজনারায়ণ বসু। মাঝখানে ক' বছর কংগ্রেসের সাংবিধানিক আন্দোলনের ফলে এই বিপ্লবভাব প্রসারিত হতে পারেনি। পরে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ঐ ভাব আবার মাথা চাড়া দেয়। তখনকার দিনের সংবাদ পত্রগুলি বিপ্লববাদের পক্ষে জ্বালাময়ী লেখনী ধারণ করে নিত্যনূতন প্রবন্ধ প্রকাশ করতে লাগলো।

এইসব দেখে ইংরেজ সরকার রীতিমত ভয় পেলেন। তাঁরা দেখলেন হিন্দু ও মুসলমান দুটি পৃথক জাতি ঠিক কথা কিন্তু দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজ এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষ মিলিতভাবে করে। আর এরাই যদি এরকম ভাবে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে তাহলে এদেশে ইংরেজ রাজত্বের স্থায়িত্ব আর বেশী দিনের হবে না।

তাঁরা আরও লক্ষ্য করলেন, ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশ হচ্ছে স্বাধীনতা সংগ্রামে আন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অধিকতর সচেতন। তাই এই বাংলা দেশকে দমন করবার জন্যে—তার স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করবার জন্যে ইংরেজ সরকার স্থির করলেন দ্বিজাতিতত্ত্বকে কেন্দ্র করে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করলে তবে তাঁরা স্বস্তিতে রাজত্ব করতে পারবেন।

এই উদ্দেশ্যে তাঁরা স্থির করলেন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক কলহের সৃষ্টি করে বঙ্গভঙ্গ করতে পারলে তাঁদের লাভ বই লোকসান হবে না।

বড়লাট লর্ড কার্জন নিজে মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল পূর্ববাংলার রাজধানী ঢাকায় গিয়ে সেখানকার নবাব ও স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী মুসলমানদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালালেন যাতে তাঁর পরিকল্পনা মত মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ দ্বিজাতিতত্ত্ব মেনে নিয়ে হিন্দুদের থেকে আলাদা হয়ে বাস করবার জন্যে দেশবিভাগ মেনে নেয়।

কিন্তু পরবর্তীকালে লর্ড কার্জনের সে আশা সফল হলো না। তখন মুষ্টিমেয় মুসলমান ইংরেজের এইপ্রকার মতের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও অধিকাংশ সাধারণ মুসলমান ছিল দেশবিভাগের ঘোরতর বিরোধী। তা সত্বেও ইংরেজ সরকার অখণ্ড জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ বাঙালীদের ওপর দেশবিভাগের অভিশপ্ত খড়্গ উত্তোলন করলেন। তারা কংগ্রেসের প্রতিবাদ শুনলেন না।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দ। ১৬ই অক্টোবর। এই দিনটি বাংলা দেশের পক্ষে এক অভিশপ্ত দিন। ইংরেজ সরকারের কালা কানুন বলে অখণ্ড বঙ্গদেশ দ্বিধা বিভক্ত হলো।

তখনকার দিনের বাংলাদেশ এখনকার মত ছিল না। তখনকার বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গ বা পূর্ববাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান উড়িষ্যা ও বিহার—এইসব দেশগুলিকে বোঝাতো। এই বিশাল প্রদেশের জন্য একজন ছিলেন ছোটলাট। তিনি রাজধানী কলকাতাতে থাকতেন।

বঙ্গব্যবচ্ছেদ ব্যবস্থায় আসাম প্রদেশের সঙ্গে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগ যুক্ত করে 'পূর্ববঙ্গ-আসাম' নামে নতুন প্রদেশ গঠিত হলো। ঢাকা হলো রাজধানী। প্রেসিডেন্সি বিভাগ ও বর্ধমান বিভাগ এবং বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে বঙ্গদেশ রইলো। কলকাতা হলো এই বঙ্গের রাজধানী।

যেদিন বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের কথা ঘোষণা করা হলো সেদিন এদেশে আবাল বৃদ্ধবনিতার মন হর্ষে-বিষাদে পূর্ণ হয়ে উঠলো। দেশবিভাগ-জনিত দুঃখ যেমন তাদের মনে পীড়া দিতে লাগলো তেমনি অন্যদিকে ইংরেজ সরকারের এই প্রকার দমননীতির জন্য আগামী দিনের

স্বাধীনতার আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে উঠবে বলে তারা বিশ্বাস করলো।

দেশবিভাগের দিন সকলে অরন্ধনব্রত পালন করলো। বহু লোক গঙ্গাস্নান ও রাখীবন্ধন করে প্রতিজ্ঞা করলো যেমন করে হোক ইংরেজদের এই প্রকার দমননীতি রুখতে হবে, বঙ্গব্যবচ্ছেদ রোধ করতে হবে।

দেশবিভাগের ফলে শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে স্বদেশী আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠলো। দেশের মানুষ স্থির করলো ইংরেজ সরকারকে জব্দ করতে হলে বিদেশী দ্রব্য বর্জনের আন্দোলনে যোগ দিতে হবে।

প্রত্যেকে বিশেষ করে দেশের ছাত্রসমাজ এই বয়কট আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলো। তারা বিলাতি দ্রব্য নষ্ট করলো। বিলাতি কাপড় এক জায়গায় একত্র করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলো।

দেশের অধিকাংশ মানুষ বিলাতি পোষাক-পরিচ্ছদ ত্যাগ করে স্বদেশী মোটা কাপড় পরতে লাগলো।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দ। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কাপড়ের কল—বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্ স্থাপিত হলো। এই মিল প্রতিষ্ঠা করেন মধ্যবিত্ত বাঙালী সম্প্রদায়।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথায় লিখলেন, 'মোটা বসন অঙ্গে নেবো, মোটা ভূষণ আভরণ করবো।'

কান্তকবি রজনীকান্ত সেন লিখলেন, 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই।'

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'পরের ঘরে কিনব না আর ভূষণ বলে গলার ফাঁসি।'

এভাবে দেশের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লো। তরুণ ও প্রাচীন উভয় সম্প্রদায়ের নেতা এই আন্দোলনে অংশ নেন। তরুণদের মধ্যে ছিলেন রমাকান্ত রায় ও শচীন্দ্র প্রসাদ

বসু আর প্রবীণদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রভৃতি।

আগে অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম ভাগে নবীন-প্রবীন সকলেই একসঙ্গে কংগ্রেসের পতাকাতলে এসে কাজ করছিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বরিশালে প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশনের পর হতে কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙন ধরে। দুই দলের সৃষ্টি হলো—একদল চরমপন্থী অন্য দল নরমপন্থী। চরমপন্থীরা চাইল বিপ্লবের পথে স্বাধীনতা লাভ করতে আর নরমপন্থীদের মত হলো ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এবং তাঁদের সঙ্গে শাসনকার্যে সহযোগিতার দ্বারা স্বাধীনতা লাভের পথ সুগম করা।

যাদবপুরে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো। অরবিন্দ বরোদার মোটা মাইনের চাকরী ছেড়ে দিয়ে সামান্য বেতন নিয়ে ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে রাজী হলেন। বরোদায় থাকার সময় তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা মন-প্রাণ দিয়ে চিন্তা করতেন। তাঁর আদর্শ ছিল স্বামী বিবেকানন্দ এবং সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি শিবাজীর ভবানী মন্দিরের অনুকরণে বাংলা দেশে ভবানী মন্দির প্রতিষ্ঠা করে স্বদেশকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করবার প্রথা প্রচলন করতে চেষ্টা করলেন এবং এই মায়ের পরাধীনতার হাত হতে যত দিন না মুক্তি হচ্ছে ততদিন স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়ে যাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। তিনি শিক্ষকতার কর্ম নিয়ে বাংলা দেশে এলেও অন্তরে অন্তরে স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপ্ন দেখছিলেন এবং তিনি স্থির করলেন এই সংগ্রামকে কেবলমাত্র নরমপন্থীদের অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বিপ্লবের আঙিনায় প্রসারিত করবেন।

তাঁর উদ্দেশ্য সফল হলো। তিনি রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকেও মিলিয়ে দিলেন। ভারতকে তিনি নিছক একটি দেশ বলে ভাবতে পারলেন না। তাকে তিনি জীবন্ত রূপে—মাতৃরূপে দেখতে লাগলেন এবং এই মায়ের মুক্তির জন্যে আমৃত্যু পণ করলেন।

দেশের জনগণের মনে স্বাধীনতা আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে প্রয়োজন হয় পত্র-পত্রিকার। এই উদ্দেশ্যে অরবিন্দ প্রতিষ্ঠিত করলেন 'বন্দেমাতরম্' নামে একটি পত্রিকা। এই পত্রিকা হলো চরমপন্থী দলের মুখপত্র। শিক্ষিত বাঙালী মাত্রই এই পত্রিকা পাঠ করতে লাগলেন।

'বন্দেমাতরম্' প্রতিষ্ঠার পর আর একটি কাগজ আত্মপ্রকাশ করলো। তার নাম যুগান্তর। অরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, দেবব্রত বসু, অবিনাশ ভট্টাচার্য প্রভৃতি ছিলেন এই কাগজ প্রকাশ করার মূলে। এইভাবে এই দুই পত্রিকার মারফৎ বাংলা দেশে তখন থেকে সক্রিয়ভাবে বিপ্লববাদ এবং সন্ত্রাসবাদের প্রচার শুরু হয়।

'বন্দেমাতরম্' ও 'যুগান্তর' পত্রিকার আবির্ভাবের পর বেশ কয়েক মাস কেটে গেল। তারপর বাংলা দেশে আর একটি কাগজ প্রকাশিত হলো। তার নাম 'সন্ধ্যা'। এই পত্রিকার সম্পাদক হলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এবং এই পত্রিকার মাধ্যমে এদেশে নব জাগরণের বাণী প্রচারিত হতে লাগলো।

এই প্রসঙ্গে এ-কথা বলা অশোভন হবে না যে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে 'মুসলিম্ লীগ' প্রতিষ্ঠিত হলো ঢাকা শহরে। এখন থেকে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন ত্রিধারায় প্রবাহিত হতে লাগলো— কংগ্রেসী সর্বভারতীয়তা, তথাকথিত জাতীয়তাবাদীদের হিন্দুসর্বস্বতা এবং মুসলমানদের ইসলাম-সর্বস্বতা। রাজনীতিতে ধর্ম এসে একদিকে যেমন জাতীয় আন্দোলনকে জোরদার করতে সমর্থ হয়েছিল তেমনি এর সুদূরপ্রসারী ফল ও হলো অত্যন্ত তিক্ত এবং শোকাবহ। কারণ এর দ্বারা দেশ দ্বিধাবিভক্ত হয়।

এই সকল আন্দোলনের পেছনে বিপ্লবীদের কাজ সমানতালে চলতে লাগলো।

বাংলাদেশে জাতীয় আন্দোলন নানা ভাবে চলতে লাগলো। তিলক খাপার্দে, মুঞ্জে প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় বীর নেতাগণ কলকাতা সফর করে গেলেন। এর সঙ্গে শিবাজী উৎসব, ভবানী পূজা, দুর্গা পূজার সময়ে বীরাষ্টমী পালন, রবীন্দ্রনাথের গান, বিপিন চন্দ্র পালের জ্বালাময়ী বাগ্মিতা ও রচনা, অরবিন্দের 'বন্দেমাতরমে'র প্রবন্ধমালা এবং 'যুগান্তরে'র বিপ্লবী মতবাদ প্রচার স্বাধীনতা আন্দোলনকে আরও জোরদার করে তুললো।

মহারাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত 'কেশরী' ও 'কাল' এই নবীন ভাবনার পেছনে মদত জোগাতে লাগলো।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ। কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো। নবীনদের একান্ত ইচ্ছে যে তিলককে তারা সভাপতি করে। কিন্তু তাদের সে ইচ্ছে সফল হলো না। কারণ তাদের দল তখনো পর্যন্ত পাকা ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

তখন বাংলাদেশে একছত্র নেতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রবীণ দলের স্বনামধন্য নেতাও। তাঁর ইচ্ছায় ঐ কংগ্রেসের সভাপতি হলেন দাদাভাই নৌরজী। এই অধিবেশন হচ্ছে কংগ্রেস প্রাচীন তন্ত্রের শেষ অধিবেশন। গত কাশী কংগ্রেসে বয়কট প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ রদ করবার জন্য সরকারকে অনুরোধও করা হয়েছিল।

এবার সভাপতি নৌরজী বললেন, 'স্বরাজ' আমাদের কাম্য।

তখনও স্বরাজের অর্থ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়নি।

এর আগে চরমপন্থী বিপিনচন্দ্র পাল 'নিউ ইণ্ডিয়া' কাগজে ঘোষণা করলেন 'India for Indians।'

'বন্দেমাতরম' পত্রিকাও বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে সায় দিয়ে প্রচার করলো, ভারতের কাম্য—ব্রিটিশ শাসন মুক্ত সম্পূর্ণ অটোনমি।

রাজনৈতিক আন্দোলন ভারতের নানা জায়গায় নানারূপে প্রকাশ

পেতে লাগলো। পাঞ্জাবে রায়তদের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের বিবাদ লাগলো। বিবাদের সূত্র ছিল জমির রাজস্ব এবং প্রজাস্বত্ব।

বিবাদ যখন চরমে গিয়ে পৌঁছল তখন একদিন উত্তেজিত জনতা ডাকঘর লুঠ করলো এবং গির্জা ভেঙ্গে দিল।

পাঞ্জাব সরকার তখন উত্তেজিত হয়ে স্থানীয় আর্য সমাজের নেতা লালা লাজপত রায় এবং শিখ নেতা অজিত সিংকে এই বিদ্রোহের উষ্কানি দাতারূপে সন্দেহ করে গ্রেপ্তার করলেন ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে তারিখে। তাঁদের বিনা বিচারে আটক রাখার নির্দেশ দেওয়া হলো।

জনসাধারণ এর আগে ইংরেজ সরকারের এমন আচরণ লক্ষ্য করেনি। তাই তারা একদিকে যেমন বিস্ময় বোধ করলো অন্যদিকে ইংরেজের বিচারপদ্ধতির ওপর থেকে শ্রদ্ধা হারাল।

ইংরেজের দমননীতি আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো দিনের পর দিন। বাংলাদেশে তার প্রতিক্রিয়া দেখা গেল।

'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলেন ইংরেজ সরকার। এই পত্রিকায় বিপ্লবী অরবিন্দ ছদ্ম নামে প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলো। সেই সঙ্গে গ্রেপ্তার হলেন উক্ত পত্রিকার সম্পাদক বিপ্লবী বিপিনচন্দ্র পাল।

বিপ্লবী বিপিনচন্দ্র পাল আদালতে ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে সাক্ষী দিতে অস্বীকার করায় তাঁকে আদালত অবমাননার জন্য ছ'মাস হাজত বাসের দণ্ড দেওয়া হলো।

অরবিন্দের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। তিনি মুক্তি পেলেন। তাঁর মুক্তিতে খুশী হয়ে বিশ্বকবি একটি কবিতার মাধ্যমে তাঁকে স্বাগত জানান। তাতে তিনি অরবিন্দকে 'স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি' রূপে বরণ করলেন।

যেদিন অরবিন্দ মুক্তি পান সেদিন 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

ঐ প্রবন্ধ রাজদ্রোহীতার জীবন্ত সাক্ষী এইরূপ মনে করে ইংরেজ সরকার ব্রহ্মবান্ধবের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

উপাধ্যায় আদালতে বললেন, যে রাজশক্তি বিদেশী এবং যা স্বভাবতই আমাদের জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী তার কাছে আমি কোন-রকম কৈফিয়ৎ দিতে রাজী নই।

ব্রহ্মবান্ধবকে আর কৈফিয়ৎ দিতে হলো না। হঠাৎ তিনি চলে গেলেন পরলোকে।

এভাবে বিপিনচন্দ্র পাল এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নিজেদের আচরণের দ্বারা আমাদের কাছে অসহযোগ ও আইন অমান্যের কাজ প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি আগেই বলা হয়েছে। পশ্চিম ভারতে মহারাষ্ট্রীয়দের মনে কংগ্রেস প্রসঙ্গে ক্ষীণ আশা জেগে রইল। তারা কংগ্রেসের কার্যকলাপ নিয়ে আগের মত আর মনোযোগ দিল না।

এদিকে কংগ্রেসের নবীন ও প্রবীণ দলের মধ্যে একটা সদ্ভাব স্থাপনের উদ্যোগ চলতে লাগলো।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দ। ডিসেম্বর মাস। এই মাসের প্রথম দিকে প্রবীণ কংগ্রেসের দলনেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি মেদিনীপুরে চরমপন্থী অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করলেন।

এতে বিশেষ সুবিধা কিছু হলো না। অরবিন্দ নরমপন্থী অর্থাৎ প্রবীণদের মতামত গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলেন না।

ওদিকে ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন বসছে।

গতবছর চরমপন্থীরা তিলককে সভাপতি করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে।

এবার নবীন দল নির্য্যাতিত ও দেশভক্ত কংগ্রেস কর্মী লালা লাজপত রায়কে সুরাট কংগ্রেসের সভাপতি করার জন্যে স্থির করলেন। তাঁদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে লালাজী কংগ্রেসের সভাপতি হলে দেশের

অনেক কাজ হবে। তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাজের উপযুক্ত সমালোচনা করতে পারবেন।

যথাসময়ে সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো। প্রবীণ ও নবীন দলের মধ্যে বিরোধ চরম আকার ধারণ করলো। এক দিকে তিলক খাপার্দে, অরবিন্দ ও তাঁদের অনুসরণকারীগণ অন্যদিকে সুরেন্দ্র নাথ, মেটা, রাসবিহারী, গোখেল ও তাঁদের অনুবর্তীগণ। কার্যতঃ সুরাট কংগ্রেস ভেঙ্গে যায়।

এরপর মডারেটপন্থী নেতারা আর একটি সম্মেলন্ আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে কংগ্রেসের আদর্শ ও সংবিধান রচনা করবার জন্যে একটি উপসমিতি গঠন করা হয়।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দ। ১৯ শে এপ্রিল। মডারেটপন্থীরা এলাহাবাদে এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে কংগ্রেসের সংবিধান গ্রহণ করলেন।

চরমপন্থীরা কিন্তু এই সংবিধানের সর্ত মানতে রাজী হলেন না। তাঁরা ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কংগ্রেসে যোগদান করলেন না।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে জাতীয়তাবাদীরা লখনৌ কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেন। তখন থেকে ঐ সম্মেলনের ওপর তাঁদের অধিকার বর্তায়। মডারেটপন্থীরা পরে আর একটি আলাদা প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁরা সংবিধান পরিবর্তন করেন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দ। ১১ই ফেব্রুয়ারী। পাবনা শহর। বাংলাদেশের প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন বসলো। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই সময় দেশে শান্তি ছিল না। তার আগে এ দেশে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে লিখলেন: 'সভাপতি হয়ে শান্তিরক্ষা করতে পারবো কি না সন্দেহ। দেশে যখন শান্তি নেই তখন তাকে রক্ষা করবে কে।'

ঐ সময় রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে কে একজন বেনামী চিঠি লিখেছিল। তাতে কবিকে ভয় দেখানো হয়েছিল।

এই সময় কবি 'স্বদেশী-সমাজ' নামক একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাতে বলেন, রাজনীতির অত্যুক্তি ও প্রতিবাদ হতে আত্মরক্ষা করে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। দেশসেবা মানে গ্রামোন্নতি। গ্রামের মধ্যে সমবায় নীতির প্রবর্তন, একত্রভাবে বিভিন্ন কর্ম করা, কুটির শিল্পের প্রবর্তন প্রভৃতির দ্বারা গ্রামবাসীদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে।

এই সম্মেলনে কবি বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম বক্তৃতা দেন। এর আগে সকলে ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছেন।

এরপর আরও কয়েকবার কবি পল্লীর উন্নতিসাধনের জন্যে একাধিক পরিকল্পনা পেশ করেন। পরে অর্থাৎ ১৯২২ খৃষ্টাব্দে বিশ্বভারতীর নিকটবর্তী স্থানে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হয়।

কবির দেখাদেখি মহাত্মা গান্ধীও একটি পল্লী উন্নয়ন সমাজ গঠন করেন। তার নাম দেন 'গ্রামোদ্যোগ'। পরে তার নাম হয় 'সর্বোদয়'।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দ। ১লা মে' কলকাতার সান্ধ্য পত্রিকা 'এম্পায়ার' একটি সংবাদ প্রকাশ করলো। তার বিষয়বস্তু নিম্নরূপ '৩০শে এপ্রিল রাত একটার সময় ব্যারিষ্টার কেনেডির স্ত্রী মিসেস কেনেডি এবং কন্যা মিস কেনেডি মজঃফরপুরের জজ মিঃ কিংসফোর্ডের বাড়ীর দরজায় প্রবেশ পথে বোমার দ্বারা নিহত হয়েছেন।'

এই সংবাদ পাঠ করার পর সেদিনকার সাধারণ বাঙালীরা বুঝতে পারলো, দেশে এবার সন্ত্রাসের রাজত্ব সুরু হয়ে গেছে এবং তার জন্যে দায়ী হচ্ছে ইংরেজের কুশাসন।

গুপ্ত ও বিপ্লবী বাহিনীর নেতা অরবিন্দ মজঃফরপুর হত্যাকাণ্ডের কয়েকদিন আগে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় 'New condition' নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি বেশ স্পষ্টভাবে বললেন,

গভর্ণমেন্ট যদি এদেশে প্রজার ন্যায্য অধিকার ক্রমাগতই অস্বীকার করেন তবে এর প্রতিক্রিয়ার ফলে গুপ্ত হত্যা ও গুপ্ত অনুষ্ঠান অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

এরপর মাণিকতলায় বোমার কারখানা আবিষ্কার হলো। তাকে কেন্দ্র করে আলিপুর কোর্টে বিখ্যাত মাণিকতলা বোমার মামলা ও অরবিন্দের বিচার হলো। অরবিন্দের সঙ্গে বারীণ ঘোষ প্রমুখ আরও কয়েকজনের বিচার হয়।

বিচারে অরবিন্দ মুক্তি পেলেন। বারীণ ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন যাবজ্জীবন কারাবাস দণ্ড ভোগ করেন। তখন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সন্ত্রাসবাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল।

মহারাষ্ট্রের নেতা তিলক তাঁর বিখ্যাত পত্রিকা 'কেশরী'তে লিখলেন: 'বোমা নিক্ষেপ নিশ্চয়ই গর্হিত কর্ম। কিন্তু সরকারের দমননীতি ও অন্যান্য কঠোর ব্যবস্থার ইহা অবশ্যম্ভাবী ফল। দেশের পরিস্থিতির জন্যে যদি সরকার কঠোরতর দণ্ডনীতির ব্যবস্থা করেন তবে তার ফলে দেশে বিদ্রোহ বিস্তারের সম্ভাবনাই বেশী হবে। বিদ্রোহ দমনের উপায়— নানা প্রকার সুবিধা প্রবর্তন করে দেশবাসীর অসন্তোষ দমন করা।'

মিঃ কিংসফোর্ড ছিলেন তখনকার কলকাতার জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর আদালতে কয়েকটি রাজনৈতিক মামলার বিচার হয়। তিনি 'বন্দেমাতরম্' ও 'যুগান্তর' পত্রিকার মুদ্রাকরদের শাস্তি দেন। তিনি সুশীলকুমার সেন নামে চোদ্দ বছরের একটি বালককে বেত্রাঘাতের আদেশ দেন।

তাঁর এই প্রকার নিপীড়ন মূলক ব্যবহার বিপ্লবীদের মনঃপূত হলো না। তাঁরা তাঁর ওপর নানাভাবে প্রতিশোধ নেবার ফন্দীফিকির করতে লাগলেন।

শেষকালে তাঁরা ঠিক করলেন, ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকি নামে দু'জন যুবককে মজঃফরপুরে পাঠানো হবে। সেখানে গিয়ে তাঁরা কিংসফোর্ড সাহেবকে হত্যা করবেন।

তাঁদের কথামত ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকি চলে গেলেন মজঃফরপুরে।

তাঁরা কিংসফোর্ড-এর গাড়ী ভেবে একটি গাড়িকে লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়লেন।

সে গাড়ীতে কিংসফোর্ড সাহেব ছিলেন না। সুতরাং তিনি সেবারকার মত প্রাণে বেঁচে গেলেন। মিসেস কেনেডি ও তাঁর কন্যা এই আক্রমণের ফলে প্রাণ হারালেন।

প্রফুল্ল চাকি ইংরেজ পুলিশের হাতে নিজেকে ধরা দিলেন না। তার আগেই তিনি রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করেন।

ধরা পড়লেন ক্ষুদিরাম বসু। তারপর তাঁর বিচার হয়।

বিচারে তাঁর ফাঁসির আদেশ হলো।

ফাঁসির কথা শুনে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না ক্ষুদিরাম। বরং তিনি বীর সৈনিকের মত মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত হলেন। তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্যে লড়েছেন। ভারতমাতার দুঃখ দূর করার জন্যে তিনি সংগ্রাম করেছেন। এই সংগ্রামের জন্যে তাঁকে যদি মৃত্যুবরণ করতে হয় তাতে ক্ষতি কি? কারণ জীবন তো ক্ষণিকের জন্যে। কিন্তু মানবদেহের অভ্যন্তরে যে আত্মা রয়েছে তা অক্ষয়। সে অবিনাশী। পরের জন্মে এই আত্মাই আবার ভারতের মাটিতে নতুন দেহ নিয়ে জন্মাবে দেশের ও দশের সেবা করবার জন্যে।

অষ্টাদশ বর্ষের যুবক ক্ষুদিরামের মনে এই প্রকার দার্শনিক মত দানা বেঁধে উঠেছিল। কারণ তখন দেশের বিপ্লবী সমিতির কর্ণধারগণ দেশের তরুণদের কাছে গীতা ও চণ্ডীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতেন।

ক্ষুদিরাম নিজে গীতা পাঠ করতেন। ফাঁসির কয়েকদিন আগেও তিনি নিত্য গীতা পাঠ করতেন।

যেদিন তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হবে সেদিন সকালে তিনি চান করে গীতা পাঠ করতে বসলেন। ঐ দিনের তারিখ ছিল ১১ই আগষ্ট, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ।

গীতা পাঠ করার পর বীর শহীদ ক্ষুদিরাম ধীরে ধীরে ইংরেজ পুলিশের সঙ্গে চলে এলেন ফাঁসির মঞ্চে। তারপর ইংরেজী নিয়ম মাফিক ইংরেজ হাকিমের আদেশ মত ফাঁসির রজ্জু নেমে এলো ক্ষুদিরামের বলিষ্ঠ কণ্ঠে।

বীর ক্ষুদিরাম হাসতে হাসতে জীবন দিলেন ফাঁসির মঞ্চে। আত্মীয়-স্বজনের কাতর ক্রন্দন, দেশবাসীর সকাতর অশ্রুজল এবং ইংরেজ শাসকদের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে এভাবে ক্ষুদিরাম আত্মাহুতি দিয়ে চিরকালের মত ইতিহাসের পাতায় অমর শহীদ রূপে জীবিত হয়ে রইলেন। বাংলাদেশে অগ্নিযুগের তিনিই হচ্ছেন প্রথম শহীদ যিনি নাকি ফাঁসির মঞ্চে জীবন উৎসর্গ করেন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে আরও দু'জন বীর শহীদ ইংরেজের বিচারে ফাঁসি কাঠে আত্মবলি দেন।

প্রথম জন হচ্ছেন বীর কানাইলাল দত্ত। ইনি গুপ্ত সমিতির সক্রিয় সদস্যরূপে বিচারাধীনে কারারুদ্ধ হন। ঐ কারাগারে রাজ সাক্ষী নরেন গোঁসাইকে তিনি হত্যা করে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দেন। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর তারিখে ফাঁসির মঞ্চে তাঁর বিপ্লবী জীবনের অবসান ঘটে।

দ্বিতীয় জন হচ্ছেন শহীদ সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ইনি ছিলেন বিপ্লবী; অগ্নিমন্ত্রের সাধক ও শহীদ। মেদিনীপুরে অরবিন্দ প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত সমিতির নায়ক। কিংসফোর্ড হত্যা মামলায় ধৃত ও নরেন গোঁসাই হত্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর তারিখে তাঁর ফাঁসি হয়।

'কেশরী' পত্রিকায় তিলকের প্রবন্ধগুলি পাঠ করার ফলে বোম্বাই সরকার তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হলেন এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করলেন।

আদালতে তিলকের বিচার হলো। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে যেসব যুক্তি দেখালেন তা তুলনাহীন। তবু ইংরেজ বিচারকরা তাঁকে দু'বছরের জন্যে কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

এই মোকদ্দমায় মোট ৯ জন জুরির মধ্যে ৭ জন ছিলেন ইংরেজ এবং ২ জন পার্সী। পার্সী জুরিরা তিলকের পক্ষে রায় দিলেন আর ইংরেজ জুরিগণ দিলেন বিপক্ষে।

তিলকের কারাবাস হলো। এর দ্বারা সরকারের অভিপ্রায় সিদ্ধ হলো বটে কিন্তু জনতার ক্ষোভ দমিত হলো না বরং আরও দ্বিগুণ মাত্রায় আত্মপ্রকাশ করলো।

.৯০৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে নাসিকের ম্যাজিষ্ট্রেট জ্যাকসন বিপ্লবীদের হাতে নিহত হন।

শহীদ কানাই ও সত্যেনের মামলার সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাস পুলিশ কোর্টের সামনে বিপ্লবীদের গুলিতে প্রাণ হারালেন।

এরপর বিপ্লবীরা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর কলকাতার সারপেন্টাইন লেনের বাড়ীতে গিয়ে হত্যা করেন। ইনি ছিলেন পুলিশের দারোগা। বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী এঁর হাতে ধরা পড়েন।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত সরকারী পক্ষের অন্যতম উকিল সামসুল হুদাকে হত্যা করেন। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট তারিখে আর এক বিপ্লবীর ফাঁসি হয় লণ্ডনে। তাঁর নাম হচ্ছে মদন লাল ধিঙ্গড়া। জাতিতে পাঞ্জাবী। তিনি লণ্ডনে কারিগরী বিদ্যা পড়তে গিয়েছিলেন। পড়বার সময় লণ্ডনে বিপ্লবী সমিতির সভ্য হন এবং ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে নিজেকে অন্তরে অন্তরে প্রস্তুত করতে লাগলেন। অস্ত্রশস্ত্র বিদ্যায় বিশেষ জ্ঞান অর্জন করলেন।

তারপর হঠাৎ তাঁর প্রস্তুতির পূর্ণ প্রকাশ ঘটলো লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউটে। এখানে মদন লাল ইণ্ডিয়া অফিসের পলিটিক্যাল এ. ডি. সি. কর্ণেল উইলিয়াম কার্জন উইলিকে পিস্তলের গুলিতে হত্যা করেন।

বিপ্লবীরা যেমন ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগলেন

তেমনি সরকারও তাদের ওপর নানা প্রকারে নিপীড়ন মূলক ব্যবস্থা নিতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলনের চাইতে বিভেদই অধিকতর মাত্রায় আত্মপ্রকাশ করলো। মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলনকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারে নি। কেবলমাত্র কয়েকজন মুসলমান ছাড়া আর সকলেই ছিল বিরুদ্ধে। এই পৃথক হয়ে থাকার জন্যে মূলত দায়ী হচ্ছে তাদের ধর্মের ভাঁড়ামি। জাতি ও ধর্মের কুসংস্কার হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পথে এক চরম প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল।

ওদিকে মুসলমানগণ নিজেদের পৃথক জাতিরূপে প্রচার করে নিজেদের স্বাধীনতা ও সুখ-সুবিধা লাভের জন্যে মুসলীম লীগ নামে একটি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করলো।

ঐ প্রতিষ্ঠানই হয়ে উঠলো কাল। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধলো। ইংরেজ শাসকরা এই হাঙ্গামার বিরুদ্ধে কোন রকম সক্রিয় ব্যবস্থা নিলেন না। কেবল দাঙ্গাকারীদেব কাছ থেকে এক বছবের মুচলেকা আদায় করে ছেড়ে দিলেন। এর দ্বারা বোঝাই যাচ্ছে যে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ইংরেজদের নির্বিঘ্নে শাসন কর্ম চালাবার এক প্রধান হাতিয়ার। তাই তাঁরা মুসলমান সম্প্রদায়কে কিছু বলতেন না শত অন্যায় করা সত্ত্বেও।

ইংরেজরা দেখলেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ক্রমশই রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হতে চলেছে। তাই তাঁরা শাসনতন্ত্রের কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন বোধ করলেন।

কংগ্রেস বহুকাল ধরে শাসনতন্ত্রের মধ্যে পরিবর্তন দাবী করে আসছিল।

আগে অর্থাৎ ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ব্যবস্থাপক সভায় কয়েকটি ভারতীয় সদস্যের সংখ্যা বাড়িয়ে আন্দোলনকে কিছুটা শান্ত করা হলো।

এই আইনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়নি। কিন্তু আসন সংখ্যা এমন ভাবে বণ্টন করা হলো যাতে করে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ আরও প্রকট হয়ে উঠলো।

এবার নতুন বড় লাট লর্ড মিণ্টো ও ভারত সচিব জন মর্লি দু'জনে শাসন সংস্কারে ব্রতী হলেন। এই সংস্কারের দ্বারা দেশীয় সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রশ্নোত্তর করার অধিকার দেওয়ার কথা প্রস্তাব হলো।

এর সঙ্গে যুক্ত হলো সম্প্রদায়গত নির্বাচন। ফলে দুই জাতির মধ্যে মিলনের চিন্তা হলো সুদূর পরাহত।

নির্বাচকমণ্ডলী চারভাগে বিভক্ত হলো- সাধারণ, জমিদার, মুসলমান ও বিশেষ।

অনেক আলোচনার পর ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মর্লি-মিণ্টো শাসন সংস্কার গৃহীত হলো।

এর মধ্যে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার বড়লাটের শাসন পরিষদে কলকাতার সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহকে এডভোকেট জেনারেলের এবং পাটনার ব্যারিষ্টার সৈয়দ আমীর আলীকে বিলেতের প্রিভিকাউন্সিলের সদস্যপদ দিয়ে জনসাধারণকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে ইংরেজ সরকার যোগ্য ভারতীয়দের উপযুক্ত সম্মান দিতে জানেন।

এর আগে ইংরেজ সরকার ভারতীয়দের এতবড় পদ কক্ষনো দেননি। এবার ভারতীয়গণ এই পদ লাভ করে নিজেদের অত্যন্ত গর্বিত বোধ করলেন।

এছাড়া ১৯১০ খৃষ্টাব্দ হতে ছোট লাটের জন্য শাসন-পরিষদ গঠিত হলো। আগে একাই সবকিছু কাজ দেখাশুনা করতেন এবং প্রয়োজনে বড়লাটের কাছ থেকে বিশেষ আদেশের অপেক্ষায় থাকতেন।

মর্লি-মিণ্টো শাসন সংস্কার শান্তচিত্তে মেনে নিতে পারলেন না চরমপন্থীরা। তাঁরা ভাবলেন, এটা হচ্ছে ইংরেজের একটা মস্তবড় চাল। ভারতের সুমহান স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমাবার জন্য এ হচ্ছে উত্তম কৌশল। তাই তাঁরা নিজেদের কাজে বিরতি দিলেন না। সারা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ইংরেজ শাসকদের প্রতি তাঁদের ক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করলো।

ওদিকে নরমপন্থীদের পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে কোন রকম উচ্চবাচ্য শোনা গেল না।

চরমপন্থীদের কার্য্যকলাপ ভারতের চারদিকে কিছু না কিছু চলতে লাগলো। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল তারিখে মহারাষ্ট্রের অন্যতম বিপ্লবী দেশপাণ্ডের ফাঁসি হলো। তিনি নাসিক জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট জ্যাকসনকে হত্যা করতে গিয়েছিলেন। ঐ একই দিনে আরও দু'জন মহারাষ্ট্র বাসীর ফাঁসি হয়। তাঁরা হচ্ছেন অনন্ত কান্‌হোর এবং কৃষ্ণজী কার্ভে।

১৯১১ খৃষ্টাব্দ। সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারতবর্ষে এসে বঙ্গভঙ্গ রদ করলেন। তাঁর ধারণা ছিল বঙ্গভঙ্গ রদ করলে ভারতবর্ষ হতে বিপ্লবীদের উৎপাত দূর হবে।

কিন্তু তাঁর সে. আশা ব্যর্থ হলো। বরং দিনের পর দিন বিপ্লবীদের ক্রিয়াকলাপ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়লো।

তখন জেলের মধ্যে অনেক নেতা আটক ছিলেন, কারও বা দ্বীপান্তরও হয়েছিল। এইসব কারণে বিক্ষুব্ধ জনগণ ভেতরে ভেতরে বিপ্লবের জন্য তৈরী হচ্ছিলেন।

এবারকার শসস্ত্র আন্দোলনের নেতা হলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অর্থাৎ বাঘা যতীন আর রাসবিহারী বসু।

:৯১২ খৃষ্টাব্দ। এপ্রিল মাস। এই সময় ভারতের বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে ভারতের নতুন রাজধানী দিল্লীতে প্রবেশ করছিলেন।

হঠাৎ তাঁর হাতীর ওপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। বড়লাট বেঁচে গেলেন বটে কিন্তু তাঁর স্ত্রী আঘাত পেলেন। আর ঐ আঘাতই হলো কাল। কিছুদিন পরে তাঁর মৃত্যু হলো।

এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন রাসবিহারী বসু। তিনি ধরা পড়লেন না। ধরা পড়লেন আমির চাঁদ, অরুর সিং, অবোধ বিহারী, বালমোকন্দ এবং বসন্ত কুমার বিশ্বাস। বিচারে এঁদের ফাঁসির আদেশ হয় এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই মে তারিখে তাঁরা ফাঁসির মঞ্চে আত্মাহুতি দেন।

ইংরেজ পুলিশ রাসবিহারীকে ধরবার জন্যে ১২ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করলো। কিন্তু সফল হলো না। তিনি এমনভাবে গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন যে পুলিশের সাধ্য ছিল না তাকে খুঁজে বের করা।

এই ঘটনার দু'বছর পর ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা হলো। একদিকে ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি রাষ্ট্র অন্য দিকে একা জার্মান। ঠিক এই সময়ে ভারতীয় বিপ্লবীরা ভারতের স্বাধীনতার জন্যে ইউরোপ হতে অস্ত্র-শস্ত্র আনার চেষ্টা করছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম বিপ্লবী হলেন লালা হরদয়াল। তিনি জার্মান সম্রাট কাইজারের কাছে গিয়ে অস্ত্র প্রার্থনা করলেন।

জার্মানির সম্রাট ভারতীয় বিপ্লবীর কথা মন দিয়ে শুনলেন এবং তাঁকে দুই জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতে রাজী হলেন।

ঐ দু'খানি জাহাজের মধ্যে একখানি জাহাজ বালেশ্বরে আসবার কথা ছিল।

তাই শুনে বুড়িবালামের তীরে বালেশ্বরের জঙ্গলে বাঘা যতীন দলবল নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

খবর পেয়ে একদল সশস্ত্র পুলিশ এসে তাঁদের ঘিরে ফেললো।

একদিকে মাত্র পাঁচজন তরুণ অন্যদিকে অসংখ্য রাইফেলধারী পুলিশ।

উভয়পক্ষে বেশ কিছুক্ষণ যুদ্ধ চললো। বার বাঘা যতীন একা পুলিশের সঙ্গে অনেকক্ষণ লড়াই করলেন। তারপব তিনি ও তাঁর জনৈক সহকর্মী রণাঙ্গণে প্রাণ হারালেন।

অপর দু'জনের ফাঁসি হলো। আর শেষ জনের হলো যাবজ্জীবন কারাবাস।

যে বীর যুবক বাঘা যতীনের সঙ্গে জীবন বিসর্জন দিলেন তাঁর নাম হচ্ছে চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী।

মহাযুদ্ধ চলার সময় ভারতের সর্বত্র ধরপাকড় সুরু হলো। বিপ্লবী রাসবিহারী দেখলেন, তাঁর পক্ষে ভারতবর্ষে থাকা আর নিরাপদ নয়, তখন তিনি পুলিশের নজর এড়িয়ে ছদ্মবেশে চলে গেলেন জাপানে। সেখানে ভারতের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। গড়ে তুললেন এক স্বাধীন সৈন্যবাহিনী। তার নাম আজাদ হিন্দ ফৌজ। পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র বসু ভারত হতে জার্মানি হয়ে জাপানে রাসবিহারী বসুর সঙ্গে মিলিত হয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং ঐ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক রূপে পরিচালনার ভার গ্রহণ কবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সুরু করেন।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের সুরাট কংগ্রেসের পর হতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জাতীয় মহাসমিতির ইতিহাস একান্তভাবেই বৈচিত্র্যহীন। তবে চরমপন্থীদের কার্য্যকলাপ এই সময়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়নি। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় দু'চারজন বিপ্লবীর ফাঁসিকাষ্ঠে মৃত্যুবরণ হয়েছিল।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিরুনেলভেলীর ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের কর্মচারী বংচিনাথন আত্মহত্যা করেন। তিনি ছিলেন বিপ্লবী। ভারতবর্ষ হতে ইংরেজ রাজত্ব চিরকালের মত অপসারণ করার বাসনা নিয়ে তিনি 'ভারত মাতা সংগ্রাম' নামে একটি সমিতিতে যোগদান করেন। পরে তিনি তিরুনেলভেলীর কলেকটর মিষ্টার আশেকে খুন করেন।

ইংরেজের হাতে ধরা পড়বার আগেই নিজের হাতে নিজের জীবন শেষ করেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে আসামের দিগীন্দ্রনাথ দে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। শ্রী দে স্বদেশী আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন এবং নিজের বাড়ীর মধ্যে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে দেশের যুবকদের দেশের কাজে উদ্বুদ্ধ করে তুলতেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল বিপ্লবী ইন্দুভূষণ রায় আন্দামান বন্দী-নিবাসে পুলিশের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেন।

এবার শহীদ আমীর চাঁদের কথা স্মরণ করা যাক। বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যার ষড়যন্ত্রে তিনি পুলিশের হাতে ধৃত হন এবং ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর ফাঁসি হয়।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দ। এই বছরে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলাকে কেন্দ্র করে পাঞ্জাবের গদর পার্টির বহু সদস্য ফাঁসিকাষ্ঠে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁরা হচ্ছেন হরনাম সিং, ইসান সিং, জগৎ সিং, যেথা সিং, কাশীরাম যোশ, মোধা সিং, সজ্জন সিং, কর্তার সিং সরবা, সুরেন সিং এবং বুধ সিং।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে আর একজন বীর পাঞ্জাবীর ফাঁসি হয়। তার নাম বুচা সিং। পিতার নাম শোর সিং, মায়ের নাম খেমিন। বুচা সিং-এর আদি নিবাস পাঞ্জাব হলেও তিনি ক্যানাডায় বাস করতেন। সেখানকার গদর কমিটির সভ্য ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে তাঁর খুব ঝোঁক ছিল। তিনি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর জনৈক পুলিশ অফিসারকে হত্যার দায়ে গ্রেপ্তার হন। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে আর একজন বিপ্লবী পাঞ্জাবীর ফাঁসি হয়। তাঁর নাম করম সিং। পিতার নাম ভানা রাম। তিনি বাববার আকালি আন্দোলনে অংশ নেন। ফলে ইংরেজ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে ইংরেজের আদালতে বিচার হয়। বিচারে তাঁর ফাঁসির আদেশ হলো। ফাঁসির দিন এই বীর সগৌরবে ফাঁসিতে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেন।

কলকাতার বাসিন্দা বিপ্লবী সতীশচন্দ্র মিত্র ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন যখন তিনি ভারতবর্ষের সীমানা পেরিয়ে চীন দেশে চলে যাচ্ছিলেন।

বিপ্লবী অবোধ বিহারীর ফাঁসি হয় ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে তারিখে। তিনি ছিলেন দিল্লীর মানুষ। উত্তর ভারতের বিপ্লবী সমিতির সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সঙ্গে কাজ করেছিলেন অনেকদিন। তারপর বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যার ষড়যন্ত্রের মামলায় ধৃত হন ৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে আরও দু'জন বিপ্লবী শহীদ ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে যান। তাঁরা হলেন বকশিস সিং এবং বালমোকন্দ। তাঁরা বিখ্যাত লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

এবার স্মরণ করি মহারাষ্ট্রবাসী এবং বীর শহীদ বিষ্ণু জিরাট পিঙ্গলকে। তিনি ছিলেন আমেরিকার কারিগরী বিদ্যালয়ের স্নাতক। আমেরিকার ভারতীয় বিপ্লব সমিতিতে অংশ নেন। তিনি ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে অত্যাচারী ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিক্রমার পর ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে এক সেনানিবাসের মধ্যে প্রবেশ করেন। তখন তাঁকে সন্দেহবশে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁর হাতে একটি উচ্চক্ষমতা-বিশিষ্ট বোমাও পাওয়া গিয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে অনেকগুলি অভিযোগ আনা হয়েছিল। তার মধ্যে একটি হচ্ছে ইংরেজ সরকারকে উৎখাত করার জন্যে তিনি সৈন্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। এই প্রকার রাষ্ট্রদ্রোহীতার জন্য তিনি এবং আরও ২৩ জন সঙ্গীর প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়।

পরে অবশ্য বিচারের রায় পরিবর্তিত হয়। ২৩জনের মধ্যে ১৭ জনের যাবজ্জীবন কারাবাস হয়।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর তারিখে এই বীর শহীদ ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ বিসর্জন দেন। তাঁর সঙ্গে ঐ একই দিনে আরও দু'জনের ফাঁসি হয়।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন আর একজন বীর শহীদের ফাঁসি হয়। তাঁর নাম রঙ্গ সিং। বাড়ী পাঞ্জাবের খুর্দহুর গ্রামে। পিতার নাম গুরদিৎ সিং। তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়ে আমেরিকার চলে যান। সেখানকার গর্দার দলে যোগ দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হতে থাকেন। তারপর ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ভারতে ফিরে এসে ভারত হতে ইংরেজ রাজত্ব অবসানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। একদিন একটা পুলিশ কনষ্টেবলকে হত্যা করার অপরাধে তিনি ধৃত হন এবং বিচার তাঁর ফাঁসির আদেশ হয়।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২রা মে তারিখে আর একজন বীর শহীদ পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান। তাঁর নাম সুশীল কুমার সেন। আসামে মানুষ। ছোটবেলা থেকেই বিপ্লবী ছিলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় জনৈক ইংরেজ পুলিশ কর্মচারীর ওপর আক্রমণ চালালে বিচারে তার প্রতি বেত্রাঘাতের দণ্ড জারি করা হয়। তারপর ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কলকাতার গুপ্ত সমিতিতে যোগ দেন। এই সময় তিনি বোমা তৈরী করতে শেখেন। পরে পুলিশের হাতে ১৫ই মে তারিখে ধরা পড়েন। বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন কারাবাস হয়। পরে তিনি রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করেন। বিচারক তাঁর আপীল শুনে তাঁর প্রতি দয়া পরবশ হয়ে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মুক্তি দেন। মুক্তির পর তিনি বিপ্লব সমিতির কাজে যোগ দিয়ে দেশ হতে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। পুলিশ ইন্সপেক্টর সুরেশ মুখার্জিকে হত্যার ব্যাপারে তিনি জড়িত থাকেন। পরে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল নদীয়ায় রাজনৈতিক ডাকাতি করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দ। ৩০শে মার্চ। লাহোর সেন্ট্রাল জেলের পরিবেশ থমথমে। আজ এখানে বীর শহীদ বীর সিং-এর ফাঁসি হবে। সকলের চোখে জল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও অত্যাচারী ইংরেজ শাসকের রাজকর্মচারী এবং জহ্লাদ রেহাই দিলো না বীর সিংকে।

নির্দিষ্ট লগ্নে বীর সিং-এর গলায় ফাঁসির রজ্জু নেমে এসে তাঁর অমূল্য প্রাণ হরণ করে নিলো।

এই বীর সিং পাঞ্জাবের অধিবাসী হয়েও ক্যানাডায় বসবাস করতেন। সেখানকার গর্দার পার্টিতে যোগদান করে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে আগস্ট তারিখে ক্যানাডা হয়ে ভারতের পুণ্য ভূমিতে ফিরে আসেন এবং স্বদেশ জননীর মুক্তির জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শাসকের কঠোর দণ্ড নেমে আসে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন তারিখে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ইংরেজ পুলিশের হাতে বন্দী হন। বিচারে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপবাধে তাঁব ফাঁসিব আদেশ হয়।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে আব এক বিপ্লবী তরুণ পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান। তাঁর নাম অরুণ চন্দ্র চক্রবর্তী। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে পাবনায় জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি গুপ্ত সমিতির সভ্য ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে ভোলানাথ চ্যাটার্জির নাম স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি ছিলেন বিপ্লবী দলের সদস্য। জার্মানী থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে এনে ভারতের মাটিতে ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করায় লিপ্ত থাকেন। স্বদেশে ফিবে আসার সময় গোয়াতে ইংরেজ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে। পরে তাঁকে পুনাব জেলে রাখা হয়। কিন্তু জেলের মধ্যে ইংরেজ পুলিশের অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দেব ২৮শে জানুয়ারী তারিখে আত্মহত্যা করেন।

উত্তরবঙ্গের অধিবাসী সুশীল দত্ত ছিলেন বিপ্লবী দলের অন্যতম সদস্য। একবার পুলিশের সঙ্গে গুলি বিনিময় করার সময় পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। সেও ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে আর একজন বিপ্লবী পুলিশের নির্মম অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে জেলের মধ্যে প্রাণ হারান। এই বিপ্লবীর নাম হচ্ছে

সঞ্জীবচন্দ্র দত্তরায়। এই বিপ্লবীর বাড়ী ছিল পূর্ববাংলার মৈমনসিংহ জেলায়। পিতার নাম গোবিন্দচন্দ্র দত্ত রায়।

আর একজন বিপ্লবীর কথা স্মৃতিপথে উদিত হচ্ছে। সেই বিপ্লবীর নাম হচ্ছে সোহনলাল পাঠক। পাঞ্জাবের অমৃতসর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী তারিখে। পিতার নাম চাঁদ রাম পাঠক।

অল্পবয়স হতে মনে জাগে বিপ্লবের ভাব। প্রাইমারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। ঐ সময় দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। তিনিও স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। তরুণ বিপ্লবীরা তাঁর স্কুলের কাছে এসে দেশের ছেলেদের কাছে স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা শোনাত। তারাও তাদের কথা মত স্কুল ছেড়ে দলে দলে পথে বেরিয়ে পড়তো।

এ ব্যাপারে সোহনলাল ছেলেদের কিছু বলতেন না। তাঁর ঐপ্রকার ব্যবহারে স্কুলের প্রধান শিক্ষক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন।

পরে সোহনলাল যখন লালা লাজপত রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে চলছিলেন তখন স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাঁকে স্কুল থেকে চলে যেতে বাধ্য করেন।

সোহনলাল নির্ভীক চিত্তে শিক্ষকতার চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন। তারপর তিনি লালা লাজপত রায়ের পরিচালনায় 'বন্দেমাতরম্' নামে একটি উর্দ্দু পত্রিকার সম্পাদক হন।

এরপর সোহনলাল থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যান। পরে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলের গদার পার্টিতে যোগ দেন এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা চিন্তা করেন।

পরবর্তীকালে সোহনলাল বর্মা, মালয় এবং সিঙ্গাপুরে যান। সেখানে বৃটিশ ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে বিপ্লবের আদর্শ প্রচার এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রতী হতে আহ্বান জানান।

সৈনিকরা তাঁর কথা শুনে একদিন ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সেই সময়টা ছিল ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস। কিন্তু দুর্ধর্ষ ও চতুর ইংরেজ সুকৌশলে সেই বিদ্রোহ দমন করলেন। গুলিতে অনেক সৈন্য প্রাণ হারালেন, অনেকে বন্দীও হলেন।

পরে ইংরেজ শাসকের দৃষ্টি পড়লো সোহনলালের ওপর। তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহাতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে বন্দী করলেন।

বিচারে সোহনলালের ফাঁসির আদেশ হয়। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী বর্মার মান্দালয় জেলে ফাঁসি হয় সোহনলালের।

এবার বিপ্লবী রাম সিং-এর কথা স্মরণ করা যেতে পারে। পাঞ্জাবের জলন্ধর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন রাম সিং।

অল্প বয়সে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ কবেন। তারপর তিনি আমেরিকায় যান এবং গদর পার্টির সভ্য হন।

পরে ভারতবর্ষে ফিরে এসে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যে প্রস্তুত হন।

একসময়ে ডেপুটি কমিশনাব অব পুলিশ বিপ্লবীদের গুলিতে মৃত্যু বরণ করেন। পুলিশ তখন রাম সিংকে সন্দেহ করে গ্রেপ্তাব করে। বিচার শুরু হয়।

বিচারে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে রাম সিং হাসতে হাসতে বীর শহীদের মত ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ বিসর্জ্জন করে দেশবাসীদের চিত্তে অমর হয়ে রইলেন।

এবার বিপ্লবী উত্তম সিং-এর কথা স্মরণ করা যাক। ইনি পাঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলায় ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পরে ইনি কানাডার গদর পার্টির সদস্য হয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেব সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে নিজেকে জড়িত করেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ক্যানাডা হতে ভারতে প্রত্যাবর্তন কবেন উত্তম সিং।

ভারতে এসে বিপ্লবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ইংরেজ পুলিশ উত্তম সিংকে জড়িত করে।

বিচারে উত্তম সিংয়ের ওপর মৃত্যুর দণ্ডাদেশ নেমে আসে। ১৯১৬

খৃষ্টাব্দে উত্তম সিং হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে আত্মাহুতি দিয়ে অমর হন।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে হরুর সিং-এর ফাঁসি হয়। তিনি ছিলেন পাঞ্জাবের জলন্ধব জেলাব মানুষ। উত্তর ভারতের বিপ্লবী সমিতির সভ্য ছিলেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন তদানীন্তন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যা কবার ষড়যন্ত্রের অন্যতম আসামী। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়।

এই প্রসঙ্গে শহীদ বলবন্ত সিংকে স্মরণ করা যেতে পাবে। তিনি ছিলেন পাঞ্জাবের জলন্ধর জেলার মানুষ। তাঁর পিতাব নাম বুধ সিং। তিনি গদর পার্টির সভ্য ছিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে আমেবিকা যুক্তবাষ্ট্রে গমন করেন কিন্তু সেখানকার স্যানফ্র্যানসিসকোর মাটিতে পদার্পণ করতে পারলেন না। যখন নামতে যাবেন তখন তাঁকে বন্দী কবে ক্যানাডিয়ান পুলিশ। তাঁব বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি নাকি ক্যানাডার ইমিগ্রেশান ইন্সপেক্টর হপকিনস্‌কে মারার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। এই হপকিনস্‌ ক্যানাডায় বিপ্লবী শিখ জাতির বিরুদ্ধে অভিযান চালান।

যাহোক সে যাত্রায রক্ষা পেলেন বলবন্ত সিং। তারপর তিনি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ব্যাঙ্ককে পুনরায বন্দী হলেন ব্রিটিশ সরকারের হাতে, তাঁকে প্রত্যর্পণ করা হয।

পরে বলবন্ত সিং-এর বিরুদ্ধে লাহোর ষডযন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়, বিচারে তাঁর ফাঁসির আদেশ হয়। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লাহোর জেলে এই মৃত্যুঞ্জয়ী বীর হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ কবে অমরধামে প্রস্থান করেন।

ললিত চাঁদ চৌধুরীও একজন বিপ্লবী ছিলেন। বাংলার কুমিল্লায় তাঁর আদি নিবাস ছিল। বাবাব নাম এস, চৌধুরী। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত সমিতির সভ্য হন। পরে ইংরেজ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। বিচারে তাঁর প্রতি দশ বছর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হয়। কিন্তু

অতদিন তাঁকে কারাবাস করতে হলো না। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পাঞ্জাবের মণ্টগোমেরি জেলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

হরিদাসও ছিলেন বিপ্লবী এবং গুপ্ত সমিতির সদস্য। পশ্চিম বাংলার ২৪ পরগণা জেলায় তাঁর বাড়ী। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ পুলিশের হাতে বন্দী হন এবং রাজশাহীর বারুইপাড়াতে অন্তরীণ অবস্থায় বাস করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে ঐ প্রকার জীবন যাপন কবা অত্যন্ত গ্লানিকর ভেবে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই আত্মহত্যা করেন।

বিপ্লবী শহীদ মথুরা সিং কোহলি ছিলেন পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত ঝিলাম জেলার ধুদিয়াল গ্রামের অধিবাসী। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হরি সিং কোহলি। তিনি গদর আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেন। পরে পুলিশের হাতে দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা উপলক্ষ্যে বন্দী হন। তাঁর বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ এনে ফাঁসিব আদেশ জাবি করা হয়। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দেব ২৩শে মার্চ তারিখে তাঁর ফাঁসি হয।

সুরেন্দ্র কুসারিও কম বিপ্লবী ছিলেন না। কলকাতায় তাঁর বাড়ী ছিল। আর্মেনিয়ান স্ট্রীটে এক দোকান লুঠ করতে গিয়ে গুলির আঘাতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে তারিখে প্রাণ হারান।

বিপ্লবী সুজন দাসের নাম স্মরণ করা যায।

তাঁর পিতার নাম বুচা রাম। পাঞ্জাবেব হোসিয়ারপুর জেলাব অন্তর্গত ফতেগড় গ্রামের অধিবাসী। কিন্তু তা হলে কি হবে তিনি ছিলেন বিদেশী। ফিলিফাইনসের মানুষ। আমেরিকায় গদর সমিতিরও সভ্য ছিলেন। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। ভারতে এসে ইংরেজেব বিরুদ্ধে সক্রিয ভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং চারজন সরকারী অফিসারকে হত্যা করেন। এই কারণে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। বিচারে তাঁর ফাঁসির আদেশ হয়। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ফিরোজপুর জেলে তিনি ফাঁসির মঞ্চে তাঁর অমূল্য জীবন দান করে অমর শহীদ রূপে আজও আমাদের মাঝে জীবিত রয়েছেন।

বিপ্লবী নগেন্দ্রনাথ দত্তর কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তিনিও কম বিপ্লবী ছিলেন না। আসাম প্রদেশের অন্তর্গত সিলেট জেলার সুনামগঞ্জ গ্রামের মানুষ। তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিরুদ্ধে সক্রিয় অংশ নেন। বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সঙ্গে অনেক দিন কাজ করেন এবং ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে রাসবিহারী বসু যখন গোপনে ভারত ত্যাগ করেন তখন তিনি তাঁকে কলকাতা থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন। দিল্লীতে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা মারতে গিয়ে ধরা পড়েন। লাহোরে লরেন্স গার্ডেনে বোমা বিস্ফোরণের ব্যাপারের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। বারাণসী ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি আবার গ্রেপ্তার হন এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে আগ্রা জেলে প্রাণ হারান।

পাঞ্জাব প্রদেশের লায়েলপুর জেলার গুজ্জন সিংও কম বিপ্লবী ছিলেন না। ইনি ভারত সরকারের সেনাবিভাগে কাজ করতেন। পরে পদত্যাগ করে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে গদর পার্টির সভ্য হন। পরে ভারত হতে ইংরেজ রাজত্বের চিরাবসানের ব্রত নিয়ে বিপ্লবের কাজে হাত দেন। এক সময় একটা বোমার মামলায় তাঁকে জড়িত করে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বিচারে রাজদ্রোহীতার অপরাধে তাঁর প্রতি মৃত্যু দণ্ডাদেশ দেওয়া হলো। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে আম্বালা সেন্ট্রাল জেলে তাঁর ফাঁসি হয়।

বিপ্লবী সুশীল চন্দ্র লাহিড়ী ছিলেন বারাণসীর বাসিন্দা। তিনি গুপ্ত সমিতির সভ্য হন এবং বারাণসী ষড়যন্ত্র মামলায় অংশ গ্রহণ করেন। বিনায়ক রাও নামে এক ব্যক্তিকে হত্যার অপরাধে পুলিশ তাঁকে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে গ্রেপ্তার করে। সেই সময় তাঁর কাছে দুটো রিভলবার এবং অনেক অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায়। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ডের জন্যে কোন রকম সঠিক প্রমাণ ছিল না তবু পুলিশ তাঁকে সন্দেহ বশে হত্যাকাণ্ডের দায়ে গ্রেপ্তার করে। বিচারে তাঁর প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ জারি হয়। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর

মাসে বন্দেমাতরম্ মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে এই বীর বিপ্লবী ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে যান।

আবার স্মরণ করি বিপ্লবী তারিণী প্রসন্ন মজুমদারকে। তিনিও কম বড় বিপ্লবী ছিলেন না। গুপ্ত সমিতির সদস্য ছিলেন। পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার এড়াবার জন্যে মাটির তলায় অনেকদিন আত্মগোপন করে থাকেন। কুমিল্লায় তাঁর বাড়ী পুলিশ ঘেরাও করলে তিনি একহাতে রিভলবার এবং অন্য হাতে পিস্তল নিয়ে পুলিশের ব্যূহ ভেদ করে পালিয়ে যান।

দ্বিতীয়বার কলকাতার ভবানীপুরের বাড়ীতে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করতে এলে তিনি দোতলা থেকে রাস্তায় লাফ দেন। ঐ সময় তিনি পায়ে আঘাত পান এবং খোঁড়া ভিখারীর অভিনয় করে পুলিশের হাত থেকে মুক্তি পান।

এরপর তারিণী প্রসন্ন ঢাকায় চলে যান। সেখানে কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকেন। পরে পুলিশ ঢাকরি ফলতা বাজার থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে গেলে তিনি পুলিশের সঙ্গে অস্ত্র বিনিময় করতে থাকেন। দু'পক্ষে কিছুক্ষণ ধবে প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলে। তারিণী প্রসন্ন ছিলেন একা আর তাঁর বিরুদ্ধে ছিল অসংখ্য পুলিশ। তাই তাঁর পক্ষে বেশীক্ষণ এই সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

শেষকালে আহত অবস্থায় আত্মসমর্পণ করেন তারিণী প্রসন্ন। পুলিশ তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। কিন্তু সেখানে তিনি একদিনও রইলেন না। যেদিন ভর্তি হয়েছিলেন ঠিক সেদিনই মারা গেলেন।

বিপ্লবী নলিনী বাগচীকেও স্মরণ করা যেতে পারে এই প্রসঙ্গে। ছাত্রাবস্থায় রাজনীতিতে যোগ দেন। পুলিশের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে বাঁকিপুর ও ভাগলপুর কলেজে পড়াশুনা করেন।

কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকেন যখন ইংরেজ পুলিশ তাঁর গতিবিধির ওপর তীব্র নজর রাখতে লাগলো।

আসামে অনেকদিন ছিলেন নলিনা বাগচী। সেখানকার বিপ্লবীদের ঘাঁটি পুলিশ আক্রমণ করে। তখন বিপ্লবীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়।

এই অবসরে বিপ্লবীদের মধ্যে কয়েকজন অন্যত্র চলে যান। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিপ্লবী নলিনী বাগচী।

পরে ঢাকায় ফলতা বাজাবের এক বাড়ীতে পুলিশের সঙ্গে গুলি-বিনিময় হয় এবং তিনি সাংঘাতিকরূপে আহত হন।

হাসপাতালে আহত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

এবার বিপ্লবী ত্রিকেন্দ্রজিতের প্রসঙ্গে আসা যাক। তিনি ছিলেন মণিপুরের মানুষ। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে মণিপুরের ইম্ফলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মহার্ঘচন্দ্র কীর্তি সিং। তিনি উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। হিন্দী ভাষায় ছিল অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। তিনি মণিপুর রাজ্যের যুবরাজ এবং প্রধান সেনাপতি ছিলেন। মণিপুব রাজ্য থেকে ইংরাজী প্রভুত্ব নষ্ট করার জন্যে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কিন্তু ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ধরা পড়েন। বিচারে তাঁর মৃত্যুদণ্ডা-দেশ দেওযা হয়। তাঁব বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসকদের অভিযোগ ছিল যে তিনি কয়েকজন ইংরেজ অফিসারকে হত্যা করেছেন এবং মণিপুর হতে ইংরেজ আধিপত্য নষ্ট করার জন্যে ষড়যন্ত্র করছেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ১৩ই আগষ্ট তারিখে তাঁব ফাঁসি হয়।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের পরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে নতুন প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের পরে ভারতায় জাতীয় মহাসভায় অর্থাৎ জাতীয় কংগ্রেসে নতুন প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে এদেশে হোমরুল আন্দোলন তরুণদের মনে প্রাণে নতুনভাবে সাড়া জাগাল। এই আন্দোলনের প্রবীণ নেতা হচ্ছেন তিলক কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন আইরিশ মহিলা আনি বেশান্ত।

আনি বেশান্ত আইরিশ দেশের মানুষ বলে তাঁর স্বাধীনতার স্পৃহা ছিল অত্যধিক। কারণ নিজের দেশের মানুষ ইংরেজদের কাছ থেকে স্বাধীনতা আদায় করবার জন্যে প্রাণপণে সংগ্রাম করে চলেছে। তাই বেশান্ত বুঝতে পারলেন ভারতবাসীদের সংগ্রামের গুরুত্ব। তাই তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতাদের উৎসাহ, সাহস ও শক্তি জোগাতে লাগলেন।

এই আন্দোলনে ইংরেজ সরকার অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু পরে এই আন্দোলনের প্রাবল্য খানিকটা নিস্তেজ হয়ে পড়লো কারণ তখন দেশের অনেক প্রবীণ নেতা স্বর্গারোহণ করেছেন। যারা বেঁচে ছিলেন তাঁরা জাতিকে ঠিক ঠিক নেতৃত্ব দিতে অক্ষম।

সুতরাং জাতীয় সভা বা কংগ্রেসের অবস্থা তখন অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠলো।

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় কংগ্রেসের সেই সঙ্কট কেটে গেল যখন দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নেতা জয়তিলক পরে ভারতে ফিরে এসে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। এই নেতা হচ্ছেন আমাদের চিরপরিচিত জাতির জনক মহাত্মা মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধী।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দ।

কংগ্রেসের মধ্যে সুরু হলো নব জাগরণ।

কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো লখনৌতে। এই অধিবেশনে তিন হাজারের ওপর প্রতিনিধি যোগদান করেন।

এই অধিবেশনে একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটলো। দীর্ঘকালের সমস্যার একটি বিধিবদ্ধ রূপ পেল। অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান মিলনের পথে যে অন্তরায় ছিল তা এতদিনে দূর হয়ে গেল।

হিন্দু-মুসলমান মিলনের পথ সুগম হলো। এতকাল মুসলিম নেতৃবৃন্দ নিজেদের আলাদা করে রেখেছিলেন ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন হতে। এবার তাঁরা যোগ দিলেন ঐ আন্দোলনে। মিঃ

জিন্না, আবদুল রসুল প্রভৃতি স্বনামধন্য মুসলমান নেতারা কংগ্রেসে যোগ দিয়ে হিন্দু-মুসলমান মিলনের পথ সুগম করে দিলেন। এই সঙ্গে কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণ ও বামপন্থী নেতাদের মিলনও সার্থক হলো।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দ। কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো দিল্লীতে। এবারকার অধিবেশনে সভাপতি হলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য। এরই চেষ্টায় কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই অধিবেশনে মণ্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার অগ্রাহ্য করা হলো এবং স্বায়ত্ত শাসনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

এই বছরেই হোমরুল আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লো আব সরকারও এই আন্দোলন দমন করবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন।

আনি বেশান্তের দু'খানি কাগজ বাজেয়াপ্ত করা হলো। সেই সঙ্গে তাঁকে অন্তরীণও করা হলো।

তিলক ও বিপিনচন্দ্র পালকে ভারতের কয়েকটি জায়গায় প্রবেশ করতে নিষেধ করা হলো।

এই কঠোরতার ফলে কংগ্রেসের আন্দোলন আরও তীব্র আকার ধারণ করলো।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দ।

কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো কলকাতায়। এবারকার অধিবেশনে সভানেত্রীর পদ গ্রহণ করেন আনি বেশান্ত।

এই অধিবেশনে পাঁচ হাজারের ওপর প্রতিনিধি যোগ দেন।

এই অধিবেশনে প্রথম জাতীয় পতাকা হিসাবে একটি পতাকা উত্তোলন করা হয়।

এতদিন কংগ্রেসের বিশেষ কোন পতাকা ছিল না। এবার তাই সম্ভব হলো।

হোমরুল লীগের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা ছিল। সেটাকেই জাতীয় পতাকারূপে গ্রহণ করা হলো।

এই পতাকায় পরে চরকা যোগ করা হয়। এর পর স্বাধীন ভারতে পতাকায় চরকার জায়গায় অশোক চক্র চিহ্নিত করা হলো।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা হলো চম্পারণ বিদ্রোহ। বিহারের চম্পারণ জেলায় নীলের চাষ হতো। সেখানকার নীলকর সাহেবরা চাষীদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাতো। তার প্রতিবাদ স্বরূপ চাষীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সে বিদ্রোহ সরকার কঠিন হাতে দমন করেন।

চাষীদের হয়ে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন মহাত্মা গান্ধী।

তাই লক্ষ্য করে ইংরেজ সরকার প্রমাদ গুনলিন। তখন গান্ধীজীকে সাদরে আহ্বান জানিয়ে সরকার একটি কমিশন বসান।

এই কমিশনের মাধ্যমে চাষীদের ওপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচার দমন করা হয়।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দ। নভেম্বর মাস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলো। এই যুদ্ধ বাঁধে ইংরেজের সঙ্গে জার্মানীর। এই যুদ্ধে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতাদের কথামত্ ভারতবর্ষ টাকাকড়ি ও সৈন্য দিয়ে ইংরেজদের সাহায্য করেছিল। নগদ আর জিনিষ পত্র মিলিয়ে ইংরেজ সরকারকে দেওয়া হয়েছিল এক হাজার কোটি টাকা।

পনেরো লক্ষ ভারতবাসী মিত্র পক্ষের হয়ে এই যুদ্ধে লড়েছিল। প্রাণ দিয়েছিল এক লক্ষের মত ভারতবাসী। স্বয়ং গান্ধীজী ভারত-বাসীদের সাদর আহ্বান জানিয়েছিলেন এই যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য। কারণ তাঁর ধারণা ছিল, এভাবে ইংরেজ সরকারকে তাঁদের বিপদের দিনে সাহায্য করলে তার পুরস্কার স্বরূপ তাঁরা যুদ্ধশেষে ভারতবাসীদের স্বাধীনতা দেবে।

যুদ্ধ শেষ হলো। কিন্তু ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে তেমন কোন সাড়াশব্দ মিললো না। তখন নেতৃবৃন্দ হতাশ হলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হলো। যুদ্ধের সময় বিপ্লবীদের দমন করবার জন্যে তৈরী হয়েছিল ভারত-রক্ষা আইন। এই আইনের বলে বহু লোককে বিনাবিচারে জেলে পুরে রাখা হয়েছিল।

এখন যুদ্ধ শেষ হওয়াতে ভারত-রক্ষা আইনের মেয়াদও চলে গেল।

ইংরেজ সরকার দেখলেন, যুদ্ধ শেষ হলে কি হবে ভারতবর্ষের চারদিকে দানা বেঁধে উঠছে স্বাধীনতা আন্দোলন। এই আন্দোলনকে দমন করতে হলে ভারত-রক্ষা আইনের অনুরূপ আর একটি আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক।

এই উদ্দেশ্যে নতুন একটি আইন প্রবর্তিত হলো। তার নাম রৌলট আইন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এই আইন চালু হলো।

ইতিমধ্যে মডারেটপন্থীরা কংগ্রেস ত্যাগ করে চলে গেছেন। তাই কংগ্রেস এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন।

কিন্তু সে প্রতিবাদে কোন ফল হলো না।

মহাত্মা গান্ধী স্থির করেছিলেন যে, এই আইন পাশ হলে তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করবেন।

তাঁর কথামত কাজও হলো।

১লা মার্চ, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কুখ্যাত রৌলট আইন পাশ হলো। গান্ধীজী ৬ই এপ্রিল সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থরু করলেন। সেদিন সারা দেশে হরতাল আহ্বান করা হলো। সভা-সমিতি করে এই কুখ্যাত আইনকে ধিক্কার জানানো হলো।

গান্ধীজীর ডাকে আসমুদ্র হিমাচল কেঁপে উঠলো। কিন্তু সে সময় জনতার মধ্যে যে রকম সাড়া আশা করা হয়েছিল আসলে ততখানি সাড়া পাওয়া গেল না। দিল্লী ও কলকাতায় উত্তেজিত জনতার সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয় এবং এর ফলে বেশ কয়েকজন প্রাণ হারান।

দিল্লীতে যাঁরা পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন রাম সিং, চন্দ্রভান, গোপীনাথ, রামচাঁদ, হাসমল উল্লা খান, রামকৃষ্ণণ, আবদুল গণি এবং রামলাল।

এই আন্দোলন প্রসঙ্গে ভারতে জাতীয় আন্দোলন-এর কাহিনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : 'রৌলট বিল লইয়া যখন দেশময় কাগজেপত্রে আলোচনা চলিতেছে তখন গান্ধীজী ঘোষণা করিলেন, রৌলট আইন ভারতীয়দের ন্যায়সম্মত অধিকার ও মানুষের জন্মলব্ধ স্বাভাবিক স্বাধীনতাব পরিপন্থী; অতএব যতদিন এই অসঙ্গত ও অপমানজনক আইন ভাবত সরকার প্রত্যাহার না করিবেন ততদিন আমরা সম্মিলিতভাবে এই আইন মানিতে অস্বীকার করিব। তবে শাসক ও শাসিতের এই বিরোধে আমরা নিরুপদ্রব প্রতিরোধপন্থা গ্রহণ করিব।' ইহাই সত্যাগ্রহের প্রথম আবেদন।

'গান্ধীজী আহমদাবাদের নিকট সবরমতীতে থাকেন; তিনি বোম্বাই গিয়া সরকারেব নিষিদ্ধ পুস্তক বিক্রয় করিয়া আইন ভঙ্গ করিলেন; এবং ৩০শে মার্চ, পরে তারিখ পরিবর্তন করিয়া ৭ই এপ্রিল ভারতের সর্বত্র 'হরতাল' প্রতিপালনের আহ্বান করিলেন। 'হরতাল' কি, কি ভাবে তাহা উদযাপন করিতে হইবে ইত্যাদি সম্বন্ধে জনতার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না; নানা লোকে নানাভাবে ইহার অর্থ করিয়া লইল। গান্ধীজীর নির্দেশ ছিল লোকে সেদিন উপবাস কবিবে এবং দোকানপাট বন্ধ করিবে। ৩০শে মার্চ দিল্লীতে ও পাঞ্জাবের কোন কোন জায়গায় হরতাল পালিত হইল। কিন্তু সত্যাগ্রহের জন্য যে সংযম প্রয়োজন, সে-শিক্ষা তখনও সাধারণ জনতা পায় নাই। এছাড়া এই-সব আন্দোলনের সময়ে দুর্বৃত্ত শ্রেণীর লোকে সমাজজীবনে বিশৃঙ্খলা আনিবার জন্য সদাই তৎপর হয়। যাহারা হরতাল পালন করিতে অসম্মত হয়, তাহাদের ওপর জুলুম-জবরদস্তি করিয়া হাঙ্গামার সৃষ্টি চলে। পুলিশের গোপন সাহায্যপুষ্ট এক শ্রেণীর লোক বরাবরই উপদ্রব সৃষ্টি করিবার জন্য প্রস্তুত তাহারাই

আসলে হাঙ্গামার উদ্‌বোধক ও প্ররোচক। তবে সাধারণ জনতার মধ্যেও উদ্ধত ও আস্ফালনকারী লোকের অভাব ছিল না। দিল্লীর হরতাল শান্ত নিরুপদ্রব থাকে নাই পুলিশ ও জনতার মধ্যে সংঘর্ষ হইলে পুলিশের গুলিতে আটজন লোক নিহত ও বহু লোক আহত হইল। গান্ধীজীর সেদিনকার শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ সফল হইল না সত্য, কিন্তু এই কথাটি সেদিন স্পষ্ট হইল যে, সাধারণ জনতাকে রাজনৈতিক কর্মে নিযুক্ত করা যাইবে, জাগ্রত জনতার দ্বারাই বিপ্লব সম্ভব। এতদিন মুষ্টিমেয় ছাত্র, ড্রইংরুমে বিলাসী রাজনৈতিক নেতাদের অনুবর্তী হইয়া অ্যাজিটেশন চালাইতেছিল, এখন গান্ধীজীর নূতন পদ্ধতি অনুসারে জনতা রাজনীতিতে যোগদান করিল। কিন্তু জনতার ধর্মশিক্ষা ও সংযমশিক্ষা তখনো হয় নাই, তাই প্রথম দিকে জনতার প্রচেষ্টা হাঙ্গামা আস্ফালনে পরিণত হইয়াছিল।'……

দিল্লীর সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবেও এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লো। ইতিমধ্যে পাঞ্জাবে ইংরেজদের অত্যাচার নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পাঞ্জাবের ছোটলাট স্যার মাইকেল ও ডায়ার যেরকম জুলুম করে সৈন্য ও অর্থ আদায় করেছিলেন সেকথা পাঞ্জাবীরা তখনো পর্যন্ত ভোলেনি। এর ওপর আছে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা ও কেমোগাটামারু আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ইংরেজ শাসকদের পাঞ্জাব-বাসাদের ওপর বর্বরতাপূর্ণ অত্যাচার।

এর ওপর তখন আর একটি গুজব পাঞ্জাবীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। গুজবটি এই, ডাঃ কিচলু ও সত্য পালকে ডেপুটি কমিশনার তাঁর গৃহে আহ্বান করে নিয়ে গিয়ে সরাসরি অন্তরীণ করেছেন। এর সঙ্গে আছে গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের গুজব।

এইসব মিলে পাঞ্জাবীদের মনে অসন্তোষ তীব্র আকার নিলো।

ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ভাবলেন, পাঞ্জাবে বুঝি এবার দ্বিতীয় সিপাই বিদ্রোহ দেখা দেবে। তাই সরকার পক্ষ থেকে আগে থাকতে সতর্ক থাকবার সমস্ত আয়োজন ভেতর ভেতর চলতে লাগলো।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দ। ১৩ই এপ্রিল। রবিবার। বৈশাখী পূর্ণিমা।

এইদিনে অমৃতসরে একটি মেলা বসে। অনেকে বলেন, পুলিশের গুপ্তচর হংসরাজ চারদিকে ঘোষণা করে যে ঐদিনে জালিয়ানওয়ালা-বাগে জনসভা হবে।

নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বাগে জামায়েত হলেন ২৩।২৪ হাজার মানুষ।

বাগের চারদিক প্রাচীর বেষ্ঠিত। প্রবেশের জন্যে একটি মাত্র পথ ছাড়া চার-পাঁচটি ফাঁক ছিল প্রাচীরের গায়ে। সেই সব ফাঁক দিয়েও যাওয়া যেত।

সরকার পক্ষায়রা বলেন যে সভা নিষেধ করে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়েছিল। লোকে জোর ও জিদ করে সমবেত হয়।

সভার কাজ আরম্ভ হবার আগে একখানি এরোপ্লেন ওপর দিয়ে উড়ে গেল।

তাই দেখে সমবেত জনতার মধ্যে আশঙ্কা ও চাঞ্চল্য দেখা গেল।

সেই সময় গুপ্তচর হংসরাজ উত্তেজিত জনতাকে আশ্বস্ত করে বক্তৃতা দিতে লাগলো।

ইতিমধ্যে জেনারেল ডায়ার ২৫ জন রাইফেলধারী শিখ, ২৫ জন গুর্খা ও ৪০ জন খুকরীধারী সৈন্য ও একটি ছোট কামান-গাড়ি নিয়ে বাগের প্রবেশ মুখে এসে উপস্থিত হলেন।

বাগের ভেতর একটা টিলার ওপর সৈন্যরা উঠে গেল আর ভীড় যেখানে ঘন জেনারেল ডায়ার সেই জায়গা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে বললেন।

গুলি ছোঁড়বার আগে জনতা বে-আইনি ঘোষণা করা হয়নি।

১৬৫০ টি টোটা ছোঁড়া হলো। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে এই বাগের মধ্যে তিনশোর বেশী মানুষ মারা গেলেন। আহত হলেন হাজারখানেক।

বেসরকারী তদন্ত কমিটির মতে সেদিন ঐ বাগে জেনারেল ডায়ারের আদেশে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী এক হাজারেরও বেশী পাঞ্জাবীকে হত্যা করে

ঐ বাগে সেদিন যাঁরা বীর শহীদের মত অত্যাচারী বৃটিশ সৈন্যের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন ঃ বাওয়া সিং, বেটি রাম, ভাগ, ভাগ, কম্ভো ভাগ, মল ভাগ, মল ভাগ, (২) ভগৎ, ভগবৎরাম, ভগৎরাম (১) ভগৎ সিং, ভগৎ সিং (২), ভগবান, ভগবান দাশ, ভগবান ধনে, ভগবান শাহ, ভেরু ভীমরাজ, ভীমরাজ (২), বিষাণ দাশ, বিষাণ দাশ(২) বিষাণ দাশ (৩) বিষাণ দাশ (৪) বিত্ত, বোধি, ভূরা মল, ব্রেভদয়াল, বুয়া দাশ, বুয়া দিত্ত, বুধ সিং (১), বুধ সিং (২) বুধ সিং (৩) বুধ সিং (৪) বুর সিং, চমন লাল, চন্নন, চরগদিন, চরণ দাস (১), চরণ দাস (২) চরণজী লাল, ছেটরাম, চুণি লাল, চুণি লাল, মণ দাস, দৌলত রাম (১) দৌলত রাম (২) দয়ারাম, দেবী চাঁদ, দেবী দয়াল, দেবী দিত্ত, ধর্ম নন্দ, ধেরু সুন্দর, ধীরু, ধার্ত্তরাম, দিত্ত মল, তুর্গা দাস, দ্বারিকা দাস, দয়াল সিং, ফকির চাঁদ, ফালা, ফতে মহম্মদ, ফজল, ফিরোজদিন, ফিড্ডো, গণ্ডা সিং, গাণ্ডু, গণেশ সিং, গঙ্গা সিং, গান্ধু লাল, ঘুলারাম, গুলম মহম্মদ, গুলম মহিউদ্দীন, গুলম রসুল (১) ঘুলম রসুল (২), জ্ঞান চাঁদ (১), জ্ঞান চাঁদ (২), জ্ঞান চাঁদ (৩) জ্ঞান চাঁদ (৪) জ্ঞান চাঁদ (৫), জ্ঞান চাঁদ (৬), জ্ঞান চাঁদ (৭), জ্ঞান চাঁদ (৮), গিরধারী লাল, গোবিন্দ রাম, গোকাল চাঁদ (১) গোকাল চাঁদ (২), গোপাল দাস, গোপাল সিং (১), গোপাল সিং (২), গৌরী শঙ্কর, হামিদ, হংসরাজ (১) হংসরাজ (২), হরকদাউর, হর নারায়ণ, হরপ্রসাদ, হরকাসলাল হরদয়াল, হরিরাম (১), হরিরাম (২), হরিরাম (৩), হরিরাম (৪) হরনাম, হরনাম দাস, হরনাম সিং (১), হরনাম সিং (২), হরনাম সিং (৩), হরনাম সিং (৪), হরনাম সিং (৫), মহম্মদ হোসেন, হাসি, হাজারিলাল, হিরালাল, হিরানন্দ, (১), হিরানন্দ (২), হিরা সিং হুকাম, হুকুম চাঁদ, হুকাম সিং, ইব্রাহিম, ইলম দিন, ইমাম দিন, ইন্দার সিং, ইসার সিং, ইস্‌মাইল, (১), ইসমাইল, জগননাথ, (১), জগননাথ (২), জয় চাঁদ, জয় নারায়ণ, জহর সিং, জয়ালা সিং, জয়ান্দ সিং, মহন চাঁদ, কাকা সিং, কালা সিং (১), কালা সিং (২), কালা সিং (৩), কালা সিং

(৪), কালকা চাঁদ, কান্সীরাম, (১), কান্সীরাম (২), কান্সীরাম (৩), করম চাঁদ (১), করম চাঁদ (২), করম চাঁদ (৩), করম দিন, করিম বক্স, কর্তার সিং, কেহার সিং (১), কেহার সিং (২), কেহার সিং (৩) কেহার সিং (৪) কেশব সিং, খয়ের দিন, খুদা বক্স, কুশক সিং, কুশল সিং, খুশীরাম (১), খুশীরাম (২), কৃপারাম, কৃপাল সিং, কিষাণ চাঁদ, কিষণ লাল, লাভা, লাভারাম, লাভু, লাভু মাল, লছমন সিং (১) লছমন সিং (২) লছমন সিং (৩), লাল সিং, লোহনা সিং, মদন মহন, মাধো, মোহনা, মহারাজ দিন, মহি, মানা, মানক চাঁদ, মঙ্গল দাশ, মঙ্গলরাম, মঙ্গল সিং, মণিলাল, মণিরাম, মনসারাম, মাস্থু মাল, মেহের চাঁদ, নিক্কু মেহেরা, মেলারাম, মেরা বক্স, মেষাব শাহ, মেওয়া সিং, মহম্মদ দিন, (১) মহম্মদ দিন (২), মহম্মদ ইসমাইল, মহম্মদ রমজান, মহম্মদ সাদিক, মহম্মদ সাফি (১), মহম্মদ সাফি (২), মহম্মদ শরিফ মোহনলাল (১), মোহনলাল (২), মোহনলাল (৩), মোহন সিং, মূল সিং, মোতিরাম (১), মোতিরাম (২), মোতিরাম (৩) মহম্মদ বক্স, মুল সিং, মুন্সান, মুলকরাজ (১), মুলকরাজ (২) মূলকরাজ (৩), মুণিলাল (১), মুণিলাল (২), মুণিলাল (৩), মুণিলাল (৪), মুন্সা, মুন্সীরাম (১), মুন্সীরাম, (২) মুরলী মাল, মুসা, নানক, নানক চাঁদ (১) নানকচাঁদ (২), নন্দ, নন্দলাল (১), নন্দলাল (২), নানকু, নরেন সিং, (১) নরেন সিং (২), নরসিং দাশ, নাথা সিং (১), নাথা সিং, (২) নাথো, নাথু (১), নাথু (২), নাথু (৩), নাথু মাল, নিহাল চাঁদ, নিহাল সিং, নিক্কা, নিক্কা মাল, নিক্কারাম, নিক্কু মাল, নুর মহম্মদ (১), নুর মহম্মদ (২), পালা, পাল্লা, পান্না, পারমন, পরমানন্দ (১) পরমানন্দ (২) পপলো, প্রভ দয়াল, প্রভদিয়াল, পতাপ সিং, প্রেম সিং, রাজু, রামা মাল, রাম চাঁদ (১) রাম চাঁদ (২) রাম চাঁদ (৩), রামধন, রামগোপাল, রামলাল, রামলাল রাজপুত, রামনাথ (১) রামনাথ (২) রামনাথ (৩) রামশরণ রামশরণ দাস, রাম সিং, রামজান, রসুলা, রেমৎ, রুকন দিন, সাধু রাম, দয়ালসাহেব, সালিগরাম ভগৎ, সন্তরাম, সন্ত সিং, সামস দিন, সরফ দিন,

শের সিং, শোভা সিং (১) শোভা সিং (২) শোভা সিং (৩) সহনলাল, সহন সিং (১) সহন সিং (২) সজন সিং, সুন্দর সিং, (১) সুন্দর সিং (২) সুন্দর সিং (৩), সুন্দর সিং (৪) সুন্দর সিং (৫) সুন্দর সিং (৬) সুরেন সিং, সুর্জন সিং (১) সুর্জন সিং (২) তারা চাঁদ, তারা সিং, তারলোক নাথ, থাকুর দাস (১) থাকুর দাস (২) থাকুর দাস (৩) থাকুর সিং (১) থাকুর সিং (২) ত্রিলোকনাথ, উজগর সিং (১) উজগর সিং (২) উমার বেহি, উমার বক্স, উমার দিন, বিষ্ণু, বরস, বসুমাল, ভিরো (১) ভিরো (২), ভিরু (১) ভিরু (২), ওয়েষো দাশ, ওয়ারিশ, ওয়াজমল, ওয়াজুমল, আবদুল করিম (১) আবদুল করিম (২), আবদুল খালিক, আবদুল মজিদ (১) আবদুল মজিদ (২) আবদুলিয়া, আবদুল্লা, আহম্মদ দিন, দীন আমেদ (১) দীন আমেদ (২) আমেদ খান, আমেদ উল্লা, আলাবক্স, আলা দিত্তা, অমর সিং, আমিন চাঁদ, কন্যা সিং অরোরা, পীরটব অরোরা, অরু মল, অরুরা, আশা সিং, আশানন্দ, বাবুরাম, বাগতা, বিষ্ণু দাস, বালিয়া মারওয়ারী, বালমোকন্দ (১) বালমোকন্দ (২) বলবন্ত সিং, বরকত, বরকত আলি, এবং বসন্ত।

এত লোক যে হতাহত হলো সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই জেনারেল ডায়ারের। তিনি ফিরে এলেন নিজের জায়গায়।

এরপর পাঞ্জাবে জারি হয় সামরিক আইন। লোকজনের ওপর চললো অকথ্য অত্যাচার।

এর পরিণামও হলো সাংঘাতিক। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই অনাচারের প্রতিবাদে ইংরেজপ্রদত্ত 'স্যার' উপাধি বর্জন করে তদানীন্তন ভারতের বড়লাটের কাছে একটি প্রতিবাদ পত্র পাঠান।

প্রবাসীর সম্পাদক ও প্রখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর পত্রিকায় লিখলেন:

'পাঞ্জাবে ঠিক যে কি হইয়াছে এবং কি কারণে হইয়াছে, তাহা বিস্তারিতভাবে জানিবার উপায় নাই। কারণ সরকারী সেনসরের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো খবর প্রকাশিত হইতে দেওয়া হয় নাই।

ফলে কেবল পাঞ্জাবের এ্যাংলো-ইন্‌ডিয়ান কাগজের খবর এবং সরকারী কর্মচারীদের দেওয়া খবরই দেশে প্রচারিত হইয়াছে; ভিন্ন প্রদেশের লোককে পাঞ্জাবে যাইতে দেওয়া হয় নাই, কিন্তু ভিন্ন প্রদেশের কোন কোন এ্যাংলো-ইনডিয়ান সংবাদাতা পাঞ্জাবে যাইতে পাইয়াছে। পাঞ্জাবে সামরিক আইন অনুসারে যাহাদের বিচার হইয়াছে তাহারা অন্য প্রদেশ হইতে নিজেদের উকিল-ব্যারিস্টার লইয়া যাইতে পায় নাই; পাঞ্জাব হইতে যাহারা বাহিরে আসিয়াছে, তাহারা কোনো চিঠিপত্র লইয়া যাইতেছে কি না দেখিবার জন্য কোনো রেলওয়ে স্টেশনে তাহাদের থানা-তল্লাসী হইয়াছে; পাঞ্জাব হইতে যাহাতে ডাকযোগে কেহ বাহিরের কোনো কাগজে খবর দিতে না পারে তাহার চেষ্টাও হইয়াছে; যদিও তাহা সত্বেও কিছু কিছু বে-সরকারী সামান্য খবর বাহির হইয়াছে ও গুজব রটিয়াছে, তাহা হইতে পাঞ্জাবে যেসব কাণ্ড ঘটিয়াছে, তৎসম্বন্ধে লোকের একটা মোটামুটি ধারণা হইয়াছে। এই অবস্থায়....রবীন্দ্রনাথ....ভারতের গবর্ণর জেনারেল লর্ড চেম্‌স্‌-ফোর্ডকে চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন।

গান্ধীজী গ্রেপ্তার হলেন। ফলে ভারতবর্ষের চারদিকে দেখা গেল বিদ্রোহ।

এই প্রকার অশান্তির মধ্যে গান্ধীজী তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রাখলেন।

পাঞ্জাবের ঘটনা নিয়ে সরকারী ও বেসরকারী তদন্ত হয়।

বেসরকারী তদন্ত হয় কংগ্রেসের উদ্যোগে। কংগ্রেসের তদন্তে পাঞ্জাবের এই নারকীয় ঘটনার জন্যে দায়ী করা হলো বড়লাটকে।

ডায়ার চলে গেলেন বিলেতে। সেখানে গিয়ে তিনি রাজসম্মান লাভ করেন। ইংরেজদের ধারণা হলো যে ডায়ার ভারতে সিপাই-বিদ্রোহ-এর মত বিপ্লব দমন করেছেন।

এই বছর লণ্ডনে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিফর্ম আইন পাশ হলো।

এতে করে এদেশীয় নেতাদের দাবীর কাছে বিজাতীয় সরকারের মাথা নত করতে হলো। এই শাসনসংস্কার একটা ভাঁওতা মাত্র। এতে করে কংগ্রেসের সত্যিকার দাবী মেনে নেওয়া হয়নি। কংগ্রেসের ব্যাপক-ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্যে এই আইন পাশ করা হয়েছিল।

এদেশীয় নেতৃবৃন্দ ইংরেজের ঐ চাল বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তাঁরা এখন থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার করে তুললেন; এতদিন কংগ্রেসের আন্দোলন ওপর মহলে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন তা জনে জনে বিস্তার লাভ করলো।

এই বছরের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো তিলকের মৃত্যু।

এই বছরে অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। এতে যোগ দেন ৩৬ হাজার দর্শক। এর দ্বারা প্রমাণিত হতে লাগলো যে কংগ্রেসের প্রতি জনসমর্থন দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে।

১৯২০ খৃষ্টাব্দ। এই বছরে প্রকাশ পেল খিলাফৎ আন্দোলন; এই আন্দোলনে ইসরাইল আল্লারাখা নামে জনৈক মহারাষ্ট্রীয় মুসলমান ইংরেজ পুলিশের হাতে বন্দী হন। তিনি বোম্বাইয়ের একটি মদের দোকানের সামনে পিকেটিং করছিলেন। পুলিশ এসে বাধা দিলে তাঁর সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। ফলে একজন পুলিশ কনষ্টেবল মারা যায়।

বিচারে আল্লারাখার ফাঁসির আদেশ হয়। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই তারিখে আল্লারাখার ফাঁসি হলো জারবেদা জেলে।

এই আন্দোলনে আর একজন মহারাষ্ট্রীয় মুসলমান প্রাণ হারান। তাঁর নাম আবদুল গাফর মহম্মদ। তিনি ছিলেন কুস্তিগীর। পুলিশের সঙ্গে তাঁর প্রবল দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়। এর ফলে জনৈক কনেষ্টবল খুন হয়। তিনি গ্রেপ্তার হন। বিচারে তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী তারিখে তাঁর ফাঁসি হলো।

এই আন্দোলনে আর একজন মহারাষ্ট্রীয় মুসলমান পুলিশের হাতে

অত্যাচারিত হন। তিনি ছিলেন জাতিতে তাঁতি। তাঁর নাম আবদুল্লা খলিফা। তিনি মদের দোকানের সামনে পিকেটিং করেন। পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার দায়ে গ্রেপ্তার হন। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে একজন পুলিশ মারা যায়। তাঁকে তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হলো। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে বিশাপুর জেলে পুলিশের অকথ্য অত্যাচারের ফলে মারা যান।

এই খিলাফৎ আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের উপায় স্থির করলেন। এরপর কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে এবং নাগপুরে কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী উত্থাপন করেন। কংগ্রেসের মঞ্চ হতে তা সমর্থন করেন।

খিলাফৎ আন্দোলনে হিন্দুদের যোগদান প্রসঙ্গে প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: '১৯২০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর কলিকাতায় কনগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে প্রধানতঃ এই চারটি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা হইল—পাঞ্জাবের অত্যাচারের প্রতিবাদ, খিলাফৎ আন্দোলনে হিন্দুদেরও যোগদান, শাসন সংস্কারের অসারত্ব ও অসহযোগ আন্দোলন। প্রথম তিনটি বিষয়ের প্রতিবিধান ও প্রতিকারের জন্য অসহযোগ আন্দোলন হইবে সংগ্রামের অস্ত্র। ১৯১৯ সালে মার্চ মাসে রৌলট আইন পাশ হয়—তাহার দেড় বৎসর পর অসহযোগনীতি গৃহীত হইল। কেমন করিয়া গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগ বর্জন করিয়া দেশকে সবল করা যাইবে সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার পর স্থির হইল যে, বর্জননীতির সোপানগুলি যথাক্রমে এইরূপ হইবে: (১) সরকারী খেতাব ও অবৈতনিক চাকুরি ত্যাগ করা (২) সরকারী লেভী, দরবার প্রভৃতি ব্যাপারে যোগ না দেওয়া; (৩) সরকারী স্কুল-কলেজ বা সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয় সমূহ ত্যাগ করা ও নূতন জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন (৪) উকীল প্রভৃতিদের সালিশী কাছারি গঠন (৫) সামরিক জাতিগণের, কেরাণীগণের ও মজুরগণের মেসোপটেমিয়ায়

চাকুরি গ্রহণে অস্বীকার। (৬) নূতন ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন ত্যাগ করা। কংগ্রেসের অনুরোধ সত্বেও যাঁহারা নির্বাচন-প্রার্থী হইবেন, ভোটদাতারা তাঁহাদের ভোট দিবেন না।

'ইতিপূর্বে গান্ধীজী এক ইস্তাহারে ঘোষণা করেন পহেলা আগষ্টের (১৯২০) মধ্যে ব্রিটিশ সরকার যদি খিলাফৎ সম্বন্ধে সুবিচার না করেন, তবে তিনি দেশকে অসহযোগের জন্য আহ্বান করিবেন। গত বৎসর সত্যাগ্রহ আন্দোলন যে গান্ধীজী বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার কারণ, প্রায়ই হরতালাদি ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া বিবাদ বাধিত হিন্দু অসহযোগী ও মুসলমান অসহযোগ বিরোধীদের মধ্যে। ফলে পদে পদে সত্যাগ্রহ বিপর্যস্ত হইত। এখন মুসলমানদের দলে পাইবেন এই ভরসায় খিলাফৎ আন্দোলনের ন্যায় একটা অলীক, সাম্প্রদায়িক ও রাষ্ট্রবহির্গত ব্যাপারে হিন্দুদের লিপ্ত করিলেন। তবে তাঁহার ভরসা স্বভাব-সংঘবদ্ধ মুসলমানদের পাইলে ব্রিটিশদের জব্দ করা সহজ হইবে—তাঁহার দাবি পূরণ হইতে পারে। তুর্কীর সমস্যাটাকে রাজনীতিব দিক হইতে না দেখিয়া বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গোঁড়ামির দিক হইতে বিচার করিলেন; সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধতাকে প্রশ্রয় দিয়া গান্ধীজী ভারতের রাজনীতির মধ্যে ধর্মকে আনিয়া ফেলিলেন। সেটি তাঁহার ইচ্ছাকৃত নহে নিশ্চয়ই—তবে তাহার ফল হইল বিষময়। আরও আশ্চর্যের বিষয়, গান্ধীজী যে খিলাফৎ আন্দোলনে হিন্দুকে যোগদান করিবাব জন্য উত্তেজিত করিতেছিলেন কিছুকাল পরে সেই সুলতানের পদ তুর্কীরাই নাকোচ করিয়া দিল। ধর্মগুরু 'খলিফা'র পদই উঠাইয়া দিল এবং তাহার পরিবর্তে শাসন- সংবিধান গঠন করিল আধুনিক ভাবে। তুর্কীদেশে যখন 'সুলতান-খলিফার বিরুদ্ধে মুসলমান প্রজারাই জোর আন্দোলন চালাইতেছে—ঠিক সেই সময়ে ভারতের হিন্দুদের উপর আদেশ হইল মুসলমান ধর্মের একটি মধ্যযুগীয় ব্যাপারকে সমর্থন করিবার জন্য। খিলাফৎ আন্দোলনকে 'ন্যাশনাল' বা ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সহিত মিশাইয়া ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনীতিকে জটিল

করিয়া তুলিবার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে গান্ধীজীর। আশু রাজনৈতিক ফল লাভের আশায় মধ্যযুগীয় ধর্মমূঢ়তায় ইন্ধন দিলে যাহা অতি অবশ্যম্ভাবী পরিণাম তাহাই হইল ভারতের ভাগ্যে। এক দিকে মুশলিম লীগ উগ্র, অপর দিকে হিন্দুমহাসভা প্রবল হইয়া উঠিল; কোনোপক্ষই কাহাকেও সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে।'

১৯২১ খৃষ্টাব্দ। ভারতীয় রাজনীতিতে এলো একযুগান্তকারী পরিবর্তন। এতদিন কংগ্রেস কেবল আলাপ-আলোচনা ও আবেদন নিবেদনের মধ্যে তাদের কর্মগতি সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। এখন থেকে তার কর্মপদ্ধতি অন্যদিকে মোড় নিলো। এখন কংগ্রেস ছড়িয়ে পড়লো জনতার মাঝে। এখন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করলো কংগ্রেস।

মহাত্মা গান্ধীই কংগ্রেসকে নিয়ে এলেন জনতার মাঝখানে। এই মহা জাতীয় প্রতিষ্ঠানে বাবু থেকে মুটে-মজুর পর্যন্ত সকলেই যোগ দিল। শুধু তাই নয় তখনকার দিনে অনেক নামকরা মানুষ— অভিজাত পরিবারের সদস্য এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করলেন। গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের নামে সকলের মনে বল, আত্মবিশ্বাস ও সাহস সঞ্চার করলেন।

চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহেরু তাঁদের ব্যারিষ্টারী ও ওকালতি ব্যবসা ছেড়ে চলে এলেন কংগ্রেসে। বিহার থেকে এলেন ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, বোম্বাই থেকে এলেন সর্দার প্যাটেল, আসাম থেকে এলেন নবীনচন্দ্র বরদলুই আর তরুণরাম ফুকন। এছাড়া আরও অনেক দেশ-প্রেমিক এলেন।

পুরুষের সঙ্গে মেয়েরাও এলেন। আলী ভাইদের বীর জননী আম্মাবাঈ ছেলেদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। মহাত্মা গান্ধীর স্ত্রী কস্তুরবা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্ত্রী বাসন্তী দেবী এবং বিখ্যাত বাগ্মী সরোজিনী নাইডু এলেন কংগ্রেসের কাজে।

দেশব্যাপী চললো বিরাট সংগ্রাম। একে মহাসংগ্রামও বলা যেতে পারে। কারণ এই সংগ্রামে সমাজের সকল শ্রেণীর এবং পদের মানুষই যোগ দেন।

আর এ ছিল এক অদ্ভুত সংগ্রাম। একদিকে শক্তিশালী ইংরেজ সরকার। তার কত অস্ত্রশস্ত্র এবং সৈন্য। আর অন্যদিকে নিরস্ত্র কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবকদল। তাঁদের হাতে কোন অস্ত্র ছিল না। তাঁরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেননি। তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন অসহযোগ আন্দোলন। এর দ্বারা তাঁরা জানালেন, ইংরেজদের সঙ্গে তাঁরা কোন ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন না। এর জন্যে শাসকরা যদি তাঁদের ওপর গুলি চালায় সেও আচ্ছা তবু তাঁরা অহিংস সংগ্রাম পরিত্যাগ করবেন না।

গান্ধীজীও দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, অহিংসা হিংসার চেয়ে বড়! সেই অহিংসাই আমার মন্ত্র এবং অস্ত্র।

অহিংসার পথে অসহযোগ আন্দোলন ভারতের চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। এর কার্যসূচী ছিল উপাধি বর্জন, সরকারী ও আধা সরকারী অনুষ্ঠান বর্জন, সরকারী স্কুল-কলেজ বর্জন, বিদেশী দ্রব্য বয়কট ও চরকার প্রচলন।

শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে চললো এই আন্দোলন। সরকার এই আন্দোলনকে দমন করবার জন্যে দেশের অনেক জায়গায় ১৪৪ ধারা জারি করলেন।

কিন্তু তাতেও কোন ফল হলো না। এবার সরকার দমননীতি চালালেন।

ফলে অনেক সত্যাগ্রহীর দেহ হতে রক্ত ঝরলো, অনেকের মাথা ফাটলো। কেউ বা প্রাণ হারালেন। যাঁরা প্রাণ হারালেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন উত্তর প্রদেশের রায় বেরিলীর মানুষ বাদল।

মেদিনীপুরের নিরলস কংগ্রেসকর্মী শহীদ গুণধর হাজরা আইন

অমান্য আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন এবং গ্রেপ্তার হন। কারাগারে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

এই আন্দোলনে আর একজন বাঙালী বিপ্লবী ইংরেজ পুলিশের হাতে বন্দী হন এবং কারাগারে পুলিশের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে প্রাণ হারান। তাঁর নাম শহীদ সঞ্জীবচন্দ্র রায়।

সত্যাগ্রহীদের ওপর ইংরেজ পুলিশের নির্য্যাতন চলতে থাকলেও তাঁরা কিন্তু শান্ত হলেন না। আবার তাঁরা উত্তেজনার মুখে বিপ্লবাত্মক কাজও করলেন না। কেবলমাত্র অহিংস উপায়ে ইংরেজদের সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তুললেন।

তখন ভারতের বড়লাট ছিলেন লর্ড রেডিং। তিনি অধীনস্থ পরামর্শদাতাদের কথামত চারদিকে কঠোর হস্তে আন্দোলন দমন করতে লাগলেন। অনেক কংগ্রেস কর্মীর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হলো। তাঁদের গতিবিধিও নিয়ন্ত্রিত হলো। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, লালা লাজপত রায় এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদ পড়লেন এই নিষেধাজ্ঞার আওতায়।

গান্ধীজী তখন দেখলেন, ইংরেজদের এই ভুল ভাঙা উচিত। তিনি দেখা করলেন বড়লাটের সঙ্গে।

ঠিক এই সময়ে আসামের চা-বাগানে আরম্ভ হলো শ্রমিক ধর্মঘট। শ্বেতাঙ্গ মালিকরা শ্রমিকদের অল্প বেতন দিয়ে বেশী কাজ করিয়ে নিতো। তাই শ্রমিকরা ধর্মঘট আহ্বান করলো।

তারা দেশে ফিরে যেতে চাইল। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ মালিক তাদের যেতে দিল না। নগদ টাকাও দিল না।

তখন অনেক শ্রমিক বাধ্য হয়ে হাঁটা-পথে এলো চাঁদপুর ষ্টেশনে।

নিশুতি রাতে তারা ষ্টেশনে এলো।

ওদিকে ইংরেজ পুলিশও ওদের অনুসরণ করতে লাগলো। ওরাও রাতের অন্ধকারে ষ্টেশনে এসে চা-বাগানের নিরীহ ও খেটে-খাওয়া শ্রমিকদের ওপর গুলি চালালো।

ইংরেজ প্রভুদের এই নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে রেল ও ষ্টীমার কোম্পানীর সব কর্মচারী ধর্মঘট শুরু করলো। এই ধর্মঘটের নেতৃত্ব দেন তরুণ ব্যারিস্টার দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত। তাঁকে সাহায্য করলেন দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ আর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

এই সময়ের আরও দুটি ঘটনা বিখ্যাত হয়ে আছে। একটি হচ্ছে পাঞ্জাবে নানকানার মঠের মোহান্তের বিরুদ্ধে শিখদের সত্যাগ্রহ। এই সত্যাগ্রহে বহু শিখ ইংরেজ পুলিশের গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দেন। তাঁরা হচ্ছেন ভাগ সিং, ভগৎ সিং, বুধ সিং, বুর সিং, চন্দ্র সিং, চেৎ সিং, দলিপ সিং, ধরম সিং, ধেয়া সিং, দেওয়ান সিং, গণ্ডা সিং, ঘন্টা সিং, গোপাল সিং, গুজ্জর সিং, গুলান সিং, গুরবক্স সিং, হরি সিং, হরনাম সিং, ইন্দার সিং, ইসার সিং (১) ইসার সিং (২) ইসার সিং (৩) জগৎ সিং, জয়ালা সিং, যোগীন্দর সিং, গজন সিং কেহার, মঙ্গল সিং (১) মঙ্গল সিং (২) মোতা সিং, নন্দ সিং, পল সিং, পাঞ্জাব সিং, সুরেন সিং (১) সুরেন সিং (২) তেহল সিং, তেজা সিং, ওয়াধা সিং, ওয়ারজম সিং, অরুব সিং, বচিত্তর সিং (১) বচিত্তর সিং (২) বাগা সিং এবং বাগগল সিং।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো মালাবার উপকূলের মুসলমানদের বিদ্রোহ।

মোপলা মুসলমানরা অত্যন্ত গরীব। তারা মহাজন, জমিদার ও সরকারের নানাপ্রকার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তারা এই তিন পক্ষের বিরুদ্ধে সবসময়ের জন্যে উত্তেজনার ভাব প্রকাশ করতো। এই কারণে সরকারের পক্ষ থেকে সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হতো।

১৯২১ সালের এই নিরক্ষর ও গরীব মুসলমানরা গান্ধীজীর কথা শুনে আনন্দিত হলো। সেই সময় গান্ধীজীর একদল অনুগামী মালাবারে গিয়ে এই সমস্ত গরীব মুসলমানদের মধ্যে অসহযোগ আন্দোলনের কথা প্রচার করেন।

তার ফলে মালাবারে মোপলা মুসলমানদের মধ্যে অসহযোগ আন্দোলন দানা বেঁধে উঠলো।

ঠিক এই সময়ে ইংলণ্ডের যুবরাজ এলেন ভারতবর্ষে। পরে তিনি অষ্টম এডওয়ার্ড নাম ধারণ করে ইংলণ্ডের রাজ সিংহাসনে বসেন এবং এক বছরের জন্যে রাজত্ব করে আবার সিংহাসন ত্যাগ করেন।

২১শে নভেম্বর তারিখে যুবরাজ বোম্বাইতে এলেন। তাঁর আগমনের দিন বোম্বাইতে হরতাল পালন করা হলো।

কংগ্রেস থেকে এই হরতাল ডাকা হয়েছিল। সেই সঙ্গে এও বলা হয়েছিল যে কেউ যেন যুবরাজকে অভ্যর্থনা না জানায়।

বোম্বাইতে ভীষণ দাঙ্গা লাগলো।

এই দাঙ্গা দমাবার জন্যে গান্ধীজী পাঁচ দিন যাবৎ অনশন শুরু করলেন।

তাঁর অনশনের ফল পাওয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে। দাঙ্গা থেমে গেল।

এরপর শুরু হলো পুলিশের জুলুম। চারদিকে বেপরোয়া ধরপাকড় আরম্ভ হলো। সভা, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করা হলো। কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী ও সীমান্ত-গান্ধী আবদুল গফুর খাঁর লালকোর্তা দল বে-আইনী ঘোষিত হলো।

চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, আবুলকালাম, লালা লাজপৎ রায়, মতিলাল নেহেরু গ্রেপ্তার হলেন।

ইংরেজ সরকার যতই এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা ও স্বেচ্ছাসেবকদের গ্রেপ্তার করতে লাগলেন ততই দেশের লোকদের মধ্যে সীমাহীন উত্তেজনা দেখা দিলো। দলে দলে কংগ্রেস স্বেচ্ছা-সেবকরা আইন অমান্য করে কারাবরণ করলেন।

কলকাতার অবস্থা সকলের তুলনায় ভাল ছিল। এখানকার হরতাল সফল হলো। এখানে মোট পঁচিশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দ। ডিসেম্বর মাস। আহমদাবাদে বসলো কংগ্রেসের অধিবেশন।

এই অধিবেশনে সভাপতি হন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

কিন্তু তখন তিনি ছিলেন কারাগারে। সেখানে থেকেও তাঁর মনোবল অটুট ছিল। জেল থেকে তিনি তাঁর অভিভাষণ লিখে পাঠালেন।

এই অধিবেশনেও অহিংস অসহযোগ চালিয়ে যাবার প্রস্তাব পাশ করা হলো এবং মহাত্মা গান্ধীর ওপর এই কাজের সমুদয় ভার অর্পণ করা হলো।

দেখতে দেখতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ শেষ হতে চললো। ঠিক এক বছর আগে গান্ধীজী ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর নির্দেশমত চললে ভারত এক বছরের মধ্যে স্বরাজ লাভ করতে পারবে।

জনসাধারণ এক বছর আগেকার গান্ধীজীর এই প্রতিজ্ঞা ভুলতে পারেনি। তাদের মন সজাগ ছিল। তাই বছরের শেষাশেষি তাদের অসহযোগ আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে উঠলো।

গান্ধীজীও চাইলেন ব্যাপক গণ-আন্দোলন। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

তিনি ঠিক করলেন গুজরাটের খাজনা বন্ধের আন্দোলন শুরু করবেন। প্রথম রণক্ষেত্র হিসেবে তিনি বেছে নেন বারদৌলির তালুক। এই প্রসঙ্গে তিনি ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে বড়লাটকে লিখলেন, সরকার যদি বন্দীদের মুক্তি না দেন আর অত্যাচার বন্ধ না করেন তাহলে তিনি বারদৌলিতে আইন অমান্য আন্দোলন স্বুরু করবেন।

তিনি সবেমাত্র চিঠি পাঠিয়েছেন এমন সময় শুনলেন বিহারের গোরক্ষপুর জেলায় চৌরি-চৌরা থানা আক্রান্ত হয়েছে একদল জনতার দ্বারা। তারা থানার আসবাবপত্র জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং থানার দারোগাসহ ২১ জন পুলিশকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে।

এই ঘটনার দ্বারা বুদ্ধিমান মানুষ বুঝতে পারলেন যে রাজনৈতিক ঘটনাস্রোতে আধ্যাত্মিকতা নিয়ে আসা যায় না।

গান্ধীজীও বুঝতে পারলেন, এখনও দেশের গণমানস সত্যাগ্রহ আন্দোলনের উপযুক্ত হতে পারেনি। তাই তিনি এই আন্দোলন সাময়িক কালের জন্যে বন্ধ রাখতে মনস্থ করলেন।

অনেকে এই ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে তাঁকে পত্র লিখলেন।

কিন্তু গান্ধীজী রইলেন নিজের ব্রতে অটল—অচল। তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করলেন, হিংসা আমার অস্ত্র নয়।

বিহারে এই নৃশংস ঘটনা ঘটবার কিছুদিন আগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ গুজরাটের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক নানালাল দলপতরামকে একটি পত্র লেখেন। তাতে গান্ধীজী যেভাবে অহিংসনীতিকে রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করছেন তার প্রতিবাদ ছিল।

কবি লিখলেন, পৃথিবীর মহাপুরুষগণ আধ্যাত্মিক জীবন লাভের জন্যে প্রেম, ক্ষমা, অহিংসাদি প্রচার করেছেন বিশেষ কোনো রাজনৈতিক অভীষ্ট লাভের উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহার করেননি।

হিংসার মধ্যে অহিংসা কখনো স্থান পেতে পারে না। তাই গান্ধীজীর প্রচেষ্টা অচিরে বন্ধ হয়ে গেল। মানুষের মন হতে উৎসাহের আলো নিমেষে নিভে গেল।

সরকার এবার রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার করলেন গান্ধীজীকে।

বিচারে ছ'বছরের জন্যে কারাবাস দণ্ড হলো।

আদালতে দাঁড়িয়ে গান্ধীজী নির্ভীক চিত্তে প্রকাশ করলেন তাঁর মতামত ইংরেজের কুনীতির বিরুদ্ধে। তিনি বললেন, জানি আগুন নিয়ে আমি খেলা করছি। জেল থেকে ছাড়া পেলে আমি তাই করবো।

গান্ধীজী গ্রেপ্তার হবার পর ইংরেজ পুলিশ ব্যাপকভাবে জনসাধারণের ঘরে ঘরে খানাতল্লাসি চালালো। বহু নিরীহ ও নিরপরাধ মানুষ গ্রেপ্তার হলো।

এত অত্যাচারেও জনশক্তিকে খর্ব করতে পারলেন না ইংরেজ সরকার। তাদের মনোবল আগের মতই অটুট রইলো। কারণ তারা যে অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত। তাছাড়া এই সময়ে জাতি গঠন-মূলক কাজে অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

এই সময় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে স্বরাজ্য দল নামে একটি নতুন দলের সৃষ্টি হলো।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মতিলাল নেহেরু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ জেল থেকে বেরিয়ে এসে এই দল সৃষ্টি করেন। এই দলের লক্ষ্য ছিল, আইন সভায় প্রবেশ করে ভেতর থেকে অসহযোগ আন্দোলন করা।

'স্বরাজ্য' দল প্রসঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনের কাহিনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেনঃ '১৯২৩ সালের ১লা জানুয়ারী চিত্তরঞ্জন স্বরাজ্য দল গঠন এবং দলের মুখপত্র হিসাবে 'Forward' নামে দৈনিক কাগজ প্রকাশ করিলেন। ইহাই বাংলাদেশে বোধ হয় প্রথম দলগত বা পার্টি পত্রিকা। এই কার্যে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত হইলেন সুভাষচন্দ্র বসু। স্থির হইল স্বরাজ্য দল কন্‌গ্রেসের মধ্যে থাকিয়া কাজ করিবেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে দেশে দুইটি দল—অসহযোগীরা No changer নামে ও স্বরাজ্য দল Renisionist নামে পরিচিত হইল। টিলক-স্বরাজ্য ভাণ্ডারের মালিকানা কংগ্রেসের উপর ছিল, এখন প্রশ্ন উঠিল, কংগ্রেসের কোন্ দল সেই ধন-ভাণ্ডারের উপর মাতব্বরী করিবেন; তাহা লইয়া বেশ অশান্তি দেখা গেল। তখন স্বরাজ্যদল নিজেদের ভাণ্ডার নিজেরাই সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। গান্ধীপন্থী অসহযোগীদের পক্ষ হইতে গঠনমূলক কার্য করিবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক ও অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা তেমন সফল হইল না। বরিশাল কনফারেন্সে উভয় দলের মধ্যে মতভেদ বিচ্ছেদে পরিণত হইল। কারণ সেখানে গান্ধীবাদীদের সংখ্যাধিক্যহেতু কাউন্সিল্ প্রবেশ-প্রশ্ন গৃহীত হইস না। ভারতের অন্যত্র স্বরাজ্যদল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেখানেও কাউন্সিল প্রবেশের প্রশ্ন তীব্রভাবে

আলোচিত হইয়াছে। অবশেষে বোম্বাই-এর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক অধিবেশনে স্থির হইল যে, কংগ্রেসের তরফ হইতে কাউন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে কোনো প্রতিবাদ করা হইবে না। এই প্রস্তাবে কয়েকজন গোঁড়া গান্ধীবাদী কংগ্রেস ত্যাগ করিলেন ; তাঁহারা কংগ্রেসের প্রস্তাব হইতে গান্ধীজীর মতকে বেশি মান্য করিতেন—যাহাকে বলে personality cult-এর উপাসনা। ইহার পর স্বরাজ্য-দল ভারতের সর্বত্র কাউন্সিল, কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বা তালুক বোর্ডে প্রবেশের জন্য প্রচারকার্য আরম্ভ করিলেন ; ভারতের রাজনীতি নূতন পর্বে প্রবেশ করিল। কলিকাতার কর্পোরেশন 'স্বরাজ্য' দল কর্তৃক অধিকৃত হইলে চিত্তরঞ্জন দাশ হইলেন প্রথম মেয়র ও সুভাষচন্দ্র বসু প্রধান কর্মকর্তা বা একজিকুটিভ অফিসার (বর্তমানে যে পদের নাম কমিশনর) স্বরাজ্য দলের বহুলোক কর্পোরেশনের নানা চাকুরিতেও প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইলেন। রাজনীতিতে দলগত কার্যপদ্ধতি, বা দলাদলের প্রশস্ত ক্ষেত্রে লোকে প্রবেশ করিল।

১৯২২ খৃষ্টাব্দ। কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো গয়ায়।

এবারকার অধিবেশনেও চিত্তরঞ্জন দাশ হলেন সভাপতি। এই অধিবেশনে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে রাশিয়ার মুক্তিকামী মহান নেতা কমরেড লেনিন এক বাণী পাঠালেন।

সভাপতির ভাষণে দেশবন্ধু বললেন, 'আমার দেশ, আমার জাতি এর থেকে আসে জাতীয়তাবাদ। এরই ভেতর দিয়ে জাতি নিজেকে খুঁজে পায়, চিনতে পারে।'

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন বসে। তাতে একটি প্রস্তাব পাশ করানো হলো। প্রস্তাবটি হচ্ছে আইন সভার নির্বাচনে কংগ্রেস কর্মীরা পদপ্রার্থী হতে পারবেন।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে নাগপুরে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। এটি পতাকা সত্যাগ্রহ নামে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে।

নাগপুরের রাজপথে কংগ্রেস কর্মীরা পতাকা নিয়ে মিছিল করে যাচ্ছিল। ইংরেজ পুলিশ তাতে বাধা দিলে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ গর্জে উঠলেন। তাঁরা পথের মাঝে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করে দিলেন।

তখন সত্যাগ্রহীদের মধ্যে কেউ কেউ ধৃত ও দণ্ডিত হন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও ছিলেন।

এইসব দেখে শুনে এগিয়ে এলেন বিটলভাই এবং বল্লভভাই প্যাটেল।

তাঁরা বিরাট সত্যাগ্রহের আয়োজন করে ইংরেজদের পুলিশী অত্যাচারের বদলা নিলেন।

এবার ইংরেজ সরকার সত্যাগ্রহীদের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হলেন। ঢালাও আদেশ দিলেন, হ্যাঁ, এবার থেকে কংগ্রেস নেতা বা স্বেচ্ছাসেবকগণ কংগ্রেসের জাতীয় পতাকা রাজপথ দিয়ে বহন করে নিয়ে যেতে পারবেন।

১৯২৩-২৪ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবে জৈঠো নামক এক জায়গায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন হয়। তাদের ঐ আন্দোলনের অন্য নাম হচ্ছে 'মোর্চা'। তাই ঐ আন্দোলন ইতিহাসে 'জৈঠো মোর্চা' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। এই আন্দোলন ছিল ইংরেজ সরকারের কুশাসনের প্রতি স্থানীয় জনগণের অহিংসার পথে অসহযোগ আন্দোলন।

কিন্তু অত্যাচারী শাসক এই নিরস্ত্র জনতার ওপর পুলিশের গুলি ও লাঠি চালায়। তার ফলে অনেক সত্যাগ্রহী হতাহত হন। কয়েক-জনের আবার ফাঁসিও হয়। যাঁরা ঐ আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে মারা যান তাঁরা হচ্ছেন অমোলক সিং, অর্জুন সিং, অরুর সিং, আশা সিং, আত্মা সিং, বচন সিং, বাগা সিং, বাহাদুর সিং, বলবন্ত সিং,

বিষাণ সিং, নরঞ্জন সিং (১) নরঞ্জন সিং (২), চেৎ সিং, দলীপ সিং, নরেন সিং, দওয়ান সিং (১) দওয়ান সিং (২) সরমুখ সিং, গোপাল সিং (১) গোপাল সিং (২) সঙ্নাম সিং, গুরমুখ সিং (১) গুরমুখ সিং (২) গুরুমুখ সিং (৩) মিলখা সিং (১) মিলখা সিং (২) হাকিম সিং, হরি সিং (১) হরি সিং (২) হরি সিং (৩) হরি সিং (৪) হরি সিং (৫) মেমা সিং, হরনাম সিং, মুলা সিং, হরনাম সিং ভাই, প্রতাপ সিং, হরনাম সিং (১) হরনাম সিং (২) হাজারা সিং, নিহাল সিং, হেম সিং, সওদাগর সিং, হিয়া সিং, ইন্দার সিং (১) ইন্দার সিং (২) ইসার সিং (১) ইসার সিং (২) ইসার সিং (৩), জগৎ সিং (১) জগৎ সিং (২) জয়মল সিং, নৌরঙ্গ সিং, জয়ালা সিং, নিরঞ্জন সিং, জয়ান্দ সিং, সুন্দর সিং (১) সুন্দর সিং (২) সুন্দর সিং (৩) কাপুর সিং, কাপুর সিং, (২) ভাবা, করম সিং (১) করম সিং (২) করম সিং (৩), কেশব সিং (১) কেশব সিং (২) খরক সিং, সুখা সিং, কুশল সিং, লাখা সিং, লেনা সিং, মঙ্গল সিং (১) মঙ্গল সিং (২) নারায়ণ ওয়ার্কে, ওয়ারজম সিং, তারলোক সিং, তারু সিং, উজগর সিং, ওয়াধা সিং, তেজা সিং, উধম সিং (১) উধম সিং (২) উত্তম সিং, ঠাকর সিং, কুমন সিং (১) কুমন সিং (২) গিয়ারা সিং, শুচা সিং (১) শুচা সিং (২) পাঞ্জাব সিং, পূরণ সিং, রাম সিং, (১) রাম সিং (২) রাম সিং (৩) রাম সিং (৪) শোভা সিং (১) শোভা সিং (২) শোভা সিং (৩) সোহন সিং (২) সোহন সিং (২) রাণ সিং, বানযোধ সিং, রতন সিং, রওন সিং (১) রওন সিং (২) রওন সিং (৩) সন্ত সিং (১) সন্ত সিং (২) তারা সিং (১) তারা সিং (২ , এবং তারা সিং।

এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে একজনের ফাঁসি হয়। তাঁর নাম ফুমন সিং।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দ। গান্ধীজী মুক্তি পেলেন।

ইতিমধ্যে আইন সভার নির্বাচনে স্বরাজ্য দল বেশ কয়েকটি আসন লাভ করে। ফলে বেশ কয়েকটি সংস্কারপূর্ণ আইন পাশ হয়ে গেল পারিষদে।

ওদিকে বিপ্লবী সমিতির কাজও থেমে রইলো না। চলেছে সমানে।

জনবহুল কলকাতার বিখ্যাত পথ চৌরঙ্গীতে বিপ্লবীদের কার্য্যকলাপ তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করলো।

একদিন গোপীনাথ সাহা নামে জনৈক বিপ্লবী তখনকার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টকে গুলি করে মারতে গিয়ে মারলেন ডে নামে জনৈক ইংরেজকে।

পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়।

এরপর থেকে বাংলাদেশে দেখা দিল সন্ত্রাসের রাজত্ব।

ইংরেজ সরকারও কড়া হলেন। অর্ডিন্যান্স জারি করে শাসনকার্য্য চালাতে লাগলেন। বিনা বিচারে বহু বিপ্লবী কর্মী ও দেশনেতা বন্দী হলেন।

সুভাষচন্দ্র বসু, সত্যেন মিত্র প্রমুখ নেতারা ভারতের বাইরে বর্মার মান্দালয় জেলে নির্বাসিত হলেন।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দ। ১৬ই জুন। বাংলা তথা ভারতের স্বনামধন্য নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ পরলোকগমন করেন।

তাঁর মৃত্যুতে দেশ নেতাশূন্য। সকলে অন্ধকার দেখতে লাগলো। এর দু' বছর পরে বাংলা দেশকে আর একজন জাতীয়তাবাদী নেতাকে হারাতে হলো। তাঁর নাম সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই দু'জন নেতা দেশকে অকূলে ফেলে চলে গেলেন ঠিকই তবু দেশবাসী তাঁদের কর্মময় জীবনের আদর্শে উদবুদ্ধ হয়ে অন্ধকারের মধ্যে দেখতে পেল আশার জ্যোতি। তারা নতুনভাবে দেশের কাজে নামবার জন্যে উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করলো।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর স্বরাজ্যদল বিভক্ত হয়ে গেল। অনেকে দল ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন।

এই সময় বাংলা দেশে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হলো। তা সত্ত্বেও দেশের জনসাধারণ গান্ধীজীর মত প্রিয় নেতাকে কাছে পেয়ে নতুন আশায় উদবুদ্ধ হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল সাম্যবাদী ভাবধারা।

ইংরেজ সরকার সাম্যবাদীদের ওপরও তীক্ষ্ণ নজর রাখতে লাগলেন।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় সাম্যবাদী দলের ছ'জন নেতা ধরা পড়েন আর তার চার বছর পরেই আরম্ভ হয় বিখ্যাত মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দ। ভারতবর্ষে এলো সাইমন কমিশন। এই কমিশনের নেতা হলেন স্যর জন সাইমন। তাঁর নামেই এই তদন্ত কমিটির নাম হয় সাইমন কমিশন। ইংরেজ সম্রাট লণ্ডন থেকে এই কমিশন পাঠান ভারতবর্ষে। ভারতবাসীরা স্বাধীনতা লাভ করার উপযুক্ত কিনা তা দেখবার জন্যে এই কমিশনের ভারতবর্ষে আসা।

সাইমন কমিশনকে বয়কট করলো ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ। তারা সোচ্চার হয়ে উঠলো —আমরা স্বাধীনতা লাভের যোগ্য কি না এই বিচার করবে বিদেশী ইংরেজ। ভারতবাসীরা এই ধরণের অপমান সহ্য করতে রাজী হলো না।

ভারতব্যাপী প্রতিপালিত হলো হরতাল। সর্বত্র কাজ-কারবার বন্ধ হয়ে গেল।

মাদ্রাজে চললো গুলি।

কলকাতায় পুলিশ ও ছাত্রদের মধ্যে হলো সংঘর্ষ।

দিল্লীতে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো—'সাইমন ফিরে যাও।'

সব চাইতে চরম অবস্থা ঘটলো লাহোরে। কমিশন লাহোরে পৌছলে এক বিরাট জনতা তাঁদের লক্ষ্য করে বিক্ষোভ দেখালো।

লালা লাজপৎ রায় ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য লাহোর জনতার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

পুলিশ লাজপৎ রায়ের গায়ে বেটনের আঘাত হানে।

এই আঘাত ছিল অত্যন্ত মারাত্মক ধরণের। সতেরো দিন পরে মৃত্যু হলো লালা লাজপৎ রায়ের।

তাঁর মৃত্যুতে দেশবাসীর রুদ্র রোষ আরও দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে ফেটে পড়লো সাইমন কমিশনের ওপর। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে গণবিদ্রোহ ব্যাপক আকার নেয়।

এভাবে ভারতের সর্বত্র সাইমন কমিশনকে বর্জন করা হলো।

তাই লক্ষ্য করে সাইমন কমিশন ব্যর্থ মনোরথ হয়ে মার্চ মাসে ফিরে গেল লণ্ডনে।

লালা লাজপৎ রায়ের মত নেতা পুলিশের হাতে নির্যাতিত হয়ে মারা গেছেন শুনে সেখানকার ক্ষুব্ধ জনতা পুলিশের ওপর প্রতিশোধ নিতে প্রস্তুত হলো।

এই উদ্দেশ্যে লাহোর পুলিশের বড়কর্তা স্যাণ্ডার্সকে গুলি করে মারা হলো।

পুলিশ তখন বিপ্লবীদের পেছনে লেগে রইলো। তাঁদের গ্রেপ্তার করবার জন্যে চেষ্টা করলো।

আর একদিন দিল্লীতে ঘটে গেল এক অভিনব ব্যাপার। দিল্লীর ব্যবস্থা-পরিষদকে লক্ষ্য করে বিপ্লবীরা ছুঁড়লো বোমা।

এর ফলে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত ধরা পড়লেন।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ চারদিকে খোঁজ-খবর নিতে লাগলো। শেষকালে তারা আবিষ্কার করলো, ভারত থেকে ইংরেজ রাজত্ব সমূলে উৎপাটিত করবার জন্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে চলেছে এক বিরাট ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রের নাম বিখ্যাত 'লাহোর ষড়যন্ত্র।' ভগৎ সিং, রাজগুরু, অমর ঘোষ, যতীন দাস, শুকদেব প্রভৃতি বিপ্লবীগণ ধরা পড়লেন।

ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর ফাঁসির আদেশ হয়।

যতীন দাস কারাবরণ করেন। জেলে কর্তৃপক্ষের নির্দয় ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে ছেষট্টি দিন অনশন করে কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের আর একটি বিখ্যাত ঘটনা হলো বারদৌলি সত্যাগ্রহ।

হঠাৎ বারদৌলি তালুকের শতকরা পঁচিশ টাকা হিসাবে খাজনা বেড়ে গেল।

জমির আয় বাড়লে খাজনা বাড়ে, এই হচ্ছে চিরাচরিত নিয়ম।

কিন্তু অত্যাচারী ও শোষক ইংরেজ সরকার তার বিপরীত কাজ করে বসলেন।

এই কারণে প্রজাসাধারণ সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানালো।

কিন্তু নিস্ফল হলো প্রতিবাদ।

প্রজারা কর বন্ধ আন্দোলন করবে বলে নোটিশ দিলো।

এই বিখ্যাত আন্দোলনে নেতৃত্ব করেন লৌহমানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল।

এভাবে কংগ্রেসী নেতারা এসে দাঁড়ালেন চাষীদের পাশে।

পুলিশ খাজনা আদায় করতে না পেরে চাষীদের ঘরের জিনিষ ও গরু-বাছুর নিয়ে যেতে লাগলো।

চাষীরা কিন্তু তার জন্যে মাথা নত করলো না। তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্যে অচল-অটল রইলো।

এরপর এলো পাঠান পুলিশ।

পাঠানদের অত্যাচারে সারা তালুকে বইতে লাগলো রক্তস্রোত।

তাই দেখে ক্রুদ্ধ হলেন লৌহমানব এবং গুর্জর সিংহ সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল। তিনি গুরুগম্ভীর স্বরে হুঙ্কার দিয়ে বললেন, দমননীতি বন্ধ না করলে সারা দেশময় আগুন জ্বলে উঠবে।

সর্দারের হুঙ্কারে ঘাবড়ে গেলেন ইংরেজ সরকার। জমির খাজনা কমাতে বাধ্য হলেন। বারদৌলির ঘটনার পর কৃষকদের মনোবল গেল

বেড়ে। তারা দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে ইংরেজ সরকারের যাবতীয় জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্যে সোচ্চার হয়ে উঠলো।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দ।

বছরের শেষভাগে ভারতের জাতীয় আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিলো।

অক্টোবরের শেষাশেষি লর্ড আরুইন ঘোষণা করলেন, অল্পদিনের মধ্যে বিলেতে গোলটেবিল আহুত হচ্ছে। সেখানে ভারতীয় প্রতিনিধিরা ভাবী শাসন বিষয়ক সকল প্রশ্নের আলোচনা করবেন।

ভারতীয় নেতারা জানতে চাইলেন, গোলটেবিল বৈঠকে ভারতে ডোমিনিয়ন-স্টেটাস-সম্মত শাসনবিধি প্রবর্তনের কথা আলোচিত হবে কিনা।

বড়লাট জবাব দিলেন, ডোমিনিয়ন স্টেটাস কখন ভারতে প্রবর্তিত হবে সেকথা আলোচনার জন্যে যে গোলটেবিল বৈঠক আহুত হচ্ছে তা নয়। তবে ডোমিনিয়ন স্টেটাস কীভাবে ভারতে প্রযুক্ত হতে পারে সে বিষয়ে কথাবার্তা হবে।

ভারত-সচিব স্যর ওয়েজউড্‌বেন বললেন, ভারত তো স্বায়ত্ত শাসন পেয়েই আছে। তার প্রতিনিধি হাই-কমিশনার লণ্ডনে নিযুক্ত। জেনেভার রাষ্ট্রসংঘ বা লীগ অব নেশন্‌সে ভারত-সদস্য উপস্থিত, মহাযুদ্ধের সময় কমনওয়েলথের সদস্যরূপে ভারত-প্রতিনিধিরা আমন্ত্রিত হন। যুদ্ধশেষে সাম্রাজ্য সম্মেলনেও ভারত আহুত হয়। অতএব ভারত তো স্বায়ত্ত শাসন পেয়েই গিয়েছে।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি নিযুক্ত হলেন যুবক জওহরলাল নেহেরু। এই সভায় স্থির হলো, কংগ্রেসপক্ষীয়রা বিলেতের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করতে যাবে না। দ্বিতীয়ত, ভারত ডোমিনয়ন স্টেটাস চায় না। চায় পূর্ণ স্বাধীনতা।

গত বছর এই প্রস্তাবই জওহরলাল গ্রহণ করেছিলেন।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তাঁর চেষ্টায় Iidipendence of India league স্থাপিত হয়। এবার কংগ্রেসের সভাপতির স্বাধীনতা প্রস্তাব গৃহীত হলো। কংগ্রেস স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল যে তারা complete indipendence বা পূর্ণ স্বাধীনতা চায়।

এর আগে মতিলাল নেহেরুর নামে সংবিধানের যে খসড়া প্রকাশিত হয়েছিল তার সিদ্ধান্ত এই সভা বর্জন করলো অর্থাৎ এখন কংগ্রেস ডোমিনিয়ান স্টেটাস চায় না।

সুভাষচন্দ্রও এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন। সভায় প্রস্তাব পাশ হলো।

সেই সঙ্গে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির হাতে আন্দোলন চালাবার ভার দেওয়া হলো।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দ। ৩১শে ডিসেম্বর। মধ্যরাত্র। এইসময় কংগ্রেসের সদস্যগণ স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন। ঐসময় স্থির হয়, ২৬শে জানুয়ারী (১৯৩০) প্রতি বছর স্বাধীনতার সংকল্প মন্ত্র পাঠ করা হবে। ঐসময় কংগ্রেস সভাপতি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

কংগ্রেস অধিবেশন ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা সমর্থন করে যে প্রস্তাব গ্রহণ করলো তাতে করে দেশবাসীর মনে স্বাধীনতা সংগ্রামের স্পৃহা দ্বিগুণ মাত্রায় বৃদ্ধি পেল।

কংগ্রেসী নেতাদের আহ্বানে দেশের যুবসমাজও এগিয়ে এলেন।

ওদিকে দেশের নানাস্থানে বিপ্লবী সমিতির সদস্যদের মধ্যে দেখা গেল বিপ্লবাত্মক কাজকর্ম। পুলিশের ডেপুটি কমিশনার ভূপেন ব্যানার্জীকে আলিপুর জেলে হত্যার জন্যে প্রমোদরঞ্জন চৌধুরীর ফাঁসি হয়।

শহীদ রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ীও কম বিপ্লবী ছিলেন না। কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ, পাঠরত অবস্থায় দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় তাঁর দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়। ১৯২৬-এ কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায়

ধৃত হয়ে বিচারে তাঁর ফাঁসির আদেশ হয়। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে তাঁর ফাঁসি হয়। বিপ্লবী শহীদ আসফাকুল্লার ফাঁসি হয় ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। তিনি ইউ-পির কাকোরী ষড়যন্ত্র পরিচালনার জন্যে বন্দী হন।

বিপ্লবী অমুজা সেন পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে মারবার জন্যে তিনজন সঙ্গীসহ ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ডালহৌসিতে যান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে নিজেই নিহত হন।

বিপ্লবী শহীদ পঞ্চানন পালিত মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলের মধ্যে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পেডীর পদাঘাতে বুকের পাঁজর ভেঙে মৃত্যু-বরণ করেন।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে বিপ্লবী শহীদ বাদল গুপ্ত বিষপান করে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছাত্রাবস্থায় রাজনীতিতে যোগদান করেন। সুভাষচন্দ্রের বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সে লেফটেনান্ট-এর পদ পান। রাইটার্স বিল্ডিংস-এ পুলিশের কারাধ্যক্ষ সিম্পসনকে হত্যা করতে গিয়ে সশস্ত্র সংঘর্ষে আহত হন। গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য ঘটনাস্থলে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন।

শহীদ বিনয়কৃষ্ণ বসুও কম বড় বিপ্লবী ছিলেন না। ডাক্তারী পড়ার সময় তিনি সুভষচন্দ্র বসুর বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দলে যোগদান করেন। ঢাকায় লোমান হত্যার পর আত্মগোপন করেন। পরে দীনেশ গুপ্ত ও বাদল গুপ্তর সঙ্গে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ কারাধ্যক্ষ সিম্পসন ও স্বরাষ্ট্র সচিব মার-কে হত্যা করতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে আহত হন। গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য তিনি বিষপান করেন এবং নিজেকে লক্ষ্য করে পিস্তলের গুলিও ছোঁড়েন।

কিন্তু ঐ দুটির মধ্যে কোনটিই কাজে লাগলো না। তিনি অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হন। পরে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বিংশ শতাব্দীর তিন দশকে দেশের অবস্থা সবদিক হতে ছিল বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। ইংরেজ সরকারের দমননীতি, কলকারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ এবং স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ভারতবাসীদের প্রতি দুর্ব্যবহার—এসব ঘটনা শান্তিপ্রিয় ভারতবাসীদের মনে সর্বদা অশান্তির দাবানল জ্বালিয়ে রেখেছিল।

ওদিকে লাহোর কংগ্রেসে গৃহীত পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব আন্দোলনের দ্বারা সক্রিয় করবার জন্যে গান্ধীজীর ওপর ভার দেওয়া হলো।

গান্ধীজীও আন্দোলনের জন্যে তৈরী হতে লাগলেন। তার আগে তিনি আপোষের শেষ চেষ্টা করলেন।

বড়লাট লর্ড আরুইনকে একখানি চিঠি লিখলেন ভারতের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করে।

কিন্তু তাতে কোন ফল হলো না।

তখন দেশের বিভিন্ন জায়গায় চলছিল অশান্তির। বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলের দেড় লক্ষ শ্রমিক ছ'মাস ধরে ধর্মঘট চালালো।

বাংলাদেশেও পঁচিশ হাজার পাটকল শ্রমিক ধর্মঘট করার নোটিশ দেয়। কর্তৃপক্ষ আলাপ আলোচনার দ্বারা সেই ধর্মঘট মিটিয়ে ফেলেন এবং তাদের দাবীদাওয়া পূর্ণ করেন।

গোলামুরিতে টিন প্লেটেব কারখানার শ্রমিকরা দীর্ঘকাল ধবে ধর্মঘট চালালো।

এমনি সব অশান্তি চলছিল ভারতের সর্বত্র।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দ। ১২ই মাচ।

গান্ধীজী লবণ সত্যাগ্রহের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন। ইংরেজ সরকার বিলিতি লবণ এদেশে চালু করবার জন্যে দেশীয় লবণের ওপর শুল্ক ধার্য করলো। ফলে বিলিতি লবণের তুলনায় দেশী লবণের দাম বেড়ে যায়। লোকে দেশী লবণ কেনা ছেড়ে দিয়ে বিলিতি লবণ কিনতে লাগলো।

গরীবের দরদী বন্ধু মহাত্মা গান্ধী ইংরেজ সরকারের এই প্রকার নীতি বরদাস্ত করতে পারলেন না। তিনি ইংরেজ সরকারের লবণ আইন অমান্য করার আন্দোলনের জন্যে ভেতর ভেতর তৈরী হতে লাগলেন। এই সম্পর্কে বড়লাটকে একখানা চিঠি দিয়ে জানালেন, লবণ আইন বে-আইনী বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি এই আইন ভঙ্গ করবো।

সবরমতীতে ছিল গান্ধীজীর আশ্রম। সেখান হতে দুশো মাইল দূরে ডাণ্ডী। সেখানে তিনি সমুদ্রের জল থেকে লবণ তৈরী করবার অভিপ্রায় নিয়ে যাত্রা করলেন।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ মাত্র ৮৯ জন কংগ্রেস কর্মী নিয়ে যাত্রা করলেন গান্ধীজী ডাণ্ডী অভিমুখে। পথে তিনি অনেক জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে জনসাধারণকে লবণ আইন অমান্যের যৌক্তিকতা বুঝিয়ে দিতে লাগলেন।

দু'পাশে হাজার হাজার মানুষ গান্ধীজীর এই অভাবনীয় কাণ্ড প্রত্যক্ষ করতে লাগলো। কি অসাধারণ সাহস এবং অপরিসীম ব্যক্তিত্ব এই মানুষটির। শক্তিশালী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় কটিবস্ত্র সম্বল করে সংগ্রাম করতে চলেছেন।

গান্ধীজীর ঐ আন্দোলনে সরকার পক্ষ প্রথমে নীরব ছিলেন। এর আগে অবশ্য সর্দার প্যাটেল ও সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতারা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

চব্বিশ দিন ধরে পদযাত্রা করলেন গান্ধীজী।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দ। ৫ই এপ্রিল। গান্ধীজী এলেন ডাণ্ডীতে।

পরদিন ভোরবেলায় প্রার্থনার পর লবণ তৈরী করার জন্যে সমুদ্রের জলে নেমে আইন ভঙ্গ করলেন গান্ধীজী।

তাঁর দেখাদেখি সারা দেশে চললো লবণ আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন। অনেকে ঘরে ঘরে লবণ তৈরী করতে লেগে গেল। যারা

তা করলো না তারা বিলিতি কাপড়ের দোকানে পিকেটিং, মদ-গাঁজার দোকানে পিকেটিং প্রভৃতি কাজে যোগ দিল।

গান্ধীজীর লবণ সত্যাগ্রহ প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

'...গান্ধীজী ২রা মার্চ (১৯৩০) বড়লাটকে পত্রযোগে তাঁহার সত্যাগ্রহ পরিকল্পনা জানাইয়া দিলেন। অতঃপর ৮৯ জন আশ্রমবাসী কর্মী লইয়া সবরমতী আশ্রম হইতে পদব্রজে যাত্রা করিলেন—তাঁহাদের গম্যস্থান বোম্বাই প্রদেশের দণ্ডী নামক সমুদ্রকুলস্থিত স্থান; সেখানে লবণ আইন ভঙ্গ করা হইবে। ব্রিটিশ যুগে লবণ ছিল সরকারের নিজস্ব ব্যবসায় সামগ্রী, উহার উপর কর ছিল বলিয়া সমুদ্র-জল হইতে কোনো লোক লবণ প্রস্তুত করিতে পারিত না। সেই লবণ-আইন ভঙ্গ করা হইল সত্যাগ্রহীদের প্রতীকমূলক অনুষ্ঠান মাত্র। দুই শত মাইল পথে সত্যাগ্রহ প্রচার করিতে করিতে গান্ধীজী ৫ই এপ্রিল দণ্ডী পৌঁছিলেন, ৬ই হইতে ১৩ই জাতীয় সপ্তাহ বলিয়া ঘোষিত হইল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এই সময়ে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং ১৩ই এপ্রিল জালিনবালাবাগের হত্যাকাণ্ড ঘটে, গান্ধীজী সেই ঘটনা-স্মৃতি জিয়াইয়া রাখিয়াছেন। এখন সেইটিকে জাতীয় সপ্তাহ বলিয়া ঘোষণা করা হইল। গান্ধীজী ৬ই সমুদ্র জলে নামিয়া সরকারী লবণ আইন ভঙ্গ করিলেন; সেইদিন সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ও বঙ্গীয় সত্যাগ্রহীরা মহিষবাথান নামক স্থানে লবণ আইন ভঙ্গ করিলেন।'

সারা ভারতবর্ষের জনতা লবণ সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণ করলো। আবার ভারতীয় জনজীবনে প্রকাশ পেল উত্তাল বিক্ষোভ।

ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকেও চলতে লাগলো দমননীতি। জারি হলো বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স, প্রেস অর্ডিন্যান্স ইত্যাদি। চললো লাঠি, বেটন আর গুলি। জেল, জরিমানা, মাল ক্রোক চললো অব্যাহত গতিতে।

ধরসনার সরকারী লবণ গোলা আক্রমণ করার পরিকল্পনা গান্ধীজী

আগেই সরকারকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু তা কাজে পূর্ণ করার আগেই সরকার ৫ই মে তারিখে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করলেন।

তাঁর স্থান নিলেন বৃদ্ধ নেতা তায়েবজী।

তিনিও গ্রেপ্তার হলেন ইংরেজ পুলিশের হাতে।

তখন এগিয়ে এলেন সরোজিনী নাইডু। গ্রহণ করলেন আইন অমান্য আন্দোলনের নেতৃত্ব।

গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে শুনে সারা ভারতের মানুষ ইংরেজ সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। তার পরিণাম স্বরূপ সারা ভারতে দেখা দিল হরতাল।

বোম্বাই আর কলকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেল।

কেবল ভারতে কেন, ভারতের বাইরেও বিভিন্ন দেশে হরতাল পালন করা হলো। পানামা, সুমাত্রা, নাইরোবি প্রভৃতি জায়গায় হরতাল হলো।

ঠিক এই সময় এলাহাবাদে বসলো কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক।

এই বৈঠকে নেতারা দেশের কতকগুলি জরুরী বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁরা ভূমিকর দেওয়া বন্ধ করা, চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ করা, বিদেশী দ্রব্য বর্জন করা এবং সরকারী কর্মচারীদের বয়কট করার নির্দেশ দিলেন।

এতে করে আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে উঠলো। তখন ইংরেজ সরকার কংগ্রেসকে বে-আইনী সংস্থারূপে ঘোষণা করলেন।

এ যেন গোদের ওপর বিষ ফোড়া। একে জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ছিল ইংরেজ সরকারের ওপর। এরপর তাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের গায়ে আঁচড় লাগার জন্যে জনতা ক্ষমা করলো না ইংরেজ প্রভুদের।

চারদিকে চলতে লাগলো জোরদার আন্দোলন। ৩০শে জুন

গ্রেপ্তার হলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। তাঁকে ছ'মাসের জন্যে কারাদণ্ড দেওয়া হলো।

স্বেচ্ছাসেবকরাও দলে দলে গ্রেপ্তার হলেন।

এবার স্বেচ্ছাসেবিকাদের দল এগিয়ে এলো। তারাও ইংরেজ পুলিশের হাতে বন্দী হলো।

দশ মাসের মধ্যে প্রায় লক্ষাধিক নর-নারী চলে গেল ইংরেজের কারাগারে।

বাংলা দেশেও লবণ সত্যাগ্রহ জোরদার হয়ে উঠলো। বাংলার দুই স্বনামধন্য নেতা এই আন্দোলনে অংশ নেন। একজন হলেন যতীন্দ্রমোহন, অন্যজন দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র।

এঁদের দু'জনের নেতৃত্বে বাংলায় দুটি পৃথক সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলো।

বিপ্লবীদলের 'অনুশীলন' সমিতি যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্ব নিলো। 'যুগান্তর' দল নিলো সুভাষচন্দ্রের।

বাংলার তরুণরা দলে দলে যোগ দিল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে। তারা দল বেঁধে চললো নীলা, মহিষাদল, ডায়মণ্ডহারবার প্রভৃতি লবণ তৈরী করার জায়গায়। সেখানে গিয়ে ছেলেরা বালির তীরে সমুদ্র জল ফুটিয়ে লবণ তৈরী করতে লেগে গেল।

ওদিকে তাদের কাছেই পড়েছিল পুলিশের শিবির। পুলিশ তরুণদের লবণ তৈরীর কাজে বাধা দিলো।

তরুণরা কিন্তু শুনলো না পুলিশের কথা। তারা আপন মনে নিজেদের কাজ করে যেতে লাগলো।

তখন চললো পুলিশের লাঠি, গুলি, বেটন ইত্যাদি তরুণদের ওপর।

অনেক তরুণ প্রাণ হারালো। অনেকে আহত হয়ে জেলে আশ্রয় নিলো। পরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো।

কিন্তু তাতে করেও ইংরেজ সরকার দেশের বুক হতে রুখতে পারলো না আইন অমান্য আন্দোলন।

বাংলার তরুণরা দলে দলে স্কুল-কলেজে ছাড়তে লাগলো। রাজপথে তারা শুরু করলো বিলিতি কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব। তারা বিলিতি মদের দোকানে প্রবেশ করে একের পর এক মদের বোতল ভেঙে তছনছ করতে লাগলো।

এভাবে বাংলার যুবসমাজ একের পর এক আইন ভাঙতে লাগলো।

যশোহরের নেতা বিজয় রায়ের নেতৃত্বে ও মেদিনীপুরের নেতা বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে বন্দবিলা ও কাঁথিতে করবন্ধ আন্দোলন শুরু হলো।

বাংলার বহু জায়গায় সেদিন ইংরেজ শাসক ধূলায় লুটিয়ে পড়লো। মেদিনীপুরে তো কয়েকমাস যাবৎ ইংরেজ সরকারের কোন অস্তিত্বই ছিল না।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের লবণ সত্যাগ্রহ এবং অন্যান্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সারা ভারতে যাঁরা পুলিশের গুলিতে নিহত হন তাঁরা হচ্ছেন বাংলা দেশের বিপ্রপ্রসাদ বেরা, দিবাকর বেরা, নরেন্দ্রনাথ বেরা, লক্ষ্মণ বেরা, নৃপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, গোপীনাথ দাস, গৌরাঙ্গ দাস, মনোরঞ্জন দাস, রামকৃষ্ণ দাস, বলাই দাসগুপ্ত, বৈকুণ্ঠনাথ দিণ্ডা, আশুতোষ দলুই, ভীম জানা, কার্তিক চন্দ্র কামিলা, গোপীনাথ খানরা, দীনেশ মাহাতো, গোকুল মাহাতো, মোহন মাহাতো, সহদেব মাহাতো, মহেশ্বর মাইতি, রমানাথ মাইতি, শ্রীমন্ত মাইতি, কালাচাঁদ মাঝি, অভয়চরণ মণ্ডল, অর্জুনচন্দ্র মণ্ডল, আসরফি মণ্ডল, চন্দ্রকান্ত মান্না, উপেন্দ্র মিশ্র, হেমন্ত কুমার নায়েক, গোবিন্দ পাল, পরশুরাম পাল, শ্রীমতী উর্মিলাবালা পরিয়া, নরেন্দ্রনাথ পারুই, রাম পারুই, নগেন্দ্রনাথ প্রধান, কালিপদ সাহু, সতীশচন্দ্র সর্দার, রুদ্রনারায়ণ শাসমল, তারকেশ্বর সেনগুপ্ত এবং অধরচন্দ্র সিংহ; বিহারে বাবুলাল বিহারী, ভগৎ, ভগবানলাল দাস, ত্রুধেশ্বর সিং, মহীপাল সিং, নাথুনি মাহাতো, বদ্রি মণ্ডল,

গইবি মণ্ডল, রামেশ্বর মণ্ডল, গঙ্গাপ্রসাদ রাই, সিদ্ধেশ্বর রাজহান্স, রামসুন্দর লাল, ভিখারী রাউত, শীতল চামার, শুকুল সোনার, উচিত নারায়ণ সিং, রামচন্দ্র প্রসাদ সিং, ভোলা ঠাকুর এবং সুখদেও তেওয়ারী ; উত্তর প্রদেশে ভদ্রিনাথ মিশ্রি, ভগবান সহায়, ভগবান সিং, ছুটন লাল, ধাঙ্গর সিং, গজাধর সিং, গুরা, হরিরাম, কিশোর সিং, মুন্সীলাল, নরেন সিং, নওয়াল সিং, মনোহর শ্যাম, তেঙ্গার, শিশু নারায়ণ তেওয়ারী এবং তুলারাম ; দিল্লীতে চিমনলাল, চন্দ্রভান গুপ্ত, মান্নু মাল, মহম্মদ ইসমাইল এবং মুন্নিলাল ; পেশোয়ারে দলিল, দাসাউন্দী রাম, দৌতগুল, দাসওয়াণ্ডি মাল, দেওরাজ, দিলওয়ার, ফকির মহম্মদ, ফজল দিন. ফজল মহম্মদ, গফর খান, গোলাম হোসেন, গোলাম মহম্মদ, গুল মহম্মদ সৈয়দ, মহম্মদ শাহ, মুস্তকিম (১) মুস্তকিম (২) মুস্তানা, পলওয়ান গুল, কামার গুল, রমজান সরদা, আফজল শাহ্, মীর গোলাম শাহ, শাহিদবাজ, শেরডিল, সৈয়দ মহম্মদ, তেগ আলি, ওয়ালি মহম্মদ, ওয়ালিজ, জৈতুল্লা এবং জিয়ারত গুল ; মহারাষ্ট্রে গঙ্গারাম ভন্দেজ, ভানু দাস, ভোলেগির ভূয়া, ধাকু গভৎজ্যা কাফেরকর, গঙ্গারাম শোভালারাম, ভৌগির গিরি, তিমায়া গোয়ারী, হাল্লে, বাবু হুল্লী, মাল্লিকার্জ্জুন স্বামী, নাগ্য কাটকরি, রামাবামাকলি, সদাশিব কুলকার্ণি, বিষ্ণু লেলে, আলু মাত্রে, কালিদাস মিঠাইওয়ালা, নারায়ণ, রঘুনাথ নাভি, লক্ষ্মণ পঞ্চাঘরে, আনন্দ পাতিল, হাসিরাম পাতিল, পরশুরাম পাতিল, সাহেব কট্রু, পঞ্চানন রাণাডে, রতিলাল, জন কেওয়াল সাহীরে, শঙ্কর শিবাদারে, সুখদেব এবং নরশদা তিয়ারলা ; সিন্ধুদেশে মেঙ্গরাজ, রামচাঁদ, লুল্লা এবং পাঞ্জাবে অবতার সিং মারওয়া। এঁরা পুলিশের গুলিতে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

যাঁরা পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে হাসপাতালে প্রাণ হারাণ তাঁরা হচ্ছেন অন্ধ্র প্রদেশের গুল্লাপল্লী নাগাজ্য, বাংলার বাঙ্গুলাল জানা,

শিবকালি মণ্ডল, পঞ্চানন পালিত, মোহিনীমোহন রায়, ব্রজেন্দ্রকুমার সরকার, নন্দদুলাল ঘোষ এবং মণীন্দ্রমোহন ঘটক; বিহারে কামেশ্বর সিং, ছোট্টু, মাহাতো, ধোয়া মাহাতো, কাঞ্চন মাহাতো, মিশ্রী মণ্ডল, মুকতধারী সিং, রামচরিত্র শর্মা, সরযুগ সিং, কৃপানাথ ঠাকুর এবং রাজমঙ্গল তেওয়ারী; তামিলনাড়ুতে ত্রিরুপুর, কুমারণ; রাজস্থানে রামচন্দর; হরিয়ানায় রতিরাম এবং আসামে সুধাংশু কুমার শর্মা।

এছাড়া লবণ সত্যাগ্রহকে কেন্দ্র করে যাঁদের ফাঁসি হলো তাঁরা হলেন মহারাষ্ট্রের আমেদ কুরবাণ হোসেন, শ্রীকৃষ্ণসারদা ও জগন্নাথ সিন্ধে এবং উত্তরপ্রদেশের দুলারেলাল তেওয়ারী।

কয়েকজনের বাড়ী বা গ্রামের ঠিকানা জানা যায়নি। তাঁরা হচ্ছেন নৃপেন্দ্র কুমার চক্রবর্তী, শঙ্কর চম্বর, চন্দ্রশেখর সিং, চান্দুলাল, আবদুল্লা চৌধুরী এবং আর্তত্রাণ মহাপাত্র।

সরকার জনগণের ওপর এত অমানুষিক অত্যাচার করলেও তাদের কোন ক্ষতি করতে পারলেন না। এর দ্বারা গণ আন্দোলনের উৎসমুখে ভাটা পড়লো না।

আন্দোলন চলতে লাগলো পুরোদমে।

দেশের মানুষ বিলিতি বিলাসদ্রব্য এবং নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষপত্তর বর্জন করেছিল বলে ইংলণ্ডের ব্যবসায়ী মহল বিশেষ ক্ষতির সম্মুখীন হতে লাগলেন। তাই তাঁরা সরকারকে অনুরোধ করলেন ভারতবাসীকে স্বাধীনতা দেবার জন্যে।

সরকারও এই ব্যাপারে আগে থেকে সামান্য ভাবছিলেন।

এবার ব্যবসায়ী মহলের কাছ থেকে সাড়া পেয়ে তাঁদের টনক নড়লো। এই উদ্দেশ্যে সরকার পক্ষ থেকে বিলেতে একটি গোলটেবিল বৈঠক ডাকা হলো।

কংগ্রেস এই বৈঠকে যোগ দিল না। তখন সরকার কয়েকজন

নরম পন্থী নেতা নির্বাচন করে তাদেরকে ভারতের প্রতিনিধি করে লণ্ডনে পাঠালেন।

বৈঠক বসবার দিন ছিল ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর।

ঐ দিন সারা ভারতবর্ষ জুড়ে হরতাল ডাকা হলো।

ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী বুঝতে পারলেন, কংগ্রেস যদি এই বৈঠকে যোগদান না করে তাহলে বৈঠকের ফল ব্যর্থ হতে বাধ্য।

এইরূপ চিন্তার পর ইংরেজ সরকার মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁর সঙ্গীদের জেল হতে মুক্তি দিলেন।

কিন্তু সাধারণ কংগ্রেস কর্মী এবং দেশহিতৈষী ও স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণকারী জনসাধারণ মুক্তি পেল না।

ওদিকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় আইন অমান্য আন্দোলন পুরোমাত্রায় চলতে লাগলো। জনতা বিলিতি দ্রব্য বর্জন করলো।

তখনকার বড়লাট লর্ড আরুইন দেশের মধ্যে এইপ্রকার অশান্তি লক্ষ্য করে স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন, এই ব্যাপারে কংগ্রেসের সঙ্গে একটা আপোষ করা যাক।

এই উদ্দেশ্যে তিনি মহাত্মা গান্ধীকে আহ্বান জানালেন।

গান্ধীজী গেলেন। বসলেন বড়লাটের সঙ্গে দেশের সমস্যা নিয়ে আলোচনায়। দু'জনের মধ্যে চুক্তি হলো। এরই নাম হচ্ছে 'গান্ধী-আরুইন চুক্তি'।

এই চুক্তির বলে গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। আইন অমান্যকারীরা জেল থেকে মুক্তি পেলেন। মুক্তি পেলেন না। কেবল বিপ্লবী তরুণরা যাঁরা সন্ত্রাসের কাজে লিপ্ত ছিলেন এবং বিনাবিচারে জেলে আটক হন। তাঁদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফেরৎ দেবারও কোন প্রশ্ন উঠলো না।

কংগ্রেস এতে বিচলিত হলো না। নেতারা স্থির করলেন দ্বিতীয় গোল টেবিল-বৈঠকে যোগ দেবেন।

ওদিকে দেশের গণমানস গান্ধী-আরুইন চুক্তি মেনে নিতে পারলো না। তাঁরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন এই চুক্তির বিরুদ্ধে।

অগত্যা বিলেতে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হলো।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি বিলেতে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক বসলো। গান্ধীজী সেখানে গেলেন কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে। সেখানে তাঁর সঙ্গে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের যে সমস্ত আলোচনা হলো তাতে করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ভাবের মানুষ কিছুতেই একমত হতে পারলেন না।

সুতরাং দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হলো। গান্ধীজী ফিরে এলেন ভারতবর্ষে।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক বসবার আগে এদেশের অহিংস পন্থী নেতারা যখন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ইংরেজদের কাছ থেকে স্বরাজ পাবার আশায় মশগুল ছিলেন ঠিক সেইসময় এদেশে বিপ্লব সমিতির সদস্যরা নিষ্ক্রিয় রইলেন না। তাঁরাও বিপ্লবের দ্বারা ইংরেজ রাজত্ব খতম করবার পরিকল্পনা নিতে লাগলেন।

তাঁদের প্রথম আক্রমণ স্থল নির্বাচিত হলো চট্টগ্রামের ইংরেজের অস্ত্রাগার।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দ। এপ্রিল মাস। এই সময় এক গভীর রাতে সকলের অজ্ঞাতে একদল বিপ্লবী সামরিক বেশ ধারণ করে আক্রমণ করলেন চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার। তাঁদের নেতা হলেন বিপ্লবী সূর্য সেন বা মাষ্টারদা।

অস্ত্রাগারের রক্ষীরা বিপ্লবীদের বাধা দিতে এলো বটে কিন্তু তারা বিপ্লবীদের পিস্তলের গুলিতে প্রাণ হারাল।

বিপ্লবীরা তখন অস্ত্রাগারের মধ্যে প্রবেশ করে বহু কামান, বন্দুক, রাইফেল, পিস্তল এবং গোলাবারুদ হস্তগত করেন।

তাদের ভয়ে অনেক ইংরেজ নরনারী চট্টগ্রাম ত্যাগ করে পালিয়ে গেল।

তখন ইংরেজ সরকার স্বদেশ থেকে গোরা সৈন্য এনে বিপ্লবীদের দমন করতে এগিয়ে এলেন।

ইংরেজদের সঙ্গে বিপ্লবীদের তুমুল সংঘর্ষ হ'লো। বিপ্লবীরা জঙ্গলে ও পাহাড়ের অজ্ঞাত স্থানে লুকিয়ে থেকে শক্তিশালী ইংরেজের সঙ্গে গুলি বিনিময় করলেন।

বিপ্লবীদের সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যদের সংঘর্ষ বাধে জালালাবাদ পাহাড়ে। প্রথম সংঘর্ষে ইংরেজ সৈন্য বিশেষ সুবিধে করতে পারলো না। তারা বরং অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছিল।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কাজে অংশগ্রহণকারী বিপ্লবী আনন্দ প্রসাদ গুপ্ত প্রথম সংঘর্ষের কাহিনী এইরূপ লিখেছেন : 'বিকেল প্রায় পাঁচটা—এমন সময় জনবিরল নিস্তব্ধ জালালাবাদ হঠাৎ মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজে মুখর হয়ে উঠল! জালালাবাদের পাহাড় চূড়ায় নেমে এলো রণক্ষেত্রের উন্মত্ত উত্তেজনা। অবসাদগ্রস্থ বিদ্রোহীদের দুর্ব্বল দেহে যেন নতুন জীবন সঞ্চারিত হল—জালালাবাদের আকাশ বাতাস আলোড়িত করে ধ্বনিত হতে লাগল বিদ্রোহীদের জয়ধ্বনি—"বন্দেমাতরম্", "বন্দেমাতরম্"!

'মিলিটারী' বাহিনীর মূল পরিকল্পনা ছিল সোজাসুজি আক্রমণ চালিয়ে গোটা পাহাড়টি দখল করে বিদ্রোহীদের প্রত্যেককে সশরীরে বন্দী করা। কিন্তু সংঘর্ষের প্রথম ধাক্কাতেই মিলিটারী প্রভুরা বুঝতে পারলেন যে তাদের পরিকল্পনা সফল হবার নয়।

'পাহাড়ের কাছে আসতে না আসতেই বিদ্রোহী পক্ষ থেকে প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ শুরু হল—হতচকিত মিলিটারী পুঙ্গবরা প্রমাদ গুণল। তাদের মিলিটারী সুলভ দম্ভ নিয়ে তারা আশা করে এসেছিল সোজা গিয়ে পাহাড়ে উঠবে এবং অবলীলাক্রমে বিদ্রোহীদের সবাইকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করবে।

'কিন্তু সুরুতেই যে বিদ্রোহীদের কাছ থেকে এত প্রচণ্ড প্রতি-আক্রমণ আসবে তা তারা কল্পনাও করেনি।—বিদ্রোহীদের ছিল অবস্থানগত সুবিধা। পাহাড়চূড়া থেকে তাদের সমবেত অগ্নিবর্ষণের চাপে মিলিটারি বেসামাল হয়ে পশ্চাদপসরণের পথ নিতে বাধ্য হল। তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে মিলিটারী বাহিনী একটা নালার ভিতর আশ্রয় নিল। সেই নালার ভিতর লুকিয়ে থেকে তারা এবার অবিরাম ধারায় গুলি ছুঁড়তে লাগলো জালালাবাদের পাহাড়চূড়া লক্ষ্য করে।

'সংঘর্ষের এই প্রাথমিক অধ্যায়ে আমাদের একজনও হতাহত হয়নি। পাহাড়চূড়ায় সংগ্রামরত বিদ্রোহী সৈনিকরা মাটির সঙ্গে তাদের শরীর মিলিয়ে দিয়ে নীচের দিকে আক্রমণকারী মিলিটারী বাহিনীকে লক্ষ্য করে অপরাজেয় উদ্যম নিয়ে গুলি ছুঁড়তে লাগল।

'জালালাবাদ যুদ্ধের প্রথম পর্য্যায়ে শত্রুপক্ষের এই অবস্থানগত অসুবিধার জন্য অস্ত্রবল ও জনবলের প্রাধান্য সত্বেও তাদের একটা গুলির আঁচড়ও বিদ্রোহীদের গায়ে লাগেনি এবং এই একই কারণে শত্রুপক্ষের বেশ কিছু শক্তিক্ষয় হয়েছিল এই প্রথম সংঘর্ষে।'

এই সংঘর্ষে শত্রু পক্ষে বেশ কিছু মানুষ হতাহত হয়। তারা বিপ্লবী ফৌজের অনুকরণে পাহাড়ের চূড়ায় মেশিনগান বসিয়ে শত্রুপক্ষের দিকে অজস্রধারায় গুলিবর্ষণ করতে লাগলো।

ইংরেজদের এই প্রকার সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণের মুখে দাঁড়াতে পারলেন না বিপ্লবীরা। তার অন্য একটা কারণও ছিল। বিপ্লবীদের হাতে তেমন কোন উন্নত ধরণের অস্ত্রশস্ত্র ছিল না।

প্রথমেই মারা গেলেন তরুণ হরিগোপাল বল। প্রথম গুলি তাঁর পেট ফুঁড়ে চলে গেল।

এরপর আরও কয়েকটি গুলি এসে লাগলো হরিগোপালের দেহে।

তাঁর ক্ষত-বিক্ষত দেহ লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। ঐ অবস্থায়ও তাঁর চোখ দিয়ে আগুন বেরুতে লাগলো—মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলো 'বন্দেমাতরম্'।

তারপর তাঁর বড় ভাই লোকনাথ বলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, সোনাভাই চল্লাম। তোমরা চালিয়ে যাও।

এই কথা বলার পর চিরবিদায় নিলেন বিপ্লবী হরিগোপাল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল মাত্র ষোল বছর।

হরিগোপালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বিপ্লবী প্রাণ হারালেন ইংরেজ সৈন্যের গুলিতে। তাঁর নাম হচ্ছে নির্মল লালা, তিনি হচ্ছেন বিপ্লবীদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। বয়স মাত্র ১৪ বছর।

তাঁর গায়ে গুলি লাগা মাত্র তিনি হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠলেন। তিনি অল্পক্ষণের জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঐটুকু সময়ের জন্যে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

অন্যান্য বিপ্লবীরা তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, শুয়ে পড়, দাঁড়িয়ে থেকো না, গুলি লাগবে।

তিনি নিজে থেকে শুয়ে পড়লেন না। গুলির আঘাতে অজ্ঞান—অচৈতন্য দেহ মাটির ওপর চিরদিনের জন্যে লুটিয়ে পড়লো।

পৃথিবী থেকে শেষবারের মত বিদায় নেবার আগে তাঁর মুখ হতে উচ্চারিত হলো—'বন্দেমাতরম্'।

এরপর একে একে নিহত হলেন নরেশ রায়, বিধু ভট্টাচার্য্য, ত্রিপুরা সেন, প্রভাস বল, শশাঙ্ক দত্ত, জীতেন্দ্র দাস, মধুসূদন দত্ত এবং পুলিন ঘোষ।

এছাড়া গুরুতররূপে আহত হলেন অর্ধেন্দু দস্তিদার, মতিলাল কানুনগো, অম্বিকা চক্রবর্তী ও বিনোদ দত্ত।

অর্ধেন্দু দস্তিদার ও মতিলাল কানুনগো পরদিন সকালে মারা যান।

এরপর ২২শে এপ্রিল রাত প্রায় ২টার সময়ে চট্টগ্রাম থেকে প্রায় ৬১ মাইল দূরে ফেনী রেল ষ্টেশনে ঘটলো আর এক সংঘর্ষ। এই

সংঘর্ষে একদিকে ছিলেন চারজন বিপ্লবী অন্যদিকে দুর্ধর্ষ ইংরেজ পুলিশ ও মিলিটারী। চারজন বিপ্লবীর নাম হচ্ছে গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, জীবন ঘোষাল আর আনন্দপ্রসাদ গুপ্ত।

সংঘর্ষে জীবন ঘোষাল পুলিশের লাঠির আঘাত পান। তাঁর মাথা ফেটে যায়। পরে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। একজন পুলিশ সাব ইন্স্পেক্টর প্রাণ হারায় বিপ্লবীদের পিস্তলের গুলিতে।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দ। ২৪শে এপ্রিল।

কলেজের ছাত্র অমরেন্দ্র নন্দী বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে মাষ্টারদার অনুগতরূপে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

মাষ্টারদা জালালাবাদ থেকে বিপ্লবী অমরেন্দ্রকে পাঠালেন চট্টগ্রামে। উদ্দেশ্য শত্রুপক্ষের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা।

অমরেন্দ্র এলেন চট্টগ্রামে। তাঁর সঙ্গে দেখা হলো সশস্ত্র ইংরেজ পুলিশের। ২৪শে এপ্রিল তারিখের সংঘর্ষে অমরেন্দ্র গুরুতররূপে আহত হন এবং পরে হাসপাতালে মারা যান।

সরকারী বিবরণে তাঁর মৃত্যুকাহিনী এভাবে বিবৃত করা হয়েছে:

'২৪শে এপ্রিল সকালবেলা কনেষ্টবল চন্দ্রকুমার দে সদরঘাট রোডের ওপর জে, এম, সেনগুপ্তের খালি বাসায় অমরেন্দ্র নন্দীকে দু'হাতে পিস্তলসহ অবস্থায় দেখতে পায়। সে দৌড়ে সদরঘাট পুলিশ কেন্দ্রে গেল এবং ইন্‌স্‌পেক্টর ম্যাকডোনাল্ডকে খবর দিল। ইন্‌স্‌পেক্টর গিয়ে কোতোয়ালী পুলিশ ষ্টেশনে এবং পুলিশ সুপারি-ণ্টেনডেণ্টকে খবর দেয়। মিঃ জনসন একদল সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে গিয়ে সেই বাসাটি ঘেরাও করে তল্লাসী করেন কিন্তু সেখানে কাউকেই দেখতে পাওয়া গেল না। কিন্তু সে বাসার নিচের তলার একটি ছোট ঘরে একটা খাকি পোষাক, ধুতি, বিছানার চাদর এবং সবুজ রং-এর একটি বেল্ট দেখতে পাওয়া যায়। পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের কয়েকটি

বাসাও সেই সূত্রে তল্লাসী করা হল এবং অবলকরণ গলির একটু দূরে একটা কালভার্টের নিচে অমরেন্দ্রকে লুকান অবস্থায় দেখতে পাওয়া গেল।

তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হল কিন্তু সে তার জবাবে সেই কালভার্টের ভিতর থেকে গুলি ছুঁড়তে লাগলেন। মিঃ জনসন তখন সেই কালভার্টের দিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে লাগলেন। কালভার্টটি পরে ভেঙ্গে ফেলা হল এবং অমরেন্দ্র নন্দীকে গুরুতররূপে আহত অবস্থায় সেখান থেকে টেনে বের করা হল। তার এক হাতে ছিল একটি রিভলবার অপর হাতে ছিল একটি ছোট পকেট অটোমেটিক পিস্তল। নিকটস্থ ডাক্তার জগদা বিশ্বাস তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা করলেন। তারপর তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হল। অমরেন্দ্র সেই দিনই মারা গেল।'

পরদিন সকালে অমরেন্দ্রর দেহ পোষ্টমর্টম করা হয়।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দ। ৬ই মে।

স্বদেশ রায়, রজত সেন, মনোরঞ্জন সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, ফণী নন্দী, ও সুবোধ চৌধুরী—এই ছ'জন বিপ্লবী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের উদ্দেশ্যে কর্ণফুলী নদী পার হয়ে চট্টগ্রাম শহরের দিকে আসছিলেন। কিন্তু শহরের অবস্থা অনুকূল নয় দেখে গ্রামের দিকে ফিরে যেতে উদ্যত হলেন।

এমন সময় পুলিশ তাঁদের দেখতে পায় এবং একটা সামপানে করে তাঁদের অনুসরণ করে। এই প্রসঙ্গে সরকারী বিবরণের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করছি:

'৬ই মে রাত প্রায় ৮-৩০/৯টার সময় সাব ইনস্পেক্টর আবদুল আজিম ও ইনস্পেক্টর খান বাহাদুর আসানুল্লা কোতোয়ালি পুলিশ ষ্টেশনে কয়েকজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে বসেছিলেন। এমন সময় তারা সন্দেহজনক কয়েকটি লোকের গতিবিধি সম্পর্কে এক খবর

পেলেন। খবর পাওয়া মাত্রই তারা কর্ণফুলী নদীর তীরে ফিরিঙ্গি বাজারের প্রান্তে শাহজির ঘাটের দিকে ছুটে গেলেন। আবহুল আজিম আবতুস হক দোভাষীর ঘাটের দিকে গেলেন—সেখানে কাউকে দেখতে পেলেন না। কিন্তু তিনি আরও কতগুলো নতুন খবর পেয়ে অনুসন্ধান করার সময় দেখতে পেলেন জেঠি থেকে একখানা সামপাণ নদী পার হবার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাচ্ছে। তিনি সামপাণটিকে লক্ষ্য করে ডাক দিলেন কিন্তু কোন জবাব পেলেন না।'

এভাবে সূত্রপাত হলো কামারপোল সংঘর্ষের। পুলিশ বাহিনী প্রাণপণ চেষ্টায় তাঁদের অনুসরণ করতে লাগলো।

তাঁরাও পুলিশ বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে এগিয়ে চললেন।

তাঁরা শেষ পর্যন্ত পালাতে সক্ষম হতেন যদি না ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট রহিম আলি এবং গ্রামের আর পাঁচজন লোক বাধা না দিতো এবং পুলিশের হাতে তাঁদের ধরিয়ে না দিতো।

গ্রামের লোকের সঙ্গে পুলিশ বিপ্লবীদের পেছন পেছন ছুটলো।

অনেকক্ষণ ধরে এই প্রকার ধাবমান সংঘর্ষ চললো। সুবোধ চৌধুরী ও ফণী নন্দী এই দু'জন মাঝপথে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন।

অবশেষে বাকি চার জন গুরুতর রূপে আহত হয়ে সামর্থ্যহীন অবস্থায় এক জায়গায় এসে বাঁশ ঝোপের আড়ালে আশ্রয় নেন।

কিছুক্ষণ পরে ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল বারমার সাহেবের নেতৃত্বে আর এক পুলিশ ও মিলিটারী বাহিনী সেখানে উপস্থিত হলো। তারপর শুরু হলো কামারপোল সংঘর্ষের অন্তিম অধ্যায়টুকু। এই প্রসঙ্গে সরকারী বিবরণের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করছি :

'ইতিমধ্যে খবর পেয়ে ডি, আই, জি, মিঃ বারমার ইনস্পেক্টর ম্যাকডোনাল্ড, আবতুল আজিম, সাব ইনস্পেক্টর হেম গুপ্ত এই কজন ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেল্স ফৌজের আট জন সৈন্য ও চার জন কনষ্টেবল দ্বারা গঠিত আর একটি বাহিনী নিয়ে পুলিশ ফাঁড়ি থেকে দক্ষিণ দিকে

রওনা হয়ে উত্তর দেওয়ান নামক গ্রামে উপস্থিত হলেন। সেখানে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট আব্দুস্ সত্তারের কাছ থেকে আরও খবর পেয়ে শিকলবাহা খালের পশ্চিম পাড়ে গিয়ে আব্দুস সত্তার ও আরও কয়েকজন গ্রামবাসীকে সঙ্গে নিয়ে প্রায় দেড় মাইল পথ দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে ফকিরণির হাটে পৌঁছলেন। সেখান থেকে আহমদ্ মিঞা নামক জনৈক গ্রামবাসীর নির্দ্দেশে তাঁরা আরও পোয়া মাইল পথ হেঁটে গিয়ে জুলদা নামক স্থানে উপস্থিত হলেন। গ্রামবাসীটি একটি পুকুর পাড়ের বাঁশ ঝোপের দিকে দেখিয়ে দিতেই তাঁরা দেখতে পেলেন সেই ঝোপের ভেতর একটা জায়গায় চার জন যুবক জড় হয়ে শুয়ে রয়েছে। আহমদ্ মিঞা 'ওই যে সেই লোকগুলি' বলে চেঁচিয়ে উঠতেই সেই কজন যুবক গুলি ছুঁড়তে শুরু করলো—ডি, আই, জি, ও তার দলও তাদের প্রত্যুত্তরে গুলি ছুঁড়তে লাগলো।

তিন চার মিনিট ধরে উভয় পক্ষের গুলি বিনিময় চললো। তারপর বাঁশ ঝোপ থেকে আর কোনো গুলির শব্দ পাওয়া গেল না। ডি, আই, জি, ও অন্যান্য সবাই তখন এগিয়ে গেলেন এবং গিয়ে দেখতে পেলেন তাদের ভিতর তিনজন মরে পড়ে রয়েছে আর চতুর্থ জন গুরুতর-রূপে আহত হয়েছে। আবদুল আজিম (সাব্ ইনস্‌পেক্টর) ও হেম গুপ্ত (সাব্ ইনস্‌পেক্টর) মৃতদের ভিতর দু'জনকে—রজত সেন ও মনোরঞ্জন সেন বলে চিনতে পারলো। আহত যুবকটিকেও তারা দেবপ্রসাদ গুপ্ত বলে চিনতে পারলো। এদের তিন জনকে এরা আগে থেকেই চিনতো। কিন্তু বাকী মৃতদেহটিকে তারা সনাক্ত করতে পারে নি—দেবপ্রসাদ গুপ্ত বললো যে তার নাম স্বদেশ রায়। ঘণ্টাখানেকের ভিতরই দেবপ্রসাদ মারা গেল।'

পরদিন বিপ্লবীদের মৃতদেহ পোষ্টমর্টেম-এ পাঠান হলো। সিভিল-সার্জেন সেগুলি পরীক্ষান্তে যে বিবরণ দেন তাতে প্রকাশ, বিপ্লবীদের প্রত্যেকের দেহে দু একটি গুলির ক্ষত স্বেচ্ছাকৃত।

এর থেকে মনে হয়, আত্মসমর্পণের সম্ভাবনা থেকে রেহাই পাবার

উপায় স্বরূপ অমরেন্দ্র নন্দীর মত তাঁরাও নিজেদের পিস্তলের গুলিতে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করে নেন।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দ। ১লা সেপ্টেম্বর।

কলকাতার তখনকার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট-এর নেতৃত্বে বাছা বাছা গোরা সার্জেন্টদের এক বাহিনী এলো চন্দননগরের গোন্দলপাড়ার এক বাসায়।

ঐ বাসায় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের সঙ্গে জড়িত চারজন বিপ্লবী আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁরা গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, জীবন ঘোষাল ও আনন্দপ্রসাদ গুপ্ত।

তখন চন্দননগর ছিল ফরাসী সরকারের অধীনে। তাই ওখানে থাকা নিরাপদ মনে করে বিপ্লবীরা ওখানে আশ্রয় নেন।

কিন্তু সেখানেও নজর পড়লো ইংরেজ পুলিশের। তারা দলবল নিয়ে আক্রমণ করতে এলো।

চন্দননগরের বাসায় এসে বিপ্লবীদের লক্ষ্য করে ইংরেজ পুলিশ গুলি ছুঁড়লো। গুলির আঘাতে জীবন ঘোষাল মারা যান। এই প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

'বেশীক্ষণ এই অসমান যুদ্ধ স্থায়ী হওয়া সম্ভব ছিল না। একদিকে বিপুল পুলিশ বাহিনী অপর দিকে আমরা চারজন—গণেশদা, লোকনাথ বল, জীবন ঘোষাল ও আমি।...অল্প কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই জীবন ঘোষালের মাথায়, বুকে ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে এক ঝাঁক গুলি এসে লাগল এবং সেই মুহূর্তে তার মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল পাশের পুকুরে, তলিয়ে গেল জলের ভিতর।'

এরপর বিপ্লবীরা মাষ্টারদার অধীনে গেরিলা যুদ্ধের তালিম নেন। বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালী চক্রবর্তী ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তারিখে চাঁদপুর ইনস্‌পেক্টর জেনারেলের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ চালান।

বিপ্লবীরা শেষ রাতে আক্রমণ চালান। তখন ইনস্‌পেক্টর জেনারেল

ট্রেণ থেকে নেমে ষ্টীমার ঘাটের দিকে কয়েক পা অগ্রসর হয়েছেন এমন সময় দু'জন ঝাঁপিয়ে পড়লো তাঁকে লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে রিভলবার দুটো গর্জে উঠলো।

কিন্তু ফল হলো অন্য। ইনস্‌পেক্টরের পার্শ্বচর গোয়েন্দা ইনস্‌পেক্টর তারিণী মুখার্জি প্রাণ হারালেন বিপ্লবীদের গুলিতে।

পরে ঘটনাস্থল হতে ১৫ মাইল দূরে বিপ্লবীরা গ্রেপ্তার হন। তাঁদের আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাখা হলো। মাষ্টারদার খবর জানাবার জন্যে তাঁদের ওপর যথেচ্ছ নির্য্যাতন করা হলো।

কিন্তু তাঁরা নিজেদের গোপন কথা ব্যক্ত করলেন না।

বিচারে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসি এবং কালী চক্রবর্ত্তীর যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হয়।

এরপর ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট। এই দিনে পুলিশ ইনস্‌পেক্টর আসানুল্লা খেলার মাঠে ফুটবল ম্যাচ দেখছিলেন।

সেই সময় বিপ্লবী হরিপদ ভট্টাচার্য্য ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই কুখ্যাত ইনস্‌পেক্টরের ওপর।

তাঁর উদ্যত রিভলবার গর্জে উঠলো সেই অত্যাচারীর দেহ লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে আসানুল্লার প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়লো।

বিচারে হরিপদর যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হয়।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দ। ১৩ই জুন।

এই তারিখে আরম্ভ হয় ধলঘাট সংঘর্ষ। ক্যাপ্টেন ক্যামারুণ, পুটিয়ার দারোগা মনোরঞ্জন বসু, এস, আই শৈলেন, একজন হাবিলদার, দু'জন কনেষ্টবল ও সাতজন সিপাই নিয়ে ধলঘাটের এক বাড়ীতে হানা দেয়। ঐ বাড়ীতে দোতলার ঘরে আত্মগোপন করেছিলেন বিপ্লবী নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন। তাঁদের সঙ্গে পুলিশের গুলি বিনিময় হয়। ফলে দু'জন বিপ্লবী ঘটনাস্থলে মারা যান।

মৃত্যুকালে নির্মল সেনের বয়স ছিল ৩৫ এবং অপূর্ব সেনের ১৫।

এই সময় আরও দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। একটি হচ্ছে কুমিল্লার পুলিশ সুপার এলিসনকে হত্যা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেট ডুর্ণোকে আক্রমণ। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত বিপ্লবীদের অনুসন্ধান করতে পারেনি পুলিশ।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দ। ২৪শে সেপ্টেম্বর। গভীর রাত্রি। মাষ্টারদার প্রিয় সঙ্গিনী এবং বিপ্লবের কাজে দক্ষা প্রীতিলতা এগিয়ে এলেন শ্বেতাঙ্গদের সমুচিত শিক্ষা দিতে।

এই প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার প্রসঙ্গে চট্টগ্রামের অন্যতম বিপ্লবী ও প্রীতিলতার সহকর্মী আনন্দপ্রসাদ গুপ্ত লিখেছেন: 'বিদ্রোহী বাংলার প্রথম নারী শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার ছিলেন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা গৌরবজ্জ্বল অধ্যায়ের অবিস্মরণীয় অগ্রদূত।

'বিপ্লবী জীবনের কঠোর আত্মত্যাগ ও সাহসের পরীক্ষায় নারীরাও যে পুরুষের সমকক্ষ হতে পারে তা প্রথম প্রমাণ করেছেন প্রীতিলতা তাঁর নিজের জীবন দিয়ে। বিপ্লবী সংগ্রামের ক্ষেত্রে নারীদের স্থান নেই এতদিন এই ছিল সবার ধারণা এবং চট্টগ্রামের সন্ত্রাসবাদী সংগঠন প্রথম থেকেই এই ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। তাই সংগঠনের প্রথম অবস্থায় নারীদের বিপ্লবী রাজনীতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জনীয় বলে গণ্য করা হত।

অস্ত্রাগার আক্রমণের পর মাষ্টারদা তাঁর ফেরারী জীবনের অসংখ্য অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে এই পূর্ব অনুষ্ঠিত নীতির একতরফা অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে সচেতন হবার পরিপূর্ণ সুযোগ পান।

'সেই বিপদসঙ্কুল সময়ে চট্টগ্রামের নারী সমাজের কাছ থেকে যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত সমর্থন তাঁরা পেয়েছেন তার থেকে তিনি উপলব্ধি করেন যে আপাতদৃষ্টিতে যে নারী সমাজকে নির্জ্জীব ও নিরুৎসাহ বলে মনে হয় তার ভিতরও প্রচুর বিপ্লবী সম্ভাবনা রয়েছে। যুগ যুগ ধরে সহস্র বাধা নিষেধের কঠোর অবরোধ দেশের নারী সমাজকে গতিশীল

জগতের বৃহৎ পরিধি থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্ধকার গৃহকোণে বন্দী করে রেখেছে। তাই আপাত-দৃষ্টিতে তাদের প্রাণশক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু একবার যদি তাঁরা পথের সন্ধান পান তা হলে তাঁরাও অসাধ্য সাধন করতে পারেন।

'বেছে বেছে প্রীতিলতাকেই মাষ্টারদা দিলেন সে সময়কার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের নেতৃত্বভার। প্রীতিলতা প্রথম একটু অবাক্ হয়ে যান—এত উপযুক্ত পুরুষ সহকর্মী থাকতে তাঁর মত 'সামান্য' একজন নারীকে দেওয়া হচ্ছে এ হেন দুঃসাহসিক কাজের প্রধান দায়িত্ব।

'কিন্তু মাষ্টারদা তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে, 'সামান্য' নারী দ্বারা যে কত অসামান্য কাজ হতে পারে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য তিনি অতি সুচিন্তিত ভাবেই তাকে এই দায়িত্ব দিচ্ছেন।'...

চট্টগ্রাম পাহাড়তলীতে ছিল ইউরোপীয়ান ক্লাব। সেখানে শ্বেতাঙ্গ পুরুষ-রমণী অবসর সময়ে চিত্ত বিনোদনের কাজে নিযুক্ত থাকতো। নেটিভদের সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদারের নেতৃত্বে ৮জন তরুণ বিপ্লবী ঐ ক্লাব আক্রমণ করলেন।

বিপ্লবীদের হস্তস্থিত রিভলবারের গর্জনে ক্ষণিকের জন্যে প্রমোদ-শালার শান্ত আবহাওয়া অশান্ত হয়ে ওঠে। উপস্থিত শ্বেতাঙ্গ সভ্য ও সভ্যাদের ভেতর মিসেস অলিভান নামে একজন হত ও কয়েকজন আহত হয়। পুলিশ এসে বেপরোয়াভাবে বিপ্লবীদের ওপর গুলি ছোঁড়ে।

গুরুতর রূপে আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যান প্রীতিলতা। জীবন্ত দেহে পুলিশের হাতে অপমানিত হবার আশঙ্কা থেকে রেহাই পাবার জন্যে পটাশিয়াম সাইনাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন এই বীরাঙ্গণা।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ। ১৬ই ফেব্রুয়ারী। ইংরেজ পুলিশ ও মিলিটারির

হাতে ধরা পড়লেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক বিপ্লব চূড়ামণি সূর্য সেন বা মাষ্টারদা। নেত্র সেন নামে মাষ্টারদার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় ষড়যন্ত্র করে ইংরেজদের কাছে তাঁর গোপন খবর ফাঁস করে দেন। তাই ইংরেজ পুলিশের পক্ষে তাঁকে ধরা অতো সহজ হয়েছিল। কিন্তু পরে বিপ্লবীদের হাতে নেত্র সেন নিহত হন বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে।

এখানে বিপ্লবী সূর্য সেন বা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক মাষ্টারদার সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্যে লিপিবদ্ধ করা যাক।

চট্টগ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন মাষ্টারদা। তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ থেকে যখন তিনি বহরমপুর কলেজে বি, এ, ক্লাশের ছাত্র ছিলেন।

ঐ সময়ে তিনি কলেজ হোষ্টেলে অন্যান্য সহপাঠীদের সঙ্গে থাকতেন।

একদিন পুলিশ এসে হোষ্টেলে খানাতল্লাসী চালায়।

খানাতল্লাসীর পর পুলিশ ফিরে গেলে সূর্য সেন কয়েকজন আবাসিক সহপাঠীদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের ঘরে পুলিশ ঢুকেছিল কেন?

উত্তরে সহপাঠীরা বললে, পুলিশ জানতে এসেছিল আমরা সন্ত্রাস-বাদী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত আছি কি না।

সেই সময় এবং তার আগের কয়েক বছর বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক আকাশ ছিল ঘন-গম্ভীর মেঘে ভরা। বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে চলছিল ব্যাপকভাবে অসহযোগ এবং বিদেশী দ্রব্য বর্জন আন্দোলন।

সহপাঠীদের কাছ থেকে ঐ খবর শোনার পর মাষ্টারদার মনে রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে উৎসাহ ও কৌতূহল জাগে।

বি, এ, পাশ করার পর তিনি রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগলেন।

এই সময় তিনি বিয়েও করলেন।

প্রকাশ্য রাজনীতির ক্ষেত্রে সূর্য সেনের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে কংগ্রেসের প্রথম অসহযোগ আন্দোলনের সময়।

তখন সরকারী স্কুল-কলেজ বর্জন করা হয়েছে। তার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—ন্যাশনাল স্কুল। বলাবাহুল্য সূর্য সেন ছিলেন ঐ শিক্ষায়তনের অন্যতম শিক্ষক। তখন থেকে তিনি চট্টগ্রামবাসীদের কাছে প্রিয় মাষ্টারদা নামে পরিচিত হলেন।

তখন চট্টগ্রামের বিপ্লবী দল অতিশয় ক্ষুদ্র ছিল। তাঁদের কার্য্যকলাপও ছিল সীমিত। পরে ঐ দল বিরাট রূপ গ্রহণ করে সূর্য সেনের অপূর্ব সংগঠনী প্রতিভার গুণে।

তখনকার দিনে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনা অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় মাষ্টারদার বিপ্লবময় রাজনৈতিক জীবন।

এরপর চট্টগ্রামে যতবার হরতাল ও ছাত্র ধর্মঘট হয়েছে সেসবগুলির নেতৃত্ব নিয়েছেন মাষ্টারদা। তাঁর সঙ্গে একনিষ্ঠ ভাবে সহযোগিতা করেছেন অনন্ত সিং।

এরপর মাষ্টারদার জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটলো বুলক ব্রাদার্স স্টীমার ধর্মঘটের রোমাঞ্চকর ঘটনা।

এক দিকে স্টীমার কোম্পানী জেদ ধরে আছে যে তারা কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের সকল রকম বিরোধিতা সত্ত্বেও জাহাজ চালাবে, আর একদিকে মাষ্টারদার দলও বদ্ধপরিকর কিছুতেই তারা জাহাজ চালাতে দেবেন না। শেষ কালে মাষ্টারদার দলেরই জয় হলো।

এই প্রসঙ্গে মাষ্টারদার অন্যতম সহকর্মী বিপ্লবী অনন্ত সিং-এর বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করলে ভাল হয়: 'রাত তখন ৯টা বেজে গেছে, সদর ঘাট ব্রীজে আমরা জড়ো হয়েছি। আমরা পাঁচ জন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক একটা ছোট সামপাণ ভাড়া করে তাতে চাপলাম।

'স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে সামপাণখানা তরতর করে এগিয়ে

চলল। প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে সামপাণ চালাবার পর আমরা নিঃশব্দে আমাদের গন্তব্য স্থানে এসে পৌঁছলাম।

'সামপাণখানা ডবল মুরিং জেটিতে নির্দ্দিষ্ট জাহাজের পাশে এসে লাগল। আমাদের সঙ্গে সে জাহাজের একজন খালাসীও ছিলেন। জাহাজের ভেতরেও আমাদের বিশ্বস্ত লোক ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে সঙ্কেত বিনিময়ের পর আমাদের সামপাণখানা জাহাজের এমন এক অংশের কাছে লাগল যেখান থেকে কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ না করেই জাহাজের ভেতর ঢুকে পড়া যায়। পূর্ব্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ষ্টীমার থেকে একটা দড়ি নামল। আমরা পাঁচজন সেই দড়ি বেয়ে জাহাজের নিভৃত প্রবেশ স্থানটির ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে ঢুকে জাহাজের ডেকে উঠলাম।

আমার তখন বুক দুর দুর করছে—এর পর নাজানি কি অঘটন ঘটবে। যদি খালাসীদের কেউ বিশ্বাসীদের কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে তাহলে আমাদের সবাইকে গ্রেপ্তার তো করবেই কিন্তু তার আগে জাহাজের ক্যাপ্টেন তার আজ্ঞাবাহী লোকদের দিয়ে যে খুব একচোট উত্তম মধ্যম দেবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

'সৌভাগ্যক্রমে কোন দুর্ঘটনা ঘটল না। জাহাজের খালাসীদের সঙ্গে দেখা হতেই তাঁরা আন্তরিক সহানুভূতি নিয়ে আমাদের গ্রহণ করলেন। কংগ্রেস ও খিলাফৎ সম্পর্কে তাঁদের খুব উঁচু ধারণা ছিল, তাঁরা পরিস্কার আমাদের বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁরা তৈরী হয়েই আছেন।

'জাহাজ ছেড়ে আবার আমরা সামপাণে চাপলাম। এই যাওয়া-আসা পর্ব্ব খুব গোপনে সারতে হয়েছে কারণ তখনকার দিনেও বিনা অনুমতিতে ডবল মুরিং জেটিতে ঢোকা বারণ ছিল। বিশেষ করে অসহযোগ আন্দোলনের সময়কার ধর্ম্মঘটের ভয়ে কড়াকড়ি আরোও বেড়ে গিয়েছিল, তাই আমাদের এত সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়েছিল।

'পরদিন সকালবেলা—তখন প্রায় ৮টা বেজেছে; দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত ডবল মুরিং জেটির কাছে এসে দাঁড়ালেন। 'বন্দেমাতরম্' ও 'আল্লা হো আকবর' সঙ্কেতধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের খালাসীরাও তার প্রতিধ্বনি করে সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করতে লাগলেন। তাঁরা যে সত্যি সত্যি মনে প্রাণে তৈরী হয়েছিলেন সে সম্পর্কে আর আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। জাহাজের ক্যাপ্টেন কিন্তু অত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র ছিল না। সে জাহাজের ইঞ্জিন চালককে ইঞ্জিন চালাবার হুকুম দিল। আস্তে আস্তে জাহাজ নড়তে সুরু করল। কিন্তু খালাসীরাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে কিছুতেই তাঁরা হার মানবেন না।

'তারপর এক মজার ঘটনা ঘটল! একের পর এক খালাসীরা ধুপ ধুপ করে লাফ দিয়ে নদীতে পড়তে লাগলেন—তারপর তাঁরা সাঁতরে এসে যোগ দিতে লাগলেন আমাদের সঙ্গে। সে এক অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা, জীবনে অত খুসী বোধহয় আর হই নি! সে দৃশ্য চোখে না দেখলে তার পরিপূর্ণ তৃপ্তি উপভোগ করা যায় না। অতবড় জাহাজটা অচল হয়ে রইল। সারা রাত ধরে আমরা সামপাণে করে সে জাহাজের উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিলাম, কোম্পানীর দালালরা এসে যাতে ধর্ম্মঘটে ভাঙ্গন ধরাতে না পারে।'

মাষ্টারদা কংগ্রেসী অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেও তাতে বেশীদিন লিপ্ত থাকতে পারলেন না। কারণ তিনি দেখলেন যে কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলন করেও স্বাধীনতা সংগ্রামকে পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারছে না। ইংরেজ সরকারের দমননীতি এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য-সভ্যাদের ওপর সমান ভাবে এসে পড়ছে। তাছাড়া নরমপন্থী কংগ্রেসীদের নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে স্বাধীনতা আন্দোলন মাষ্টারদার মত চরমপন্থী বিপ্লবীদের মনপূতঃ হলো না। তাই মাষ্টারদা ও তাঁর সহকর্মীরা বিপ্লবের পথে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

কিছুদিন পরে অসহযোগ আন্দোলনে ডাক পড়লো। চৌরিচৌরার ঐতিহাসিক ঘটনার ভেতর কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দেখলেন এক বিপদের সঙ্কেত।

এই বিপদ ঘোরতর রূপ নেবার আগেই তাকে স্তব্ধ করা হলো। নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের নীতিগত ও সংগঠনগত বিদ্বেষ অনিবার্য্য হয়ে উঠলো।

এই সময় মাষ্টারদার উৎসাহে চট্টগ্রামে প্রথম স্বদেশী ডাকাতি অনুষ্ঠিত হলো। এতে বিপ্লবীরা মাত্র কয়েকশো টাকা সংগ্রহ করতে পারলেন।

পুলিশ মাষ্টারদার ওপর সন্দেহ করলেও উপযুক্ত প্রমাণাদির অভাবে তারা মাষ্টারদা বা তাঁর সহযোগীদের গ্রেপ্তার করতে অসমর্থ হলো।

এরপর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মাষ্টারদাকে চট্টগ্রামের মানুষ নতুন করে চিনলো। ঐসময় মাষ্টারদার নেতৃত্বে আসাম রেলওয়ে ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে করে বেশ কয়েক হাজার টাকা বিপ্লবীদের হস্তগত হলো।

ঘটনার দু'দিন পরে গুজব উঠলো, একদল দুর্ধর্ষ স্বদেশী যুবক আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানীর ১৭০০০ টাকা দিন দুপুরে সশস্ত্র প্রহরার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে।

পুলিশ ডাকাত দলকে ধরবার জন্যে উঠেপড়ে লেগে গেল।

ওদিকে মাষ্টারদা তাঁর সঙ্গী অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিং, রাজেন দাস, ও দেবেন দে-কে নিয়ে ঘটনাস্থল হতে দু'মাইল দূরে মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল নাগারখানার সুলকবহর কুঠিতে এসে আশ্রয় নেন।

কিন্তু সেখানেও তাঁরা বেশিদিন পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে বাস করতে পারলেন না।

পুলিশ দারোগা আবদুল মজিদ স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিপ্লবীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

বিপ্লবীরাও নিজেদের সামান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লেগে গেল পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে। এই সংঘর্ষ ইতিহাসে নাগারখানা সংঘর্ষ নামে বিখ্যাত হয়ে আছে।

এই সংঘর্ষে পুলিশের গুলিতে আহত হন মাষ্টারদা, অম্বিকা চক্রবর্তী ও রাজেন দাস। পুলিশপক্ষে একজন হাবিলদার নিহত ও কয়েকজন পুলিশ আহত হয়।

মাষ্টারদা ও তাঁর সঙ্গীরা পুলিশের হাতে বন্দী হবার ভয়ে বিষপান করে আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যর্থ হন।

অবশেষে তাঁরা পুলিশের হাতে বন্দী হন। কিছুদিন পরে অনন্ত সিংও ধরা পড়লেন।

তাঁরা এসে রইলেন চট্টগ্রাম জেলে। মাষ্টারদার জীবনে এই প্রথম কারাবাস।

আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ডাকাতি নাম দিয়ে শুরু হলো মাষ্টারদা ও তাঁর সঙ্গীদের বিচার।

মাষ্টারদা যখন জেলে ছিলেন তখন তাঁর স্ত্রী বিপ্লবীদের মধ্যে কাজ করতে লাগলেন।

বেশ কিছুদিন ধরে মামলা চললো। কলকাতা থেকে এলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত। তিনি আসামীদের পক্ষ সমর্থন করে বেশ কিছুদিন মামলা চালালেন।

শেষকালে প্রমাণাদির অভাবে মামলা খারিজ হয়ে গেল। আসামীরা বেকসুর মুক্তি পেলেন।

তাঁরা মুক্তি পেলেন দেখে পুলিশের কর্তারা প্রমাদ গুণলো। এর প্রায় মাসখানেক পর এক অর্ডিন্যান্স জারি হলো। তার বলে অনেক বিপ্লবীদের বিনা বিচারে আটক রাখা হলো।

মাষ্টারদাকে পুলিশে ধরতে পারলো না। তিনি কৌশলে গা-ঢাকা দিয়ে কলকাতা প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে গোপনে বিপ্লবের কাজ করতে লাগলেন।

অবশেষে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন।

রাজবন্দী অবস্থায় তিনি রইলেন মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে। তখন ঐ জেলে গণেশ ঘোষ, নিরঞ্জন সেন, সতীশ পাকড়াশী প্রমুখ বিপ্লবীরাও ছিলেন।

এরপর ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলে রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে কাটিয়েছেন মাষ্টারদা।

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বাংলাদেশের জেলখানায় রাখা নিরাপদ নয় জেনে তাঁদেরকে বাংলাদেশের বাইরে বিভিন্ন জেলে রাখা হয়।

কিছুদিন মেদিনীপুর সেন্টাল জেলে থাকার পর মাষ্টারদা স্থানান্তরিত হন বোম্বাইয়ের রত্নগিরি জেলে। তারপর তাঁকে বেলগাঁও জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে মাষ্টারদার স্ত্রী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। মাষ্টারদা তখন পাহারাধীন অবস্থায় বেলগাঁও জেল থেকে চলে এলেন চট্টগ্রামে মুমুর্ষু স্ত্রীকে দেখতে।

স্ত্রী আর বাঁচলেন না। মারা গেলেন।

এবার মাষ্টারদাকে তাঁর গ্রামের বাড়ীতে অন্তরীণ করে রাখা হলো।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে তিনি বিনাসর্তে মুক্তি পেলেন।

মুক্তি পেয়ে মাষ্টারদা আবার শুরু করলেন তাঁর বিপ্লবময় রাজনৈতিক জীবন। তাঁকে কাছে পেয়ে চট্টগ্রামের তরুণদের মনে-প্রাণে আবার সাড়া জাগলো। পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠলো ক্লাব। লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, বক্সিং প্রভৃতি শেখান হতে লাগলো।

কেবল তাই নয় ঘোড়ায় চড়া, মোটর চালান, বন্দুক ছোঁড়া, সামপাণ নামে এক জাতীয় নৌকো চালান শিক্ষা—এসবই চলতে লাগলো ক্লাবগুলির সহযোগিতায়।

মুক্তি পাবার পর মাষ্টারদা চট্টগ্রাম কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের পদে নির্বাচিত হন।

এই সময়ে তিনি অতি কষ্টে দিনাতিপাত করতেন। একটা ভাঙা ঘরে থাকতেন। দু'তিনটি ছেলে পড়িয়ে যাকিছু উপার্জন করতেন তাই দিয়ে নিজের দৈনন্দিন খরচ চালাতেন। নিজের হাতে রান্নাও করতেন। নেতৃত্বের অহমিকা বা সেইমত আভিজাত্যময় চালচলন তাঁর মধ্যে প্রকাশ পায়নি।

এই প্রসঙ্গে তাঁর জনৈক সহকর্মী বিপ্লবী আনন্দ প্রসাদ গুপ্ত লিখেছেন :

'....রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় নেতৃস্থানীয়রা যতই নেতৃত্বের সিঁড়ি বেয়ে উর্দ্ধে আরোহণ করেন ততই তাঁদের দৈনন্দিন জীবন প্রণালীও যেন বদলে যায়। আভিজাত্যের বিকৃতি এসে পড়ে তাঁদের জীবন যাত্রায়। তাঁদের সম্মান বোধের মাপকাঠিও যেন বদলে যায়। সাধারণ কর্ম্মীর পক্ষে অসাচ্ছন্দ্যকর যে সব কাজ স্বাভাবিক বলে ধার্য্য হয়ে থাকে তা এইসব নেতাদের পক্ষে অসম্মান-জনক বলে গণ্য হয়।—তাই যখনই দেখতাম আমাদের দলের শ্রেষ্ঠ নেতা নিজের হাতে রান্নার উনুন ধরাচ্ছেন তখন মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতাম তাঁকে।'...

মাষ্টারদা এবং তাঁর সঙ্গীগণ কংগ্রেস দলের মধ্যে থেকে দেশের কাজ চালিয়ে যেতে মনস্থ করলেন। তবে তাঁরা কংগ্রেসের অহিংসা-নীতিকে স্বরাজ লাভের উপায় রূপে বিশেষ প্রাধান্য দেননি। তাঁরা চাইলেন বিপ্লবের পথে স্বরাজ লাভ।

পরে তাঁদের সে ইচ্ছা পূর্ণ হলো ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল তারিখে চট্টগ্রাম শহরের ইংরেজদের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মাধ্যমে। সেদিন মাত্র ৬৫ জন তরুণ মাষ্টারদার নেতৃত্বে এই কাজে অগ্রসর হন এবং পূর্ণ সাফল্যলাভ করতে না পারলেও তাঁরা ক্ষণিকের জন্যে ইংরেজ শাসকদের নাস্তানাবুদ করেন। এই প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শী এবং অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কাজে অংশগ্রহণকারী বীর বিপ্লবী আনন্দ প্রসাদ গুপ্তের জবানবন্দী এখানে উদ্ধৃত করছি :

'১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ—শুক্রবার···গুডফ্রাইডে—সাহেবদের পরবের দিন। আমাদেরও সবে-সুরু-হওয়া বিপ্লবী জীবনের সব চাইতে রোমাঞ্চকর দিন,—আর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের স্মরণীয় ও বরণীয় মুহূর্ত্তগুলির অন্যতম।

'আঠার বৎসর পূর্ব্বে এই দিনে বাংলার পূর্ব্বতম প্রান্তের চট্টগ্রাম সহরে যে ঘটনা ঘটেছিলো তাতে চমকে উঠেছিলেন দেশশুদ্ধ সবাই। বিস্ময়ে হতবাক দেশবাসী একদিন শুনলেন একদল তরুণ বিপ্লবী সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে সুপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে। তাদের তড়িৎ আক্রমণে চট্টগ্রামের সরকারী কেন্দ্রসমূহ বিপর্য্যস্ত··· সুরক্ষিত অস্ত্রাগার ইংরেজের হস্তচ্যুত····শাসন যন্ত্র বানচাল···সহরের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীবৃন্দ পলায়মান···বহির্জগতের সঙ্গে চট্টগ্রামের যোগ-সূত্র বিচ্ছিন্ন,····টেলিফোন, টেলিগ্রাফ যোগাযোগ বিধ্বস্ত,···রেলের লাইন উৎপাটিত···ইত্যাদি ইত্যাদি। সংবাদপত্রে বড় বড় হরফে সে খবর যথা সময়ে পৌঁছল দেশের সর্ব্বত্র। আয়ারল্যাণ্ডের ইষ্টার বিদ্রোহের পুনরাবৃত্তি ভারতের ভূমিতে।—আর সঙ্গে সঙ্গে সুরু হল সৃষ্টি-কুশল জল্পনা-কল্পনা। কেউ বা শুনলেন বিদ্রোহীদের সংখ্যা পঁচিশ, আবার কেউ বা শুনলেন হাজার খানেক।

'নূতন করে আবার সবাইকে অবাক্ হতে হল যখন অস্ত্রাগার 'লুণ্ঠন' মামলায় প্রকাশ পেল যে বিদ্রোহীদের সংখ্যা পাঁচশ বা হাজার তো দূরের কথা এমন কি একশও ছিল না। মাত্র ৬৫ জনের কর্ম্মক্ষমতায় এত বড় একটি কাণ্ড ঘটেছিল এবং তাদের ভিতরও শতকরা ৭০ জনেরও বেশি ছিল ১৪ বৎসর থেকে ১৯ বৎসরের তরুণ।'···

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ। ১৯শে মে।

চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার অন্তর্গত গাহিরা গ্রাম। এই গ্রামের একটি বাড়ীতে তিনজন ফেরারী বিপ্লবী আশ্রয় নেন। তাঁরা হলেন তারকেশ্বর দস্তিদার, কল্পনা দত্ত এবং মনোরঞ্জন দাস।

ভোর না হতেই মেজর কীনের নেতৃত্বে একদল পুলিশ এসে সে বাড়ী ঘেরাও করে ফেলে। কারুরই বেরুবার কোন উপায় রইলো না।

সেই অবরুদ্ধ বাড়ীর ওপর চারদিক থেকে অবিরাম গুলিবৃষ্টি হতে লাগলো।

পুলিশের গুলিতে নিহত হলেন গৃহস্বামী পূর্ণ তালুকদার এবং বিপ্লবী মনোরঞ্জন দাস। গৃহস্বামীর ভাই নিশি তালুকদার আহত হন। তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্তকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়ে চট্টগ্রাম জেলে রাখা হলো।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দ। ২রা জানুয়ারী।

চট্টগ্রামের সন্ত্রাসবাসী সংগ্রামের ঘটনাবহুল ইতিহাস প্রায় সমাপ্তি পথে। ইতিমধ্যে পুলিশের গুলিতে অনেক বিপ্লবী প্রাণ হারিয়েছেন। নেতৃস্থানীয় অনেকে ধরা পড়ে হাজত বাস করছেন। সুতরাং তাঁদের সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখবার উপায় নেই। তা সত্ত্বেও বাইরে যে ক'জন বিপ্লবী ছিলেন তাঁরা অসহায় বোধ করলেন না। তাঁরা এগিয়ে এলেন নিজেদের কাজ সফল করতে। বিপ্লবী হিমাংশু চক্রবর্তী, নিত্য সেন, হরেন চক্রবর্তী ও কৃষ্ণ চৌধুরী ক্রিকেট মাঠে খেলা দেখবার ছলে এসে শ্বেতাঙ্গ দর্শকদের লক্ষ্য করে পর পর কয়েকটি বোমা নিক্ষেপ করলেন। সেই সঙ্গে রিভলবারের গুলিও ছুঁড়লেন।

কিন্তু তাঁদের সে আক্রমণ একেবারে নিষ্ফল হলো। উপস্থিত শ্বেতাঙ্গ দর্শকদের মধ্যে কেউ হতাহত হলেন না। ইতিমধ্যে চার দিক থেকে পুলিশ ও মিলিটারির আক্রমণ সুরু হলো বিপ্লবীদের ওপর।

হিমাংশু চক্রবর্তী ও কৃষ্ণ চৌধুরী ঘটনাস্থলে বন্দী হন। বিচারে তাঁদের দু'জনেরই ফাঁসির আদেশ হয়।

চট্টগ্রামে সরকারী দমন নীতি চলতে লাগলো সমানে। সাধারণ মানুষও রেহাই পেল না ইংরেজ পুলিশের অত্যাচার হতে। বিপ্লবীদের

অভিভাবকদের বাড়ী ধ্বংস, তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও দৈহিক নির্য্যাতন চলতে লাগলো পুরোমাত্রায়।

এর কিছু দিন আগে অর্থাৎ মাষ্টারদা ইংরেজ পুলিশের হাতে বন্দী হবার কিছুদিন আগে বিপ্লবী পয়োজকান্তি পুলিশের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল মাত্র ষোল বছর। তিনি ছিলেন 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ' অভিযানের অন্যতম সক্রিয় বিপ্লবী এবং মাষ্টারদার একান্ত অনুগত। সহরে গোপন সংগঠনের যোগসূত্র রক্ষা করা ও মাষ্টারদার সঙ্গে সংযোগ রাখা এইসব দায়িত্বপূর্ণ কাজ ছিল তাঁর ওপর। এই কারণে পুলিশ তাঁর ওপর অকথ্য নির্য্যাতন চালায় যাতে করে তাঁর কাছ থেকে মাষ্টারদার খবরাখবর পাওয়া যায়। কিন্তু পয়োজকান্তি মুখ বুজে পুলিশের অত্যাচার সহ্য করে শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছেন তবু তিনি মাষ্টারদার খবর ফাঁস করে দেননি।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ।

দ্বিতীয় 'অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ' মামলা সুরু হয় অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, সরোজ গুহ ও হেমেন্দু দস্তিদারকে নিয়ে।

বিচারে অম্বিকা চক্রবর্ত্তীর ফাঁসির হুকুম হয় এবং ১৬ বছর বয়স্ক সরোজ গুহের যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হয়।

পরে অম্বিকা চক্রবর্ত্তী হাইকোর্টে আপীল করলেন। হাইকোর্টের বিচারে তাঁর ফাঁসির দণ্ড রদ হয়ে যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হয়।

এরপর তৃতীয় 'অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' মামলা সুরু হয় মাষ্টারদা, তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্তকে নিয়ে।

বিচারে মাষ্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারেব ফাঁসির হুকুম হয় এবং কল্পনা দত্তের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ। ১২ই জানুয়ারী।

এই স্মরণীয় তারিখে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বীর নায়ক মাষ্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসি হয়।

মাষ্টারদার ফাঁসি হয় যেরূপ শোচনীয় এবং দুঃসহ পরিবেশে সেই প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করছি :

'১২ই জানুয়ারী, ১৯৩৪ সাল—রাত বারোটার ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই চট্টগ্রামের ইংরেজ বড় কর্ত্তারা দল বেঁধে মাষ্টারদার শেলের কপাট খুলে ভিতরে ঢুকে হিংস্র পশুর মত তাঁর ঘুমন্ত দেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্ম্মম প্রহার সুরু করে। তাঁর পাশের শেলে তারকেশ্বর দস্তিদার এতে জেগে যায় এবং এই অত্যাচারের প্রতিবাদে চীৎকার করে ওঠে।

'তারকেশ্বরের চীৎকার শুনে জেলের ডেটিনিউ ইয়ার্ডের বন্দীদের ভিতর সোরগোল পড়ে যায়—তাদের সমবেত প্রতিবাদ ধ্বনিতে সারা জেল প্রকম্পিত হয়ে উঠল। তারকেশ্বর দস্তিদারকেও সেই বর্ব্বর পশুরা বাদ দেয় নি। তাঁর মুখ বন্ধ করার জন্য তাঁকেও নিষ্ঠুর প্রহারে অচৈতন্য করে ফেলা হয়। প্রহারের ফলে মাষ্টারদার সমস্ত দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল। অচৈতন্য অবস্থায় দু'জনকেই ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। কেউ বলে যে বয়লারে নিক্ষেপ করা হয়েছে—সঠিক খবর এখনও অজানা রয়ে গেছে।'

মাষ্টারদার ফাঁসির সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর্ব শেষ হয়ে গেল বটে কিন্তু তাই বলে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিপ্লবীদের কার্য্যকলাপ আদৌ বন্ধ রইলো না। বিশেষ করে কলকাতায় এর প্রকাশ ব্যাপকভাবে ঘটলো।

তখন টেগার্ট সাহেব ছিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার। তিনি অত্যন্ত কড়া অফিসার ছিলেন এবং কঠোর হস্তে অনেক বিপ্লবীদের দমন করেন।

তাঁর এই প্রকার কার্য্যকলাপের পরিচয় পেয়ে বিপ্লবীরা তাঁর ওপর

চটে যান এবং তাঁকে পৃথিবী থেকে চিরকালের মত সরিয়ে দেবার ফন্দী আঁটলেন।

একদিন ডালহৌসি স্কোয়ারে মিঃ টেগার্টকে লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়লেন বিপ্লবীরা।

বোমা টেগার্টের গায়ে না লেগে পড়লো অন্যত্র।

এরপর লাহোরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে যখন লাটসাহেব বক্তৃতা দেন তখন বিপ্লবীরা তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করেন।

কিন্তু সেবারও বিপ্লবীদের চেষ্টা নিষ্ফল হলো। দৈবক্রমে বেঁচে যান লাটসাহেব।

এবার বিপ্লবীরা আক্রমণ করলেন বোম্বাইয়ের লাটসাহেব স্যার আর্ণেষ্ট হটসনের ওপর। তিনি তখন ফার্গুসন কলেজ পরিদর্শন করছিলেন।

এই গুলি তাঁর কোটের বোতামে লেগে ফিরে যায়। বেঁচে যান হটসন সেবারের মত।

গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হলে গান্ধীজী ফিরে এলেন স্বদেশে। এসে দেখলেন গান্ধী-আরুইন চুক্তি ভঙ্গ হয়েছে। এই চুক্তির ফলে দেশে স্বদেশী আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেছিল এবং জনসাধারণ শান্তিতে বসবাস করছিল।

কিন্তু চুক্তি ভঙ্গ হতে গান্ধীজীর মন চঞ্চল হয়ে উঠল। তিনি ইংরেজ সরকারের এইপ্রকার মনোভাব লক্ষ্য করে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তখনকার বড়লাটের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন।

বড়লাট দেখা করলেন না। গান্ধীজীও হতাশ হলেন না। ধৈর্য ধরে রইলেন।

ইতিমধ্যে শাসক ইংরেজের অত্যাচারে সারা দেশের মানুষ অস্থির হয়ে উঠেছে। তাঁরা অর্ডিন্যান্সের পর অর্ডিন্যান্স জারি করে দেশের চারদিকে অশান্তি ও অকথ্য অত্যাচারের বন্যা বইয়ে চলেছেন।

গান্ধীজী দেশের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করে দেশবাসীদের দুর্দশা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার সঙ্কল্প করলেন। দেখলেন, দিনের পর দিন শাসক ইংরেজের অত্যাচার বৃদ্ধির মুখে।

তিনি তিনবার চেষ্টা করলেন বড়লাট বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

কিন্তু তিনবারই তাঁর আশা পূর্ণ হলো না। গান্ধীজী তখন একদিকে দেশবাসীদের দুর্দশার কথা অন্য দিকে শাসকদের অত্যাচারের কথা চিন্তা করে দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দ। ৪ঠা জানুয়ারী।

সরকার এ দেশে স্বদেশী আন্দোলন বন্ধ করার জন্যে সবরকম ব্যবস্থা গোপনে নিয়েছেন।

গান্ধীজী সরকারের দমননীতিতে উত্তক্ত হয়ে দেশবাসীদের গণ-আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে আহ্বান জানালেন।

জনগণও এগিয়ে এলো গান্ধীজীর আহ্বানে। ওদিকে ইংরেজ সরকারও তলে তলে তৈরী ছিলেন এই আন্দোলনের উৎস রোধ করবার জন্য।

অর্ডিন্যান্সের পর অর্ডিন্যান্স জারি করে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান এবং তার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ক্লাব, পাঠাগার এবং সমিতিগুলিকে বেআইনী বলে ঘোষিত করা হলো। কংগ্রেসের তহবিল বাজেয়াপ্ত করা হলো।

সৈন্য রাখার জন্যে প্রজাদের কাছ থেকে খরচ আদায় করা হলো। সেই সঙ্গে বিপ্লবীদের আন্দোলন দমন করার জন্যে নিষ্ঠুরতম আইন পাশ করা হলো।

মহাত্মা গান্ধী, সর্দার প্যাটেল, সুভাষচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রমোহন প্রমুখ নেতারা একে একে গ্রেপ্তার হলেন। পাইকারী জরিমানা, পিটুনি পুলিশ চারদিকে বসলো।

সরকার সমস্ত আন্দোলনকে দমন করবার জন্যে যা করা দরকার তাই করতে লাগলেন।

আর সেই দমননীতির চাপে জনগণ আরও বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। তারা দলে দলে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামকে জোরদার করে তুললো। প্রায় আড়াই বছর ধরে এই আন্দোলন চলতে লাগলো এবং দু'লক্ষের বেশী লোক গ্রেপ্তার হলো।

ওদিকে দেশের বিপ্লব সমিতির সদস্যরা স্থির হয়ে বসে ছিলেন না। তাঁদের কর্মতৎপরতা সমানে চলছিল। যে বিচারক একদিন রাইটার্স বিল্ডিং-এর বারান্দায় সংগ্রামরত বীর বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের বিচার করেছিলেন তাঁকে বিপ্লবীরা ক্ষমা করলেন না। তিনি অর্থাৎ বিচারক মিঃ গার্লিক যখন দায়রা কোর্টে বিচারকের আসনে উপবিষ্ট ছিলেন ঠিক সেই সময় বিপ্লবীদের রিভলবার গর্জে উঠলো তাঁকে লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ গার্লিকের প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

তখন আদালতে দেখা গেল মহা হৈ-হট্টগোল। চারদিকে ধড়-পাকড় শুরু হয়ে গেল। মিঃ গার্লিকের এই সর্বনাশের কারণ কে সে বিষয়ে পুলিশ ব্যাপকভাবে তল্লাসী চালাতে লাগলো। শেষকালে পুলিশ কানাই ভট্টাচার্য্যের কাছে এসে তাকে মিঃ গার্লিকের হত্যাকারী বলে সনাক্ত করলো।

কিন্তু সনাক্ত করলে কি হবে তার আগেই তিনি পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হবার আশঙ্কায় বিষপান করে নিজের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটান।

মিঃ ভিলিয়ার্স ছিলেন তখনকার দিনে বেসরকারী ইংরেজদের সমিতি ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি। তিনি সর্বদা চিন্তা করতেন, কিভাবে বিপ্লবীদের দমন করা যায়। এই ব্যাপারে তিনি তাঁর চিন্তাধারা এবং কূটকৌশল জানাতেন ইংরেজ সরকারকে।

বিপ্লবীরা কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করলেন মিঃ ভিলিয়ার্সের কার্যকলাপ।

তারপর একদিন তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু ভাগ্যবান ভিলিয়ার্স মরলেন না বিপ্লবীদের গুলির আঘাতে। অল্পের জন্যে তাঁর প্রাণ রক্ষা হলো।

এরপর বিপ্লবীরা কুমিল্লার অত্যাচারী পুলিশ সাহেব এডিসনকে হত্যা করেন।

ঢাকার পুলিশের বড় কর্তা গ্রাসবির ওপরও বিপ্লবীরা আক্রমণ করেন।

তারপর কলকাতায় স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক মিঃ ওয়াটসনের ওপর দু' দুবার আক্রমণ চালান বিপ্লবীরা। ঐ সময় মিঃ ওয়াটসন তাঁর কাগজে বিপ্লবীদের কার্যকলাপ নিয়ে সমালোচনা করতেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবার জন্যে সরকারের প্রতি ইঙ্গিত করতেন।

মিঃ ওয়াটসনকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে যিনি লিপ্ত ছিলেন তাঁর নাম অতুল সেন। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আশঙ্কায় পটাসিয়াম সাইনাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে।

কুমিল্লার জেলা শাসক মিঃ ষ্টিভেনস বিপ্লবীদের ওপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি নানা কৌশলে বিপ্লবীদের দমন করতে চেষ্টা করতেন।

বিপ্লবীরাও তাঁকে রেহাই দিলেন না। তাঁকে হত্যা করলেন দুই বিপ্লবী বীরাঙ্গনা—শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী।

হিজলী বন্দীশালায় নিরস্ত্র রাজবন্দীদের ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। ফলে তারকেশ্বর সেন ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে পরলোকগমন করেন।

এই প্রসঙ্গে বিপ্লবী সন্তোষকুমার মিত্রের নাম স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে জেলে প্রহরীদের গুলির আঘাতে মৃত্যুবরণ করেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সূত্রে তিনি পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন।

বিপ্লবী অনিলকুমার দাস পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার বরণ করে ঢাকা জেলে অবস্থান করতেন। সেই সময় পুলিশ তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচার চালায় বিপ্লবীদের সম্বন্ধে কিছু গোপন তথ্য জেনে নেবার জন্যে। কিন্তু পুলিশের সে চেষ্টা বিফল হয়। বিপ্লবী অনিল দাস শেষ পর্যন্ত আপনার ব্রতে অনমনীয় থেকে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন পুলিশের অত্যারের মুখে মৃত্যুবরণ করেন।

এই প্রসঙ্গে শহীদ আবদুল্ল করিম গোলাম জিলানীর নাম করা যেতে পারে। ১৯৩২-এ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। জেলে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সর্ত্তাধীনে মুক্তি দেবার জন্য তাঁর কাছে পুলিশের প্রস্তাব আসে। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। পরে অসুস্থ অবস্থায় ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মৃত্যুবরণ করেন।

শহীদ অনাথবন্ধু পাঁজার নাম শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে স্মরণ করা যায়। তিনিও কম বিপ্লবী ছিলেন না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মেদিনীপুরের জেলাশাসকের প্রাণ নাশ করা। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি একদিন মেদিনীপুরে খেলার মাঠে ম্যাজিষ্ট্রেট বার্জকে গুলি করে হত্যা করেন। পরে মৃত্যুদণ্ড দেবার সময় সশস্ত্র রক্ষী ও পুলিশ বাহিনী কর্তৃক তিনি ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে নিহত হন।

সেদিন অনাথবন্ধুর সঙ্গী ছিলেন বিপ্লবী মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনিও পুলিশের গুলিতে নিহত হন ঐ একই দিনে।

এবার স্মরণ করা যাক শহীদ প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যকে, তিনিও কম বিপ্লবী ছিলেন না। ইংরেজ সরকারের অত্যাচার হতে স্বদেশ ও স্বজাতিকে রক্ষা করার সঙ্কল্প নিয়ে তিনি বিপ্লব সমিতিতে যোগদান করেন। তখন মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন ডগলাস। প্রদ্যোৎ গুলি করে ম্যাজিষ্ট্রেটকে হত্যা করেন। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর বিচার হলো। বিচারে তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী তারিখে তাঁর ফাঁসি হলো।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের আর একজন বিপ্লবী ইংরেজ সরকারের কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর নাম শৈলেশ চ্যাটার্জী।

আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তিনি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর পুরোভাগে ছিলেন। জেলা শাসকের অফিসের সামনে যখন তিনি সত্যাগ্রহ করেন সেই সময় পুলিশের গুলিতে আহত হন। সেই অবস্থায় কিছুদিন তিনি হাসপাতালে থাকেন। তারপর তাঁকে বিভিন্ন বন্দী শিবিরে রাখা হয়।

শেষকালে তাঁকে আজমীঢ়ের দেউলী বন্দীনিবাসে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

এমনি ভাবে বাংলার বিপ্লবীরা চারদিকে সন্ত্রাসমূলক কাজ করতে লাগলেন।

বাংলার লাট সাহেব স্ট্যানলি জ্যাকসন একবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দেন। তিনি আবার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারও।

সিনেট হলে সভা বসলো।

চারদিকে সশস্ত্র পুলিশের ব্যবস্থা করা হলো।

অকস্মাৎ পুলিশের ব্যূহ ভেদ করে এক বিপ্লবী প্রবেশ করলেন সিনেট হলে।

তাঁর হাতে ছিল পিস্তল।

তিনি বড়লাটকে লক্ষ্য করে তাঁর দিকে পিস্তল তুলে ধরে গুলি ছুঁড়লেন।

গুলি বড়লাটের গায়ে লাগলো না।

তিনি সে যাত্রা রক্ষা পেলেন।

এই বিপ্লবী মহিলার নাম বীণা দাস।

ইনি পুরুষের বেশে এসে লাটসাহেবকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়েন।

পরে ইনি পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন। বিচারে তাঁর ন'বছর জেল হলো।

এই সময় বিপ্লবীরা দু'খানা পত্রিকা প্রকাশ করেন। একখানির নাম হচ্ছে 'বেণু' অন্যটির নাম 'স্বাধীনতা'। 'বেণু' হচ্ছে মাসিক। আর 'স্বাধীনতা' সাপ্তাহিক।

এই পত্রিকা দু'খানি সেদিনকার বাংলায় অভূতপূর্ব আলোড়ন তুলেছিল।

ফলে সরকার থেকে এই কাগজ দু'খানির প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হলো।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দ।

দিল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশন বসার কথা। সভাপতি হবেন মদনমোহন মালব্য।

কিন্তু ইংরেজরা কিছুতেই দিল্লাতে অধিবেশন হতে দেবে না। মদনমোহন মালব্যকে গ্রেপ্তারও করলো।

কংগ্রেসী অন্যান্য নেতারা ছিলেন অনমনীয়। তাঁরা ইংরেজের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে দিল্লীতে অধিবেশন আহ্বান করলেন। পাঁচশো প্রতিনিধি এই সভায় যোগ দেন। চারটি প্রস্তাব পাশ করা হলো এই অধিবেশনে। তার মধ্যে ছিল আইন অমান্য আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন। গান্ধীজীকে এই আন্দোলনে নেতৃত্বের ভার দেওয়া হলো।

এবার কিন্তু এই আন্দোলন আগের মত হলো না। এই বছর আগস্ট মাসে বিলাতের প্রধানমন্ত্রী মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড একটা শ্বেতপত্র বের করলেন। তাতে পরিষদের নির্বাচনে হিন্দুদের মধ্যে দুটি শ্রেণীর সৃষ্টি করা হলো—বর্ণ হিন্দু ও তপশীলভুক্ত। কেবল ভাগই করলেন না। তাদের আলাদা নির্বাচনের জন্যেও ফতোয়া জারি করলেন।

এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে মহাত্মাজী জেলের মধ্যেই অনশন আরম্ভ করলেন।

২০শে সেপ্টেম্বর যারবেদা জেলে এই অনশন আরম্ভ হয়।

পুনায় বসলো ভারতের সকল শ্রেণীর নেতাদের বৈঠক। এই বৈঠকে স্থির হলো, পৃথক নির্বাচনের দরকার নেই, তবে তপশীলদের জন্যে কয়েকটা আসন আলাদাভাবে সংরক্ষিত হবে।

গান্ধীজী এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে অনশন ভঙ্গ করলেন। ইতিহাসে এই চুক্তি বিখ্যাত 'পুনাচুক্তি' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে।

এর পরেও চললো ইংরেজ সরকারের নানারকম কায়দা-কৌশল এবং জুলুমবাজী।

ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, ডাঃ আন্সারী, সর্দার শার্দুল সিং প্রমুখ গ্রেপ্তার হন।

এই গ্রেপ্তারেও কংগ্রেসের আন্দোলন থামলো না।

এই সময়ে ভারতবাসীকে ভিন্ন পথে চালাবার জন্যে ইংরেজ সরকার বিলেতে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেন।

তখন অনেক নেতা ছিলেন জেলে। বাইরে যাঁরা ছিলেন তাঁরা যোগ দেন।

এই বৈঠকে ভারতের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে একটা খসড়া রচিত হয়। এই খসড়ার ওপর ভিত্তি করেই ইংরেজ ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী এক আদেশ জারি করেন।

এই সময় গান্ধীজী নিম্নবর্ণের হিন্দুদের উন্নতির জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। তাদের নাম দিলেন হরিজন।

উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এই হরিজনদের ওপর এতকাল অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে এসেছে।

গান্ধীজী এর প্রতিকারের জন্যে ২১ দিন অনশন করলেন।

তাই দেখে ইংরেজ সরকার মুক্তি দেন এই মহান নেতাকে।

জেল থেকে বেরুবার পর গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন ছ'সপ্তাহের জন্যে বন্ধ করে দেন। এই শুনে অনেক কংগ্রেস নেতা প্রতিবাদ জানালেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সুভাষচন্দ্র বসু।

পুনার তিলক-মন্দির। এখানে কংগ্রেস কর্মীদের এক বৈঠক বসে।

বৈঠকে স্থির হয় যে গণআন্দোলন বন্ধ করে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করলে দেশের মঙ্গল হবে।

গান্ধীজী এর জন্যে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত ছিলেন। তার আগে তিনি ইংরেজ কর্তাদের সঙ্গে বসে ব্যাপারটির আশু সমাধান চাইলেন। এর জন্যে তিনি বড়লাটের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। কিন্তু বড়লাট তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন না। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, আইন অমান্য পুরোপুরি বন্ধ না করলে কোন আলোচনা করে লাভ নেই।

এরপর গান্ধীজী নর্মদাতীরে তাঁর সবরমতী আশ্রম দান করলেন হরিজনদের উদ্দেশ্যে। তারপর তিনি ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে বেরুলেন। তার সঙ্গে যোগ দিলেন তাঁর স্ত্রী কস্তুরবা গান্ধী এবং আশ্রমের কয়েকজন সহকর্মী।

১লা আগষ্ট তিনি ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন।

পরে তিনি পুলিশের হাতে ধৃত হয়ে এক বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন।

এভাবে সারা ভারতে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ শুরু হলো এবং অনেকে ধৃত ও কারাগারে দণ্ড ভোগ করেন।

এই বছর স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনজন বিখ্যাত নেতা মারা যান। এই তিনজন নেতা হলেন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, অ্যানি বেসান্ত এবং বিটলভাই প্যাটেল।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ।

গান্ধীজী কংগ্রেস থেকে দূরে রইলেন। সাধারণ নির্বাচন ঘরের দুয়ারে এসে হাজির হলো।

কংগ্রেস কর্মীরা প্রায় সকল প্রদেশে জয়লাভ করলেন।

বাংলাদেশের উপর ইংরেজদের অত্যাচার বেড়েই চললো। বাংলার তরুণ বিপ্লবীদের শায়েস্তা করার জন্যে বাংলায় একজন কড়া লাটসাহেব এলেন। তাঁর নাম এ্যাণ্ডার্সন।

তিনি বাংলাদেশে এসে যুব সম্প্রদায়ের ওপর এমন দমন নীতি চালালেন যে তাঁরা স্থির হয়ে থাকতে পারলেন না।

মে মাসে এ্যাণ্ডার্সন এসেছেন দার্জিলিং-এ। সেখানকার ঘোড়-দৌড় মাঠে রেসখেলা দেখছিলেন, এমন সময় বিপ্লবীরা তাঁকে লক্ষ্য করে রিভলবার ছুঁড়লেন।

কিন্তু গুলি লাগলো না দুর্ধর্ষ এ্যাণ্ডার্সনের শরীরে। সে যাত্রায় সাহেবের প্রাণ রক্ষা পেল। তবু এ্যাণ্ডার্সনী রাজত্বের পরাজয় ঘটলো এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে।

এই সময় ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করার অপরাধে আবদুল গফুর খাঁ, জওহরলাল নেহেরু ও ডাঃ সত্যপালের এক বছর করে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়।

এই বছর শহীদ নির্মলজীবন ঘোষের ফাঁসি হয় মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্জকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার জন্যে।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর শহীদ ব্রজকিশোর চক্রবর্তীরও ফাঁসি হয়। তিনিও যুক্ত ছিলেন মেদিনীপুরের জেলাশাসক মিঃ বার্জকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে। ঐ একই দিনে এবং একই ব্যাপারে লিপ্ত থাকার দরুণ রামকৃষ্ণ রায়েরও ফাঁসি হয়।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে আর একজন শহীদের ফাঁসি হয়। তাঁর নাম বিপ্লবী মতিলাল মল্লিক।

ইংরেজ সরকার যখন প্রচণ্ডভাবে বাংলার তরুণদের ওপর দমননীতি চালাতে থাকেন তখন মতিলাল ও দুজন বিপ্লবী সরকারী সৈন্য ও ভিলেজ গার্ডদের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হন। মতিলালের গুলিতে সরকারী বাহিনীর নেতা নিহত হন। এই কারণে মতিলালকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বিচারে মতিলালের ফাঁসির আদেশ হয়।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ।

বৃটিশ পার্লামেণ্ট ভারতবর্ষের জন্যে এক নতুন শাসনতন্ত্র রচনা করলেন।

কংগ্রেস এই শাসনতন্ত্র মেনে নিলেন এবং সেই সঙ্গে দেখা গেল তার জীবনে এক গৌরবময় ইতিহাস।

এই শাসনতন্ত্রের দুটি ভাগ ছিল—প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয়।

সমস্ত ভারতবর্ষকে এগারোটি প্রদেশে ভাগ করা হলো—বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশ, মধ্য প্রদেশ ও বেরার, বোম্বাই, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব।

এই সময় এডেন ও ব্রহ্মদেশ ভারত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

এই ১১টি প্রদেশের মধ্যে বাংলা, আসাম, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই ও মাদ্রাজে দুটি করে ব্যবস্থাপক সভা ও অন্য পাঁচটিতে একটি করে সভা রাখা হয়।

এই সভায় যে দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠ হবেন তাঁরাই মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করবেন। মন্ত্রীরা আয়-ব্যয়, কর-বসানো, শাসন ও শিক্ষার ব্যবস্থায় সবকিছু অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে।

সকলের ওপরে থাকবেন লাটসাহেব। তাঁর থাকবে আলাদা ক্ষমতা।

কংগ্রেস এই শাসনতন্ত্র প্রদেশে চালু করতে রাজি হলো।

বাংলা, পাঞ্জাব ও সিন্ধু দেশ ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী শহীদ ভবানী প্রসাদ ভট্টাচার্য্যের ফাঁসি হলো। তিনি দার্জিলিং-এ দুর্ধর্ষ লাট এ্যাণ্ডার্সনকে গুলি করে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এই সন্দেহে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং রাজসাহী জেলে রাখা হয়।

পরে বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়।

তাঁর এই অকাল মৃত্যু সংবাদ যখন কংগ্রেসী নেতাদের কানে পৌঁছুলো তখন তাঁরা হরিষে বিষাদ প্রাপ্ত হ'লেন। কারণ সেই সময় কংগ্রেস বৃটিশ পার্লামেন্টের নতুন শাসনতন্ত্র গ্রহণ করে কিছু সুখের মুখ দেখছিল। তার ওপর জনৈক স্বাধীনতা প্রেমিক এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সহকর্মীর অকাল মৃত্যু কিছুটা দুঃখের অশ্রুপাত ঘটাতে সক্ষম হলো।

এরপর এলো ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ। এই বছরে আর একজন শহীদ কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর নাম নবজীবন ঘোষ। তাঁর বাড়ী মেদিনীপুরে অথচ মারা যান পূর্ব বাংলার ফরিদপুর জেলে পুলিশের অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ।

এই বছর ভারতের মুক্তি আন্দোলনের এক শুভকাল। এই বছরে আমাদের প্রিয় নেতা সুভাষচন্দ্র বসু হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। এতকাল তিনি বিদেশে কাটিয়েছেন। ইংরেজ সরকার তাকে ভারতে আসতে দেননি। চিকিৎসার নামে সরকার সুভাষ চন্দ্রকে বিদেশের ভূমিতে এক প্রকার নির্বাসিত করেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর সুভাষচন্দ্র কেবলমাত্র দেশে ফিরেছিলেন। তাও বাইরে কোথাও বেরোননি। গৃহে অন্তরীণ অবস্থায় ছিলেন। শ্রাদ্ধের পর আবার চলে যান ইউরোপে।

কিন্তু স্বাধীনতার একনিষ্ঠ পূজারী আর কতকাল ইউরোপে কাটাবেন। তাই তিনি ভারতে ফিরে এলেন। আসার সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। তা সত্বেও দেশের মানুষ যখন সুভাষচন্দ্রকে চাইলো তখন তিনি বৃটিশ শক্তিকে ভ্রূকুটি দেখিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন।

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন তখন কিছুটা কমে এসেছে। কারণ কংগ্রেস তখন কিছুটা শাসনক্ষমতা অধিকার করতে পেরেছেন।

অনেক কংগ্রেসী নেতা মন্ত্রীত্ব পেয়েছে। সুভাষচন্দ্রের কিন্তু এমনভাবে আংশিক স্বাধীনতা অর্থাৎ স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা মনঃপূত হলো না। তিনি চাইলেন পূর্ণ স্বাধীনতা। তাঁর সঙ্গে কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের মতের গরমিল হলো। তাই কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্য চাইলেন যাতে আগামী বছর সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি হতে না পারেন।

কিন্তু তাঁদের সে আশা ব্যর্থ হলো। সুভাষচন্দ্র হলেন কংগ্রেসের সভাপতি। তাই দেখে গান্ধীজী মনে মনে ক্ষুব্ধ হন, কিন্তু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাদ জানালেন এই প্রিয় নেতাকে। তরুণ সুভাষচন্দ্রের ভেতর তিনি প্রত্যক্ষ করলেন আগামী দিনের শুভ এবং সুমহান নেতৃত্বের কল্যাণময় ভাবমূর্তি।

সুভাষচন্দ্র দেখলেন যে কংগ্রেসের নরমপন্থীরা আপোষের পথে স্বাধীনতা লাভ করতে চাইছেন। তিনি কংগ্রেসের এই ধরণের দুর্বল মনোভাব পছন্দ করলেন না। তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করে একটি নতুন দল গঠন করলেন। তার নাম দিলেন 'ফরোয়ার্ড ব্লক'। এই দলের আদর্শ হলো সংগ্রাম। সুভাষচন্দ্র দেখলেন, স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে সংগ্রাম প্রয়োজন। সংগ্রাম ব্যতীত স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব। ইংরেজ কখনো আপোষ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবে না।

তাই সুভাষচন্দ্র ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করবার আগে দেশের বামপন্থী দলগুলিকে একত্র করার চিন্তা করলেন।

তাঁর বৈপ্লবিক কর্মের আদর্শ প্রচার করবার জন্যে তিনি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেন। তার নাম দেন 'ফরোয়ার্ড ব্লক'। এই কাগজটি ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়।

ঠিক এই সময়ে সুভাষচন্দ্র জাতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার স্তম্ভ স্বরূপ কলকাতায় 'মহাজাতি সদন' নামে এক বৃহৎ কৃষ্টিগৃহের ভিত্তি স্থাপনের জন্যে উদ্যোগী হলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঐ সদনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

বাংলার কংগ্রেসীরা মন্ত্রীত্ব লাভ করে মনে করেছিলেন যে আর কি, এবার স্বরাজ তো আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে।

কিন্তু বেশীদিন আর গেল না তাদের ঐ মোহ ভঙ্গ হতে। তাঁরা দেখলেন, তাঁরা যা চেয়েছিলেন তা পাচ্ছেন না। আসল ক্ষমতা রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারকে কোনরকম সুযোগ-সুবিধা দিতে রাজী হচ্ছেন না।

ঠিক এইসময় দেশের মধ্যে আর একটি রাজনৈতিক দলের প্রকাশ ঘটলো। তার নাম মুসলিম লীগ। এতকাল ভারতবর্ষের মুসলমানগণ কংগ্রেসের একচ্ছত্র পতাকার তলে সমেবেত হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিল। এবার তাদের মনে বিরূপ ভাব দেখা গেল। মুসলমানদের মধ্যে স্বনামধন্য নেতা মিঃ জিন্না ঘোষণা করলেন, আমরা মুসলমান—আমরা ভিন্ন জাতি আমাদের কৃষ্টিও ভিন্ন। আমাদের সঙ্গে হিন্দুদের কোন মিল নেই। মিলন সম্ভবও নয়। সুতরাং আমরা আলাদাভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাব।

অনেক মুসলমান নেতা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে এসে মুসলীম লীগে যোগদান করলেন। এভাবে কংগ্রেসের সামনে এক বিরাট দলের সৃষ্টি হলো।

গান্ধীজী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলনের কত চেষ্টা করলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হন।

ইংরেজ সরকার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই বিভেদ—এই দ্বন্দ্বের সুযোগ নিলো।

ত্রিপুরি কংগ্রেসের আগে থেকেই কংগ্রেসের মধ্যে দুই দলের সংঘর্ষ আবার প্রবল আকারে দেখা দিল। দক্ষিণ পন্থীরা চাইলেন আপোষ-আলোচনার মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করতে আর বামপন্থীরা চাইলেন সংগ্রামের দ্বারা স্বাধীনতা অর্জন করতে।

এর ফলে কংগ্রেসের মধ্যে সৃষ্টি হলো সমাজতন্ত্রী দল। আর ঠিক এইসময় বাঁধলো ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

ঠিক এই বছরে অর্থাৎ ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রখ্যাত বিপ্লবী হিমাংশু বসু স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডি, সি, মিঃ হ্যানসনের বুটের আঘাতে গুরুতররূপে অসুস্থ হয়ে প্রেসিডেন্সী জেলে মৃত্যুবরণ করেন।

হিমাংশু বসু ছিলেন আশৈশব বিপ্লবী। স্কুলে বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তদানীন্তন কালের বিখ্যাত বিপ্লবী সংস্থা 'যুগান্তর'-এর ঘনিষ্ট সংস্পর্শে আসেন।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময় বিপ্লবীরা আত্মগোপন করার সময় কলকাতায় তাঁর বাড়ীতে এসে আস্তানা নিতেন।

পরে ডালহৌসী স্কোয়ারে বিপ্লবী তরুণরা যখন তৎকালীন অত্যাচারী পুলিশ কমিশনার টেগার্ট-কে হত্যার জন্যে সক্রিয় হয়ে ওঠেন তখন হিমাংশু বসু ঐ কাজে বিশেষ ভূমিকা নেন। তিনি পরে পুলিশের হাতে বন্দী হন। পুলিশ তাঁর কাছ থেকে বিপ্লবীদের সম্বন্ধে গোপন তত্ত্ব ও তথ্য জানবার জন্যে তাঁর ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালায়। স্বয়ং ডেপুটি পুলিশ কমিশনার হিমাংশুর বুকে বুটের লাথি মারেন। ফলে হিমাংশুর বাঁচার আশা শূন্যে বিলীন হয়ে গেল। কারাগারে পুলিশের অকথ্য নির্য্যাতনের মধ্যে দিয়ে তাঁর জীবনের শেষ পরিণতি প্রকাশ পায়।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ।

কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো রামগড়ে। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করলেন স্বনামধন্য জাতীয়তাবাদী নেতা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।

কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় রামগড়ে বামপন্থী শক্তিরা মিলিত হয়ে আর একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। তার নাম 'আপোষ-বিরোধী সম্মেলন'। সুভাষচন্দ্র হলেন এই সম্মেলনের নেতা। তিনি সভাপতিরূপে যে ভাষণ দেন তাতে তিনি বলেন, কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে আপোষ করতে চাইছেন বলেই এই সম্মেলন। দেশকে

স্বাধীন করবার মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। দেশ প্রস্তুত। এবার আঘাত হানতে হবে। ইংরেজ বিপদে পড়েছে। এই সুযোগে আমরা যদি স্বাধান হতে না পারি, তবে অনেকদিন পর্যন্ত পিছিয়ে যাবে আমাদের স্বাধীনতা।'

সুভাষচন্দ্র ইংরেজকে চরমপত্র দিতে চাইলেন।

গান্ধীজী হলেন গররাজী। তিনি বললেন, দেশ এখনো প্রস্তুত নয়। সংগ্রাম আরম্ভ হলেই হিংসা দেখা দেবে।

সুভাষচন্দ্র তার উত্তরে বললেন, বিনা রক্তপাতে দেশ স্বাধীন হয়েছে এর নজির কোন ইতিহাসে নেই।

এই সময় সুভাষচন্দ্র আর একটি আন্দোলন গড়ে গেলেন কলকাতা শহরের বুকে। এর নাম 'হলওয়েল মনুমেন্ট আন্দোলন'। ডালহৌসি স্কোয়ারে অন্ধকূপ হত্যার স্মরণচিহ্ন হিসাবে একটি স্তম্ভ ছিল। সুভাষচন্দ্র ঐ স্তম্ভটিকে জাতির কলঙ্কস্বরূপ মনে করে তাকে অপসারণ করতে চাইলেন।

আরম্ভ হলো ব্যাপক সত্যাগ্রহ। বহু নেতা ও কর্মী এই সত্যাগ্রহে অংশ নিলেন। সুভাষচন্দ্রও প্রধান ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে এলেন সত্যাগ্রহীদের সামনে।

এই আন্দোলনের ফলে ইংরেজ সরকার প্রমাদ গুণলেন। অবশেষে তাঁরা বাধ্য হলেন ঐ স্তম্ভ অপসারণ করতে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ঘোষণার পর বড়লাট লর্ড লিনলিথগো ডেকে পাঠালেন কংগ্রেসী নেতাদের। তাঁদের নিয়ে এক বৈঠকে বসলেন বড়লাট। তিনি বললেন, জার্মানীর সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। এই যুদ্ধে আপনাদের উচিত হচ্ছে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ানো।

বড়লাটের কথা শুনে মুস্কিলে পড়লেন কংগ্রেসী নেতারা। কারণ এর আগে হরিপুরা কংগ্রেসের অধিবেশনে একটা প্রস্তাব পাশ করিয়ে

নেওয়া হয়। তাতে বলা হয় যে যুদ্ধ হলে ভারতবর্ষ সে-যুদ্ধে যোগ দেবে না।

তাই কংগ্রেসীদের পক্ষে মিত্রশক্তির প্রস্তাব মেনে নেওয়া অসম্ভব হলো। তখন তাঁরা মন্ত্রীর পদ হতে সরে দাঁড়ালেন।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দ।

এই বছরে দু'টি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। একটি হচ্ছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিরোভাব আর একটি দেশনায়ক সুভাষচন্দ্রের অন্তর্দ্ধান।

কবিগুরুর গান, কবিতা ও বক্তৃতাবলী দেশের তরুণদের মনে-প্রাণে আশা ও উৎসাহ জাগিয়েছিল। স্বদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁরা দলে দলে যোগ দিয়ে মাতৃভূমির হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে যত্নবান হলেন। তাই কবিগুরুর তিরোভাবে তাঁরা খানিকটা হতোদ্যম হয়ে গেলেন।

ওদিকে ইংরেজ সরকার ভারতরক্ষা আইনে অনেক কংগ্রেসী নেতা ও স্বেচ্ছাসেবকদের গ্রেপ্তার করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু।

কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়লে ইংরেজ সরকার সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি দেন কিন্তু তাঁকে তাঁর গৃহে অন্তরীণ করে রাখা হয়। ঐ অবস্থায় একদিন তিনি অন্তর্ধান করেন। পরে শোনা গেল, তিনি বার্লিনে গিয়ে ইংরেজদের চিরশত্রু হিটলারের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে হিটলারের কাছে তিনি সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন।

সুভাষচন্দ্র এই রকমটি চেয়েছিলেন অনেকদিন আগে থাকতে। তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের মাটির ওপরে দাঁড়িয়ে ইংরেজদের সঙ্গে সংগ্রাম করা অসুবিধাজনক বোধ হলে ভারতবর্ষের বাইরে গিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম ঘোষণা করতে হবে।

এই বিরাট ও সুদূরপ্রসারী স্বপ্ন নিয়ে সুভাষচন্দ্র বাইরে চলে যান। প্রথমে তিনি জার্মানী যান। তারপর জাপান গিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করেন। সেকথা পরে লিখছি।

দিন এগিয়ে চললো।

সারা ইউরোপময় দ্বিতীয় মহাসমরের প্রসার হতে লাগলো।

ইংরেজদের কেবলই পরাজয় হতে লাগলো। সকলে ভাবলেন, এবার বোধহয় ইংরেজদের পরাজয় নিশ্চয়ই হবে। আর তাকে পৃথিবীতে রাজত্ব করতে হবে না।

মহাত্মা গান্ধী এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করার পর সরকারকে জানালেন, ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া হলে তবে ভারত ইংরেজদের পক্ষে দ্বিতীয় মহাসমরে সংগ্রাম করবে।

গান্ধীজীর এই কথা শোনা মাত্র বিলেত থেকে এলেন স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ ভারতবর্ষের সমস্যা পর্য্যালোচনা করার জন্যে।

ক্রীপস্ তখন ইংলণ্ডের যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভার সদস্য। তাঁর চেষ্টায় ইংরেজদের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার চুক্তি হয়েছে। এই কারণে তিনি সারা বিশ্বে বেশ সুনাম অর্জন করেছেন।

সকলে ভাবলো, ক্রীপস্ মিশন ভারতবর্ষে এলে তার ফলে ভারতবাসীদের বিশেষ কল্যাণ হবে।

কিন্তু তার উলটো ফল দেখা গেল।

কংগ্রেসী নেতারা জানালেন, বৃটিশ যদি ভারতবাসীকে পূর্ণ স্বাধীনতা না দেন তাহলে ভারতবাসীরা বৃটিশদের হয়ে দ্বিতীয় মহাসমরে সংগ্রাম করবে না।

ওদিকে মুসলীম লীগের নেতৃবৃন্দ বলে বসলেন, পাকিস্তান নামে আলাদা রাজ্যের ব্যবস্থা না করলে লীগের পক্ষে মুসকিল হবে ইংরেজদের সঙ্গে দ্বিতীয় মহাসমরে যোগ দেওয়া।

এইসব কথাবার্তা শুনে ঘাবড়ে গেলেন স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্। তিনি ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেলেন স্বদেশে।

ওদিকে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ এক জরুরী অধিবেশন আহ্বান করলেন। এই অধিবেশনে বৃটিশ সরকারকে এদেশ থেকে চলে যাবার দাবী জানানো হলো। আর তাঁরা যদি এদেশ হতে চলে না যান তাহলে আইন অমান্য আন্দোলন চলবে। আর আন্দোলনের ভার পড়বে মহাত্মা গান্ধীর ওপর।

বৃটিশ সরকার কংগ্রেসের এই ঐতিহাসিক প্রস্তাব শুনলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা বিচলিতও হলেন।

৮ই আগষ্ট রাত্রিবেলায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসে এবং প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

ইংরেজ সরকার প্রথমটা বিচলিত হলেও পরে নিজমূর্তি ধারণ করলেন।

পরের দিন অর্থাৎ ৯ই আগষ্ট ভোর না হতেই নেতাদের বন্দী করে ভরে ফেললেন জেলখানায়। সঙ্গে সঙ্গে সুমহান ঐতিহ্যপূর্ণ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে বেআইনী বলে ঘোষণা করা হলো।

গান্ধীজীও গ্রেপ্তার হলেন। জেলে যাবার আগে তিনি দেশবাসীকে দুটি অভয় মন্ত্র দিয়ে যান—'ভারত ছাড়ো' আর 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'।

গান্ধীজীর এই দুই মন্ত্রই বিখ্যাত আগষ্ট বিপ্লবের অনুপ্রেরণা হিসেবে জাতিকে নবশক্তিতে জাগিয়ে তুললো। সারা ভারতবর্ষের মানুষ প্রতিজ্ঞা করলেন, হয় স্বাধীনতা লাভ না হয় মৃত্যু। এই দুটোর মধ্যে একটা।

তাঁরা প্রাণপণে সংগ্রাম করার জন্যে তৈরী হলেন। বাংলা, বিহার, আসাম, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ ইত্যাদি স্থানে বিয়াল্লিশের আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে পড়লো। স্বাধীনতাপাগল জনতা ইংরেজদের থানা, পোষ্টাফিস আক্রমণ করলেন, রেল লাইন উপড়ে ফেললেন, টেলিগ্রামের তার কাটলেন। এভাবে তাঁরা

ইংরেজদের কুশাসন অচল করার চেষ্টা করলেন। অনেক জায়গায় তাঁরা স্বাধীন সরকারের পত্তনও করলেন।

ক্রুদ্ধ ইংরেজ শাসকও নীরব রহিলেন না। তাঁরাও জনতাকে লক্ষ্য করে রিভলবার ও কামান ছুঁড়লেন। কয়েক জায়গায় বোমাও ফেললেন। ফলে অনেক বিপ্লবী প্রাণ হারালেন, অনেকের ফাঁসি হলো।

ইংরেজ সরকারের এ হেন দমননীতিতে বিচলিত হলেন না দেশের মানুষ। তাঁরা এগিয়ে এলেন বিপ্লবের পথে। এমন কি মেয়েরাও বাদ গেলেন না।

মেদিনীপুরের তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা, আসামের নাগারানী গুইদালো, পাঞ্জাবের ভোজেপুরী ফুকোনোনি আর তেজপুরের কনকলতা আগষ্ট বিপ্লবে অসীম সাহস দেখান এবং অত্যাচারী ইংরেজ পুলিশের বুলেটের সামনে বুক পেতে দেন।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের মহাবিপ্লবে ভারতবর্ষের বহু স্থানের মানুষ পুলিশের গুলিতে মৃত্যু বরণ করেছেন।

আর একজন বিপ্লবী আগষ্ট আন্দোলনে ধৃত হন এবং হাজত বাস করেন। তাঁর নাম ভাস্কর কর্ণিক। তিনি মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা ছিলেন। পুলিশের অত্যাচার হতে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে বিষ পান করে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেন।

এত লোক হতাহত হলেন কিন্তু আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারলো না। তখনকার মত ইংরেজ রাজশক্তিরই জয় হলো।

ঐ সময় বাংলাদেশে দেখা গেল দারুণ দুর্ভিক্ষ। সৈন্যদের খাদ্য মজুত রাখবার জন্যে ইংরেজ সরকার বাজার থেকে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য শস্য ক্রয় করে গুদামজাত করেছে বলে দেশের মানুষদের খাদ্য সংকট দেখা দিলো। তখন গ্রাম থেকে দলে দলে মানুষ শহরে আসতে লাগলো।

কিন্তু শহরবাসীরা খাদ্য দেবে কোথা থেকে ? তাদের নিজেদেরই যে খাদ্যাভাব রয়েছে।

তাই ক্ষুধার্ত্ত গ্রামবাসী জঠরের তীব্র জ্বালায় অধীর হয়ে আস্তাকুঁড়ের এঁটো পাতা চেটে খেলো, কেউ বা নর্দমার জলের সঙ্গে গড়িয়ে আসা রেশনের গন্ধ চালের ফেন খেতে লাগলো। কিন্তু তাতে করে কি ক্ষুন্নিবৃত্তি সম্ভব ? তাই প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারালো না খেতে পেয়ে। এও ইংরেজ কুশাসনের হাতে ভারতীয় প্রাণের অপ্রত্যক্ষ ভাবে বলিদান।

ভারতবর্ষে যখন আগষ্ট বিপ্লবের আগুন জ্বলছিল ঠিক সেই সময়ে পূর্ব এশিয়ায় গড়ে উঠলো ভারতীয় জাতীয় বাহিনী। তাঁরা সঙ্কল্প করলেন, যেমন করে হোক ইংরেজদের হাত হতে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করতে হবে—তার স্বাধীনতার জন্যে প্রাণপণ সংগ্রাম করতে হবে।

সময়ও অনুকূল ছিল। পূর্ব এশিয়া থেকে ইংরেজকে পিছু হটতে হলো।

বর্মা ও মালয় চলে গেল জাপানীদের হাতে। বাংলাদেশের অবস্থাও ভয়াবহ। মাঝে মাঝে জাপানী বোমারু বিমানের হানা হচ্ছিল কলকাতা শহরের বুকে। দু'চারটে বোমাও পড়লো। তাই দেখে অনেক ইংরেজ দম্পতি কলকাতা ত্যাগ করে ভারতের অন্যত্র চলে গেলেন।

কেবল ইংরেজ বাসিন্দা কেন অনেক স্থানীয় অধিবাসীও সম্ভাব্য জাপানী আক্রমণের আতঙ্কে কলকাতা ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

ভারতীয় জাতীয় বাহিনী বা আজাদ হিন্দ ফৌজ ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে গড়ে ওঠে।

সিঙ্গাপুর জাপানীদের অধিকারে চলে যাবার আগেই ইংরেজ সৈন্য সে স্থান ত্যাগ করে চলে যায়।

সেই সময় ইংরেজ মিলিটারী অফিসারগণ ভারতীয় ফৌজদের জন্যে কোন ব্যবস্থা নিলেন না। তখন ভারতীয় ফৌজরা একান্ত অসহায় ভাবে জাপানী সেনাপতি মেজর ফুজিয়ারার কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

পরে ফুজিয়ারা ঐ সমস্ত ফৌজদের ভার ছেড়ে দেন ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর ওপর। এই মোহন সিংই হচ্ছেন আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠাতা।

জাপানীরা বড় আশা করেছিল যে ভারতীয় ফৌজরা তাদের হয়ে লড়াই করবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে।

কিন্তু পরে তাদের সে আশা পণ্ড হলো।

সেই সময় জাপানে অবস্থান করছিলেন বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। তিনি ভারতীয় প্রতিনিধিদের ডেকে এক সভায় মিলিত হলেন। সভায় স্থির হলো যে ভারতীয় ফৌজরা স্বাধীনভাবে ভারতের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করবেন। তাঁরা জাপানীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন না।

সুভাষচন্দ্র তখন জার্মানীতে ছিলেন। সেখানে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন জার্মানবাসী ভারতীয় বিপ্লবীগণ।

এই সময় জাপান থেকে ডাক পড়লো সুভাষচন্দ্রের। তিনিও আর কালবিলম্ব না করে সাবমেরিনে করে বার্লিন থেকে চলে এলেন সিঙ্গাপুরে।

এখানে এসে তিনি বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর কাছ থেকে পূর্ব এশিয়ার আজাদ হিন্দ ফৌজের ভার নেন এবং পরে অর্থাৎ ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবরে প্রতিষ্ঠা করেন আজাদ হিন্দ্ সরকার। সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ করেন। তখন থেকে তাঁর নাম হলো নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

তিনি জাতিকে নতুন মন্ত্রে সঞ্জীবিত করলেন। সেই মন্ত্রের নাম হলো 'জয় হিন্দ' অর্থাৎ হিন্দুস্থানের জয়।

তারপর সমবেত ভারতীয় মুক্তি ফৌজের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঐ মাতৃভূমি দেখা যাচ্ছে। ঐ খানেই ফিরে যাচ্ছি আমরা—আমাদের ডাকছে ভারত। ওঠো অস্ত্র নাও হাতে, পথ ধরে এগিয়ে চলো। এই পথ ধরে আমরা পৌছবো দিল্লী…দিল্লীর পথ স্বাধীনতার পথ। চলো দিল্লী।'

নেতাজীর ডাকে বহু স্বদেশ প্রেমিক এসে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন। তিনি তাঁদের নিয়ে বিরাট এক সৈন্যবাহিনী গঠন করলেন। এমন কি কিশোর ও নারীরা পর্যন্ত বাদ গেলেন না। কিশোরদের নিয়ে গঠন করলেন 'বালক বাহিনী' আর নারীদের নিয়ে গড়ে তুললেন 'ঝান্সী বাহিনী'।

নেতাজীর অধানে অনেকগুলি রেজিমেণ্ট ছিল। তারা হলো (১) গান্ধী রেজিমেণ্ট (২) নেহেরু রেজিমেণ্ট (৩) আজাদ রেজিমেণ্ট—আর (৪) সুভাষ রেজিমেণ্ট। এই সুভাষ রেজিমেণ্ট ছিল একটি গেরিলা বাহিনী।

এই সব রেজিমেণ্ট ছাড়াও তিনটি ব্যাটেলিয়ান ছিল। এই সমস্ত সেনাবাহিনীর শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানের ভার সম্পূর্ণ ন্যস্ত ছিল ভারতীয়দের ওপর। জাপানী ইম্পিরিয়াল বাহিনীর অনুকরণে এইসব সেনাবাহিনীকে যথোপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে ভারতে দুর্ধর্ষ ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে তৈরী করা হলো। এই বাহিনীতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে একাধিক জাতি ছিল। কারও সঙ্গে ক্ষণিকের জন্যে মনোমালিন্য দেখা যায়নি।

২৩ শে অক্টোবর মধ্য রাত্রি। আজাদ হিন্দ সরকার ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। সেই সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও। আজাদ হিন্দ ফৌজের অনেক অধিনায়ক এর জন্যে আপত্তি জানালেও তাঁরা নেতাজীর কাছে এ বিষয়ে কিছু বললেন না।

এরপর কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। জাপান, ব্রহ্মদেশ, জার্মানী, ফিলিফাইন, নানকিং, মাঞ্চুরিয়া, ইতালী ও শ্যামদেশ আজাদ

হিন্দ সরকারকে স্বীকৃতি জানালো। ফরাসী দেশের ভিসি সরকার কিন্তু স্বীকৃতি জানালো না। এর জন্যে দুঃখ প্রকাশ করলেন নেতাজী।

আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হবার পর নেতাজী ঘোষণা করলেন, '১৮৫৭ সালের পর এই প্রথম আমরা নিজেদের গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করলুম। বিশ্বের বহু শক্তিশালী রাষ্ট্র এই গভর্ণমেন্টকে স্বীকার করে নিয়েছেন। ভারতে বিপ্লবের ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিষ্ঠুর শোষণকে ধন্যবাদ, অবশেষে ক্ষুধার তাড়না, মন্বন্তর ও অনাহার আজ ভারতবর্ষকে বিপ্লবের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। অতএব ভারতবর্ষের শেষ মুক্তি সংগ্রামের জন্যে আজ ক্ষেত্র প্রস্তুত।'

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ ১৮ই মার্চ। আজাদী ফৌজ সর্বপ্রথম ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের মাটি স্পর্শ করলো।

নেতাজী তখন রেঙ্গুণে অবস্থান করছিলেন। তাঁর কাছে এই সুসংবাদ পৌঁছতেই তিনি আনন্দ প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন: 'ভারতের মাটি আজ আমাদের রক্তে অভিষিক্ত। এখানকার বাতাস আমাদের মৃত্যুপথযাত্রী বীরদের শেষ নিঃশ্বাসে আজ পবিত্র।'

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ, জুন মাস। আজাদ হিন্দ ফৌজ আক্রমণ করলো প্যালেল বিমান ঘাঁটি। ওদিকে তাঁদের বৈষয়িক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন হয়ে উঠলো। ক'দিন ধরে তাঁরা অর্দ্ধাহার-অনাহারে সংগ্রাম চালিয়ে আসছেন। গাছের মূল খেয়ে প্রাণ ধারণ করছেন। বর্তমানে তাঁদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এই মুহূর্তে তাঁদেরকে উত্তম আহার্য্যদানে তুষ্ট করতে না পারলে বাহিনীর পতন অত্যাসন্ন।

আজাদী সৈন্যগণ দেশের জন্যে—মাতৃভূমির মুক্তির জন্যে এইরকম অমানুষিক সংগ্রাম করে চলেছেন। কারণ তাঁরা এই প্রকার কষ্ট স্বীকার করার ক্ষমতা লাভ করেছেন তাঁদের সর্বাধিনায়ক নেতাজী

সুভাষচন্দ্র বসুর কাছ থেকে। নেতাজীর মত মহান অধিনায়কের ত্যাগব্রতী এবং কষ্টলাঞ্ছিত জীবনযাত্রা আজাদী সৈন্যদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা জোগাত। নেতাজী রণাঙ্গণে কিরকম অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করতেন তার এক সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরেছেন হরিদাস মিত্র তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র'তে। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী তারিখের দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকায়। তিনি লিখেছেন: 'নেতাজীর বীর্যবত্তা ছিল অনন্যসাধারণ। কতদিন সেনাদল দেখেছে, অবিরাম বোমা বর্ষণের মধ্যে, সর্পসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যানীর প্রান্তদেশে, অতি দুর্গম গিরিবর্ত্মে, অচল অটল নেতাজী তাদের পাশে পাশে ফ্রন্টে ফ্রন্টে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যুদ্ধ সীমান্তে তাদেরই ছাউনির খাবার ঘরে, তাদেরই পিঠে পিঠ দিয়ে লবণবিহীন ডাল আর পাহাড়ী লিঙারা ঘাসের তরকারি সানন্দে খেয়ে চলেছেন। তাইতো তাঁর আহ্বানে, পাঁচ হাজার হিন্দু-শহীদের লাল রক্তে রাঙা হয়, কোহিমা-ইম্ফলের শ্যামল গিরিপ্রান্তর।'

ক্রমে এই প্রকার দুঃখজনক সংবাদ গিয়ে পৌঁছল সেনাপতির কানে। তিনি উৎসাহ দিয়ে বললেন, কুচ্ পরোয়া নেহি! তোমরা সামনের দিকে এগিয়ে চলো। আর কিছুক্ষণ কষ্ট সহ্য করো তাহলেই তোমরা লাভ করবে অনন্ত আনন্দ। সামনে বিমান ঘাঁটিতে রয়েছে প্রচুর রসদ। ঐ সমস্ত রসদ তোমাদের আয়ত্তে এলে আর কোন প্রকার কষ্ট থাকবে না। তোমরা এই সময়টুকু প্রাণপণ যুদ্ধ করে বিমানঘাঁটি দখল করে নাও।

সেনাপতির কাছ থেকে অভূতপূর্ব আশ্বাস লাভ করে আনন্দিত হলেন আজাদী সৈন্যরা। তাঁরা প্রাণপণে যুদ্ধ করে এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে। বৃটিশ সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ হলো। এই ঘোরতর যুদ্ধে আজাদী ফৌজরা জয়লাভ করলেন। বিমানঘাঁটি এবং প্রচুর রসদ তাঁদের দখলে এলো। তখন তাঁরা আনন্দে সেগুলি ভক্ষণ করে শক্তি ও তৃপ্তি লাভ করলেন।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস। রীতিমত বর্ষা আরম্ভ হয়ে গেছে। সারাদিন আকাশ মেঘে ঢাকা। পথঘাট পিচ্ছিল, কর্দমাক্ত। এই অবস্থায় স্থলভাগে যুদ্ধ পরিচালনা করা এক মহা সঙ্কটজনক অবস্থা। তথাপি নেতাজী তাঁদের কাছে এসে তাঁদের উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'তোমাদের এখন বিশ্রাম নেই, ভয় পেলে চলবে না। সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। দিল্লীতে যতক্ষণ পর্যন্ত না পৌঁছচ্ছো ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কোন ক্ষান্ত নেই। তোমরা অগ্রসর হও সামনের দিকে।'

নেতাজীর উৎসাহ লাভ করে সৈন্যরা এগিয়ে চললেন, দিল্লীর কথা শোনামাত্র তাঁদের মধ্যে থেকে আশঙ্কা, ক্ষুধার জ্বালা ইত্যাদি সব-কিছু দূর হয়ে গেল। তাঁরা বীরত্বের সঙ্গে প্রকৃতির প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁদের বীরত্ব দেখে নেতাজী মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কয়েকজনকে পুরস্কৃতও করলেন। তাঁদের মধ্যে কর্ণেল এস, এস, মিত্র পেলেন সর্দার-ই-জঙ্গ পদক এবং লেফটেনান্ট ই, আর, সিংহ পেলেন বি-ই-হিন্দ পদক।

এই সময় নেতাজী রেডিওতে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি একটি আবেদন প্রচার করেন। তাঁর অভিযানের সমস্ত সংবাদ নিবেদন করে তিনি গান্ধীজীকে বললেন: 'হে আমাদের জাতির পিতা! ভারতের স্বাধীনতার এই পবিত্র সংগ্রামের সময় আমরা আপনার আশীর্বাদ ও শুভ কামনা প্রার্থনা করছি।'

নানাপ্রকার অসুবিধার মধ্যে আজাদী ফৌজ পুরো ছ'মাস ধরে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে চলেছে। এই সময়ের মধ্যে ১৭টি বড় যুদ্ধ এবং অন্য কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধ হয়েছে। অনেক যুদ্ধ ক্ষেত্রে বৃটিশ ও আমেরিকান সৈন্য বাহিনী বারংবার আঘাত খেয়ে পিছু হটেছে আবার কখনো আজাদী ফৌজকেও অনেক ঝড়ঝাপ্টা সহ্য করতে হয়েছে।

প্রথম দিকে আজাদী ফৌজের মণিপুর অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। কতবার তাদের বিমান কলকাতার ওপর দিয়ে উড়ে গেছে। প্রতিদ্বন্দ্বী বৃটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ লর্ড মাউন্টব্যাটেন সে খবর রাখতেন কিন্তু ভারতবাসীরা তখনো পর্যন্ত জানতো না যে মণিপুর রণাঙ্গণে যারা যুদ্ধ করছে তারা আজাদ হিন্দ ফৌজ। তারা মনে করেছিল শত্রু রাষ্ট্র জাপানী ফৌজ বুঝি ঐ যুদ্ধে লিপ্ত।

আজাদী ফৌজ নানারকম অসুবিধার মধ্যে এগিয়ে চললো। মুখে তাঁদের নানাপ্রকার ধ্বনি: 'দিল্লী চলো' – 'নেতাজী জিন্দাবাদ'— 'জয় হিন্দ'। এমন সময় একটি ঘটনা ঘটে গেল। ইম্ফলের চারদিকে ইংরেজ সৈন্যদের ঘিরে ধরলেন আজাদী সৈন্যরা।

ইম্ফলের পতন আসন্ন। এমন সময় আজাদী ফৌজের একজন বিশ্বাসহন্তা লেফটেনাণ্ট যুদ্ধ লাইন পেরিয়ে চলে গেলেন ইংরেজ পক্ষের সৈন্যদের দিকে। আজাদী ফৌজের একজন মিলিটারী পুলিশ তাঁকে বাধা দিলেন। তিনি তখন তাঁর সামনে মানচিত্র এবং কয়েকটি কাগজ বের করে উল্টো পাল্টা কথা বলে ভুল খবর বললেন। তিনি বললেন, তিনি যাচ্ছেন অগ্রবর্তী সন্ধানী দলের কাছে যাঁরা জঙ্গলে লুকিয়ে আছেন, তাঁদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে।

সরল বিশ্বাসী মিলিটারী পুলিশ ছেড়ে দিলেন সেই বিশ্বাসহন্তা লেফটেনাণ্ট সিংকে। তিনি দিব্যি গিয়ে মিলিত হলেন ইংরেজ সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে।

কিছুক্ষণ পরে ঘটলো এক অঘটন ব্যাপার! আজাদী ফৌজের ওপর শিলাবৃষ্টির মত বোমা বর্ষণ হতে লাগলো। উড়ন্ত চিলের মত আকাশ বেষ্টন করে ইম্ফল রণাঙ্গণে আলাদা সৈন্য ব্যূহের ওপর চলতে লাগলো ইংরেজ সৈন্য বাহিনীর বিমান আক্রমণ।

এই ঘটনার পর নেতাজী সৈন্য বাহিনীর ওপর কড়া আদেশ দিলেন: 'যে কোনো আজাদী সেনা—যে কোনো পদই তার হোক

না কেন—যুদ্ধের লাইন পার হবার চেষ্টা করলেই তখুনি তাকে গুলী করে মারা হবে।'

ঠিক এই সময়ে নেতাজীর সামনে দেখা দিল আর এক সংকট: ঊর্দ্ধতন জাপানী মিলিটারী অফিসারদের সঙ্গে নেতাজীর মনান্তর ঘটলো। তারা দেখলো, আজাদী ফৌজরা তাদের অভিপ্রায় অনুসারে কাজ করছেন না।

এর ওপর এলো প্রচণ্ড বৃষ্টি, খাদ্যাভাব এবং অর্থাভাব। সবকিছু মিলিয়ে সে এক মহা সঙ্কটজনক কাল। বর্ষার মধ্যে পিছু হটবারও উপায় নেই।

তথাপি আজাদী সৈন্যরা বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন।

যুদ্ধের ফলাফল প্রসঙ্গে আলোচনা করলেন নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের মন্ত্রীসভায়। তিনি বললেন: 'আমাদের অভিযান আরম্ভ হয়েছে অনেক বিলম্বে, বর্ষা আমাদের বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। পথঘাট সব ভেসে গেছে। খরস্রোতা নদীতে পারাপারের উপায় নেই। একমাত্র উপায় ছিল বর্ষা নামবার আগে ইম্ফল দখল করা। দখল আমরা করতে পারতুম যদি আমাদের বিমান বাহিনী আরও শক্তিশালী হতো। বর্ষা নামবার আগে পর্যন্ত সমস্ত রণক্ষেত্রেই আমাদের জয়লাভ হয়েছিল। আরাকান, কালাদিন, টিড্ডিম, প্যালেল, কোহিমা, হাকা—সর্বত্রই আমাদের সৈন্যরা শত্রুদের পর্যুদস্ত করেছিল।

নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছেন আজাদী সৈন্যগণ। এমন সময় তাঁরা শুনলেন নেতাজী নাকি তাঁদের পিছু হটতে আদেশ করেছেন।

প্রথমে তাঁরা বিশ্বাস করলেন না। সকলে সমস্বরে বললেন: ও আদেশ ঝুটা। আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা লড়বো। প্রাণ-পণে লড়াই করবো। যতক্ষণ পর্যন্ত না দিল্লী আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা লড়াই করে যাবো। এই হচ্ছে আমাদের প্রতি নেতাজীর আদেশ।

যে সৈন্যটি নেতাজীর বাণী বহন করে এসেছিলেন তাকে উদ্দেশ্য করে আজাদী ফৌজরা বলে উঠলেন, আপনি ফিরে যান। আমরা আপনার কথা মানি না।

তখন বাধ্য হয়ে সেই সৈন্যটি নেতাজীর কাছে ফিরে গেলেন।

সব শুনে নেতাজী হাসলেন আবার দুঃখও পেলেন। তাঁর দু'নয়ন অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠলো। একবার দীর্ঘ নিঃশ্বাসও ফেললেন। তারপর তাকিয়ে রইলেন দূর গগন পানে।

খানিকক্ষণ তাকাবার পর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। এবার নিজের পকেট হতে কলম বের করলেন। সামনে ছিল লেটার রাইটিং প্যাড্। তার ওপর সৈন্যদের উদ্দেশ্যে লিখতে লাগলেন, 'হে আমার প্রিয় সৈন্যগণ, আজ আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তোমাদের আদেশ দিচ্ছি, তোমরা ইম্ফল রণাঙ্গণ ত্যাগ করে রেঙ্গুণে ফিরে এসো।'

এই আদেশটি লেখার পর তার তলায় সই করলেন নেতাজী।

এবার সেই আদেশ সম্বলিত পত্রটি তুলে দিলেন সৈন্যটির হাতে।

তিনি দ্রুতবেগে চলে এলেন ইম্ফল রণাঙ্গণে। সেনাপতির হাতে আদেশটি তুলে দিলেন।

সেনাপতি তা পাঠ করে মর্মাহত হয়ে সামনে সমবেত সৈন্যদের আদেশ দিলেন : তোমরা ইম্ফল রণাঙ্গণ ত্যাগ করো। ফিরে চলো রেঙ্গুণের দিকে।

সৈন্যরা এই আদেশের জন্যে একটুকু প্রস্তুত ছিলেন না। তখনো পর্যন্ত তাঁদের মনোবল অটুট ছিল।

তথাপি অধিনায়কের হুকুম মানতে হবে। না ফিরে আর উপায় কি।

শেষবারের মত স্বদেশের পবিত্রভূমি চুম্বন করে সৈন্যগণ ফিরে এলেন রেঙ্গুণে।

রেঙ্গুণে ফিরে আসার পরও সুস্থির হতে পারলেন না আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যগণ। তাঁরা আত্মরক্ষা-মূলক সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগলেন।

কিন্তু দিনের পর দিন শত্রুপক্ষের আক্রমণ শেষপর্যন্ত অসহ্য হয়ে উঠলো তাঁদের কাছে। দুর্দ্ধর্ষ বৃটিশ সৈন্যরা মার্কিন অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে স্থল, জল ও আকাশ পথে বারংবার ব্যাপকভাবে আক্রমণ চালিয়ে গেল। অবশেষে পতন হলো বর্মার, রাজধানী রেঙ্গুণের। সেদিন তারিখ ছিল ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মে। জাতীয় বাহিনীর যেসব সৈন্যরা রেঙ্গুণে ছিল তারা সকলেই বন্দী হলো ইংরেজদের হাতে।

রেঙ্গুণ পরিত্যাগ করার আগে নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের উদ্দেশে এক নির্দেশনামায় বলেন: 'আজ গভীর বেদনার সঙ্গে আমি এই ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করে যাচ্ছি, যেখানে আপনারা ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হতে বীরোচিত সংগ্রাম চালিয়েছেন এবং এখনো চালাচ্ছেন। ইম্ফল ও ব্রহ্মদেশে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হলো। কিন্তু এ প্রথম চেষ্টা মাত্র। আরও অনেক চেষ্টা আমাদেরকে করতে হবে। চিরদিনই আমি আশাবাদী। কোন অবস্থাতেই আমি পরাজয় মেনে নিতে রাজী নই। ইম্ফলের সমতল ভূখণ্ডে, আরাকানের জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে, ব্রহ্মদেশে ও অন্যান্য জায়গায় শত্রুদের বিরুদ্ধে আপনাদের বীরত্বের কাহিনী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চিরদিনের জন্যে লিখিত থাকবে।'

রেঙ্গুণের পতন হলো। ওখান থেকে আজাদ হিন্দ সরকারের দপ্তর স্থানান্তরিত করা হলো সিঙ্গাপুরে। নেতাজী বড় আশাবাদী মানুষ। তাই তিনি আশা করলেন, সিঙ্গাপুরে অবস্থান করে একদিন আবার বীরবিক্রমে শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। কিন্তু তাঁর সে আশা পূর্ণ হলো না। ইতিমধ্যে জাপানের পরাজয় ঘটার জন্যে তিনি আশাহত হলেন।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ। আগষ্ট মাস। ইংরেজদের সুকৌশল নীতির ফলে আমেরিকান বিমান বহর জাপানের দুটি বিখ্যাত শহর হিরোসিমা এবং নাগাসাকির ওপর আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে। এর ফলে জাপানের বহু মানুষ হতাহত হলো এবং দু'টি শহর একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এই কারণে জাপানের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল বৃটিশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। তারা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হিসাবে আত্ম-সমর্পণ করলো। সেই বার্তা শুনে বেদনাহত চিত্ত নেতাজী স্থির করলেন যে তিনিও পরামর্শ দেবেন আজাদী সৈন্যদের বৃটিশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে। কারণ তিনি বুঝতে পারলেন যে, যে স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র জাপানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তিনি সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন এখন সেই বন্ধু রাষ্ট্রের যখন নিদারুণ বিপর্য্যয় ঘটেছে তখন তাঁর মত ক্ষুদ্র শক্তির অধিকারী ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে বৃটিশ ও আমেরিকার মত বিশাল শক্তির সঙ্গে লড়াই করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু কতিপয় আজাদী সৈন্যের মনে তখনো ছিল অটুট মনোবল। তাঁরা ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন।

কিন্তু নেতাজী তাঁদেরকে বললেন, তোমরা আত্মসমর্পণ করো।

এরপর তিনি এক বেতার ভাষণের মারফৎ ক্ষুদ্র বক্তৃতা দিয়ে বললেন, 'আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও বীর সৈনিকগণ! রেঙ্গুন পরিত্যাগের সময় যে আশা করেছিলুম তাও সফল হলো না। জাপানের চূড়ান্ত পরাজয়ের ফলেই আমাদের এই শোচনীয় বিপর্যয়। যুদ্ধজয়ের আর কোন আশাই নেই। আপনাদের তাই আমি শান্তভাবে শৃঙ্খলার সঙ্গে আত্মসমর্পণ করতে আদেশ দিলুম। যুদ্ধে জয় ও পরাজয়—দুই-ই আছে। এরজন্যে দুঃখ পাবার কিছুই নেই জানবেন। এবং আমরা এই ভেবে আজ গর্ব ও গৌরব বোধ করবো যে, ভারতের স্বাধীনতার জন্যে আমরা যে ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা করেছি ভারতবাসী একদিন না একদিন সম্পূর্ণরূপে তার

গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেই। এই পরাজয়, এই আত্মসমর্পণেই এর শেষ নয়। স্বাধীনতালাভের এই সংকল্প, এই অমিত সাহস আবার একদিন, আর এক নতুন ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করবে। জয়হিন্দ।'

সেদিনকার নেতাজীর এই বাণী পরবর্তীকালে সার্থক ও ফলপ্রসূ হয়ে উঠলো এবং যতদিন যাচ্ছে ততই এদেশবাসী সম্যকভাবে বুঝতে পারছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজে সেদিনকার নেতাজী প্রতিষ্ঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজের গুরুত্ব এবং ভূমিকা কতখানি ছিল।

বেতার ভাষণের পরদিন অর্থাৎ ১৭ই আগষ্ট নেতাজী সিঙ্গাপুর ত্যাগ করেন। পরদিন অর্থাৎ ১৮ই আগষ্ট তাইহোকুতে যাবার পথে তাঁর বিমানে আগুন লাগে এবং তিনি অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। পরে তাঁর পূত চিতাভস্ম জাপানের রেঙ্কোজি মন্দিরে সংরক্ষিত করা হয়।

কিন্তু নেতাজী প্রসঙ্গে এই সংবাদ বিশেষ করে বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুসংবাদ অনেকে বিশ্বাস করলেন না এবং এখনো পর্যন্ত করেন না যদিও শাহনওয়াজ তদন্ত কমিশন নেতাজীর মৃত্যুসম্পর্কিত ঘটনাবলী বিচার-বিশ্লেষণ করে বলেছেন নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে বিমান দুর্ঘটনায়।

বর্তমানে ভারত সরকার কয়েকজন বামপন্থী লোকসভা সদস্যের চাপে পড়ে নেতাজীর মৃত্যুসম্পর্কে পূর্ণ তদন্ত করার জন্যে নতুন আর একটি তদন্ত কমিশন বসাতে রাজী হয়েছেন বলে সংবাদপত্রে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

বৃটিশ সরকার আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী সৈন্যদের নিয়ে এলেন সুদূর রেঙ্গুণ হতে ভারতবর্ষে।

ইংরেজদের মতে ঐ সকল আজাদী সৈন্যরা রাজদ্রোহী ছিলেন। সুতরাং তাঁদের বিচার হবে বৃটিশের আদালতে।

বন্দীরা রেলে, জাহাজে বা পুলিশ ভ্যানে করে যেখানেই গেছেন সেখানে উচ্চৈস্বরে নেতাজীর গৌরব গাথা গেয়েছেন। তাঁদের মুখে মুখে মুহুর্মুহু উচ্চারিত হতে লাগলো—'নেতাজী জিন্দাবাদ, জয়হিন্দ'।

দেশবাসীরা যখন জানতে পারলেন যে ঐ সমস্ত যুদ্ধবন্দীরা এক সময় বীর সেনাপতি সুভাষচন্দ্র বসুর অধিনায়কত্বে বর্মার জঙ্গলে বৃটিশদের সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়েছিলেন তখন তাঁরা সেইসব বীর সেনানীদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। সেই সঙ্গে নেতাজীর প্রতিও দেখালেন অকৃপণ এবং অকৃত্রিম শ্রদ্ধা।

সেইসময় ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে গান্ধীজীর নেতৃত্বে চলছিল স্বাধীনতার আন্দোলন। দেশবাসীদের মনে তখন পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার পণ। সেই শুভ লগ্নে তাঁরা যখন নেতাজীর কীর্তি-কাহিনী শুনলেন তখন তাঁদের আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে উঠলো। পুলিশ ও সামরিক বিভাগের বহু কর্মীর মধ্যে জেগে উঠলো বিদ্রোহী ভাব। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বোম্বাইয়ের নৌসেনারা বিদ্রোহ ঘোষণা করলো ইংরেজ সরকারের চরম দমননীতির প্রতিবাদে। তাদের কাছে তখন নেতাজী সুভাষ-চন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের জ্বলন্ত ত্যাগ ও আদর্শ দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত বর্তমান। তাদের ঐ বিদ্রোহকে সমর্থন করে বোম্বাইয়ের নাগরিকগণ এক বিরাট শোভাযাত্রা বের করলেন রাজপথে। তাঁরা বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করার সময় ইংরেজ পুলিশের সশস্ত্র আক্রমণের সম্মুখীন হন। অনেকে পুলিশের গুলিতে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান।

১৯৪২-এর বিরাট নরমেধ যজ্ঞের পর ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে আবার একটি নরমেধ যজ্ঞও করলেন ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষের পবিত্র ভূমিতে।

এই নরমেধ যজ্ঞগুলি করার ফলে ইংরেজ শাসকদের বিশেষ লাভ হয়নি আর ভারতবাসীদেরও খুব একটা ক্ষতি হয়নি। কারণ

পরবর্তীকালের ঘটনা তার সাক্ষী হয়ে আছে। ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষ ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হলো। সেই সঙ্গে তারা ভারতবাসীদের হাতে তুলে দিলো খণ্ড স্বাধীনতা। সে কথা পরে লিখছি।

মোটকথা সেদিন ভারতবর্ষে আসমুদ্র হিমাচল মুক্তি আন্দোলনের তরঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠলো।

এইসব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে চতুর বৃটিশ সরকার বুঝতে পারলো, আর ভারতে থাকা নিরাপদ নয়। এবার পাততাড়ি গোটাতে হবে।

তখনকার দিনে ভারতবর্ষের বড়লাট ছিলেন লর্ড ওয়াভেল তিনি কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আপোষ মীমাংসার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে কারাগারের দরজা উন্মুক্ত করে দিলেন। মহাত্মাজী এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের আমন্ত্রণ জানালেন মীমাংসার জন্যে আলোচনা বৈঠকে। সেই সঙ্গে তিনি মুসলীম লীগ ও অপরাপর রাজনৈতিক দলকেও আহ্বান জানালেন। সীমানায় বসলো মীমাংসা বৈঠক কিন্তু বৈঠক হলো পণ্ড। কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের মধ্যে মত নিয়ে বৈষম্য উপস্থিত হলো।

ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের রাজনীতিতে ঘটলো পরিবর্তন। সাধারণ নির্বাচনে রক্ষণশীল দলের পরাজয় ঘটলো এবং জয় হলো শ্রমিকদলের। রক্ষণশীল দলের নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মিঃ উইনষ্টন চার্চিল। তিনি ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে নারাজ। এমন কি মহাত্মা গান্ধীকে নানারকম অশ্রাব্য ভাষায় অশ্রদ্ধা দেখালেন। তাঁর পরাজয় হতে ভারতবাসীরা স্বস্তি বোধ করলো।

শ্রমিক দলের নেতা লর্ড এটলি ছিলেন উদারপন্থী এবং বাস্তব-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করার পর ইংলণ্ডের

প্রধানমন্ত্রী হলেন। তারপর তিনি ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণে মনোনিবেশ করলেন। তিনি দেখলেন, ভারতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দীর্ঘ পঁচিশ বছর কাল গণ-জাগরণ ঘটেছে। মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্ব অসাধারণ। তাঁর আহ্বানে জনসাধারণ ওঠা-বসা করে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নেতাজী সুভাষ-চন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বাধীনতা সংগ্রাম। ভারতবাসীগণ নেতাজীকে এখন থেকে দেবতার মত ভক্তি করতে শিখেছে। ভারতীয় সেনামহলে আজাদী সৈন্যদের বীরত্ব ও দেশপ্রেমের স্পর্শ লেগে তাদেরকেও মুক্তি আন্দোলনে উৎসাহিত করে তুলেছে। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে ভারতে একটা বিরাট গণবিপ্লব--তথা গণজাগরণ আসন্ন। তার আগে মানে মানে ভারতের মাটি হতে পাততাড়ি গোটানো ইংরেজদের উচিত।

এইপ্রকার চিন্তা করে লর্ড এটলি ভারতের নেতাদের সঙ্গে মীমাংসার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে উৎসুক হলেন। প্রথমে তিনি বললেন, ভারতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলিতে সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হোক।

ওদিকে দিল্লীতে ঐতিহাসিক লালকেল্লায় সামরিক আদালত বসলো। সেখানে বিচার হবে বন্দী আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের। সমগ্র দেশবাসী উদ্বেল আনন্দে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের বীরত্ব ও সাহসিকতাপূর্ণ কাজের সমর্থন জানালো। তাদের পক্ষ সমর্থন করলো ব্যারিস্টার জওহরলাল নেহেরু। দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর গাউন পরে এসে দাঁড়ালেন আজাদী ফৌজের পাশে তাঁদের পক্ষে আদালতে ওকালতি করবার জন্যে। বোম্বাইয়ের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ভুলাভাই দেশাই এলেন আজাদী সৈন্যদের পক্ষে ওকালতি করতে। কংগ্রেসও আজাদী ফৌজের পক্ষ সমর্থন করলো।

নির্দিষ্ট দিনে ঐতিহাসিক লালকেল্লায় বিচার আরম্ভ হলো। দেশের

জনগণ দলে দলে এসে জমায়েত হলো ঐতিহাসিক লালকেল্লার পবিত্র প্রাঙ্গণে।

বিচার আরম্ভ হলো। সরকারী উকিল অভিযোগ করলেন, এই সেনানীরা দেশদ্রোহী, রাজদ্রোহী। এরা সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে।

এরপর আরম্ভ হলো আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষ অবলম্বনকারী আইনবিদ্‌দের সওয়াল। তাঁরা বললেন, না, তা নয়। সেদিন বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ব্রহ্মদেশে পরাজয় স্বীকার করে ভারতীয় বাহিনীকে বিনাসর্তে জাপানীদের হাতে সমর্পণ করেন। ভারতীয় সৈন্যদের তখনি ভারতের সম্রাটের প্রতি আনুগত্যও শেষ হয়ে যায়। তারপরে তাঁরা নেতাজীর অধীনে এবং নেতাজীর নেতৃত্বে আইনানুগতভাবে প্রতিষ্ঠিত আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের সৈন্য হিসাবে যুদ্ধ করেছেন। তাঁরা যখন যুদ্ধ করেছেন তখন তাঁরা ভারত সম্রাটের বিদ্রোহী সৈন্য হিসাবে যুদ্ধ করেননি। যুদ্ধ করেছেন আজাদ হিন্দ সরকারের সৈন্য হিসাবে। এই সরকার ছিল স্বাধীন সার্বভৌম সরকার। অক্ষ শক্তি কর্তৃক স্বীকৃত আইনসম্মত সরকার। অতএব সম্রাটের সৈন্য হয়ে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ এঁদের সম্বন্ধে খাটে না। তারপরে এঁদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতার অভিযোগ, স্বদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অভিযোগও খাটে না। কেন না এঁরা যুদ্ধ করেছে ভারতের বিরুদ্ধে নয়। এঁরা যুদ্ধ করেছে ভারতের স্বাধীনতার জন্যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে। এঁরা স্বদেশদ্রোহী নয়। এঁরা স্বদেশ ভক্ত স্বাধীনতাকামী সৈনিক। স্বদেশদ্রোহীতার অভিযোগ এদের সম্বন্ধে খাটে না।

বিচারে আজাদ হিন্দ ফৌজের জয় হলো। বন্দী সৈন্যগণ মুক্তি পেলেন। তাঁদেরকে কাছে পেয়ে দেশবাসীরা গর্ব বোধ করতে লাগলো। তাঁদের প্রতি দেশবাসীগণ জানালো অসাধারণ শ্রদ্ধা।

এরপর এলো ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের প্রস্তুতি। ১৯৪৬

খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে বৃটিশ পার্লামেন্ট লর্ড পেথিক লরেন্স স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ও মিঃ এ. ভি. আলেকজাণ্ডার—এই তিনজনকে নিয়ে গঠিত ক্যাবিনেট ভারতে পাঠালো মীমাংসার জন্যে। কিন্তু এবারেও সেই একই অবস্থা দেখা দিলো। কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের মধ্যে মত-পার্থক্য দেখা দিলো। ক্যাবিনেট মিশন তখন ১৬ই মে তারিখে তাঁদের নিজস্ব একটি পরিকল্পনা পেশ করলেন। ওদিকে মার্চ মাসেই ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের হাত থেকে শাসন ভার গ্রহণ করে লর্ড মাউন্টব্যাটেন এলেন ভারতের গভর্ণর জেনারেল হয়ে। তাঁর অধীনে ভারতে একটা Interim Government বা অন্তবর্তী সরকার গঠিত হলো।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে বৃটিশ পার্লামেন্ট ভারতের স্বাধীনতা আইন (Indian independence Act) পাশ করলো। এই আইনে এইরূপ বিধান দেওয়া হলো যে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে।

অবশেষে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট এলো। এই শুভদিনে ভারতবর্ষ লাভ করলো তার চিরবাঞ্ছিত স্বাধীনতা। এর একদিন আগে মুসলীম লীগ লাভ করলো স্বাধীনতা—গঠন করলো তাদের চিরবাঞ্ছিত মুসলীম রাষ্ট্র—'পাকিস্থান'।

এই স্বাধীনতা লাভ করে দেশবাসীরা একদিকে যেমন আনন্দে অভিভূত হলো অন্য দিকে তেমনি বেদনায় মর্মাহত হলো। কারণ ইংরেজ সরকার ভারত বিভাগের দ্বারা ভারতবাসীকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। এদিক হতে দেখতে গেলে তাঁদের সেই পুরাতন নীতি যা কিনা ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে একবার আত্মপ্রকাশ করেছিল বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের দ্বারা, এবার তাঁদের সেই বহু কালের ইচ্ছা বাস্তবে পরিণত হলো দেশ বিভাগের দ্বারা—হিন্দুস্থান আর পাকিস্থান, দু'টি পৃথক রাষ্ট্র সৃষ্টি হলো।

এই দু'টি রাষ্ট্র গঠনের প্রাক্কালে ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটে। তার ফলে বহু হিন্দু ও মুসলমান নরনারী প্রাণ হারায়। বহু হিন্দু রমণীর সম্মান মাটির ধুলোতে মিশে যায়।

শেষ কথা হলো জাতির জনক এবং ভারতবর্ষের অবিসংবাদিত নেতা মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতির প্রভাবে এবং ইংরেজ সরকারের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করলেও এই মহান এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী স্বাধীনতা সংগ্রাম রক্ত বিহীন হয়েছে বললে একেবারে ভুল বলা হবে, করা হবে সত্যের অপলাপ। কারণ ভারতবাসীদের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ যাঁরা নাকি চরমপন্থী এবং বিপ্লববাদী তাঁরা চিরকাল এদেশে রয়ে গেছেন। তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ আমরা পেয়েছি সিপাই বিদ্রোহে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে, আগস্ট আন্দোলনে, ভারতীয় নৌ-বহরের বিদ্রোহকে সমর্থন করে, গণ আন্দোলনে ঐতিহাসিক আজাদ হিন্দ ফৌজের সশস্ত্র সংগ্রামে এবং ছেচল্লিশ সালের হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায়। এই সকল সংগ্রামে হাজার হাজার মুক্তি পিপাসু ভারতীয় নরনারী জীবন দান করেছেন অত্যাচারী ইংরেজ শাসকদের বেয়নেট, বুলেট এবং কামানের মুখে। তাঁরা মরেও অমর শহীদ হয়ে আছেন ভারতীয়দের শ্রদ্ধা নত মনের দর্পণে। তাঁদের এই আত্মদান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে পূর্ণত্বের মহিমা দান করেছে।

সমাপ্ত ॥